রমণ মহর্ষি
ও
আত্মজ্ঞানের পথ

Bengali edition of
Ramana Maharshi and the Path of Self-knowledge
by **Arthur Osborne.**

লেখক
শ্রীআর্থার ওস্‌বোর্ণ

অনুবাদিকা
শ্রীমতী পূর্ণিমা সরকার

শ্রীরমণ প্রকাশনী

—: প্রাপ্তিস্থান :—

মহেশ লাইব্রেরী	সর্বোদয় বুক স্টল	গ্লোব লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট	হাওড়া স্টেশান	২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩।		কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরমণ প্রকাশনী
শ্রীমতী অসীমা বসু
ডি বি ৮১ সল্টলেক
সেক্টর-১
কলিকাতা-৬৪

মুদ্রক :
আশীষ চৌধুরী
জয়দুর্গা প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রস্তাবনা

ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষির দেহত্যাগের পর এই বইটি যখন প্রথম লেখা হল, তখন আমি এই ধারণা প্রকাশ করেছিলাম যে, তিরুভন্নমালাই আধ্যাত্মিক কেন্দ্ররূপে বিরাজ করবে। যারা তাঁর দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে পথ নির্দেশনার অভাব হবে বলে আশঙ্কা করত তাদের "তোমরা এই শরীরটার ওপর বড়ই গুরুত্ব দাও" বলে তিনি নিজেও পরিহাস করে ভর্ৎসনা করতেন। আর যারা খেদ প্রকাশ করত, তাদের বলতেন "ওরা ভাবে যে আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় যাব? এখানেই আছি।" অধিকন্তু, বলা ছাড়া একটা আন্তরিক বিশ্বাসও ছিল।

এখন তাঁর মহাপ্রয়াণের পর আট বছর কেটে গেছে, নিজের অনুভূতি দিয়ে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করা যায়। পুরাতন দিনে দেব-মানবকে দর্শন ও তাঁর পুণ্য সান্নিধ্যের কৃপা লাভের জন্য অগণিত নর-নারী তিরুভন্নমালাই আসত। এদের মধ্যে কিছু ছিল যারা তাদের জীবন ও ভাগ্য তাঁর পায়ে সঁপে দিয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথে চলার চেষ্টা করত। এখন দর্শকবৃন্দ নেই, ভক্তরা আছে। কেবল যে তারাই রয়েছে তা নয়, অন্যেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, আর সবাই তাঁর অনুকম্পা ও পথ নির্দেশনা অনুভব করছে।

আজকাল শান্তির কথা প্রায়ই বলা হয়, কিন্তু 'শান্তি' বলতে যুদ্ধ পরিহার, যা একটা নিরাপত্তার স্থিতাবস্থা রক্ষা করা ছাড়া আর বেশী কিছু বোঝায় না। ভগবানের 'শান্তি' এর থেকে পৃথক, এটা একটা শক্তিমান স্পন্দন যা সমস্ত সত্তাকে পরিব্যাপ্ত ক'রে তারও অতীতে একটা অপার শান্তির পারাবার রূপে রয়েছে; এটা বুদ্ধির অগম্য। এটি লাভ করার পূর্বেই এই শান্তি মনের স্বকল্পিত জটিলতা-জাত বন্ধন নাশ করে আর একে এক শাশ্বত সত্তার পূর্বাভাসে ভরিয়ে দেয়। এই সেই শান্তি যা অরুণাচল পাহাড়ের পাদদেশে ভক্তগণ অনুভব করে, সেদিন যেমন করত।

———

ভূমিকা

শ্রীরমণ মহর্ষির জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে শ্রীওস্‌বোর্ণের রচিত পুস্তকটির ভূমিকা লিখতে আমি খুবই আনন্দ লাভ করছি। কৌতূহলী অথচ বাধ্যহয়ে সন্দেহবাদী মনোবৃত্তি-প্রধান আমাদের যুগের সঙ্গে এর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এখানে আত্মজ্ঞানের এমন একটি পথ দেখান হয়েছে যাতে বিভিন্ন মতবাদ ও সংস্কার, শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কলাপ ও পূজা-পদ্ধতি তথা সকল কর্মকাণ্ড থেকে আমাদের মুক্তি দিয়ে বিশুদ্ধ আত্ম-স্বরূপে থাকার যোগ্যতা দান করে। সকল ধর্মের নির্যাস ব্যক্তিগত আন্তর অনুভব ও দিব্য সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ। এতে উপাসনার থেকে অনুসন্ধানই বেশী। এটি একটি 'হওয়ার' পথ, মুক্তির পথ।

গ্রীক দেশের বিখ্যাত উক্তি 'নিজেকে জানো' আর উপনিষদের 'আত্মানম্ বিদ্ধি' একই, নিজের স্বরূপ জানো। একটা পৃথক-করণের প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা শরীর, মন, বুদ্ধির অতীত হয়ে বিশ্বাত্মার পর্যায়ে পৌঁছাই। সেই চেতনাই প্রকৃত চেতনা যা পৃথিবীতে আসা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে। "পরমকে পাওয়ার জন্য আমাদের উচ্চতম স্থিতিতে পৌঁছাতে হবে আর সেইখানে দৃষ্টি স্থির রেখে প্রতিটি পরিধেয় আবরণ ত্যাগ করতে হবে, যা নীচে আসার জন্যে একটি একটি করে পরা হয়েছে। ঠিক যেমন গ্রীকদের শাস্ত্রীয় প্রথানুযায়ী আত্মশুদ্ধির পর যাদের দেবালয়ের গর্ভগৃহে প্রবেশের অধিকার লাভ হয় তারা তাদের সকল আবরণ ত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ভিতরে প্রবেশ করে[১]।" আমরা অনন্ত সত্তায় ডুবে যাই, যার না আছে সীমা, না আছে সংখ্যা। এটি শুদ্ধ সত্তা, সেখানে স্ববিরোধী কিছুই নেই। সেখানে এমন কিছু নেই যে দ্রষ্টার বিরোধী হতে পারে। সে নিজেকে প্রতিটি বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে। আত্মা সন্ময় হয়ে যায় কারণ সেখানে আর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা, প্রিয় বা অপ্রিয় বলে কিছু নেই। এগুলো আর জ্ঞানের বিকারের মাধ্যম হয় না।

---

১. প্লোটিনাস্ এনীডস্ ১. ষষ্ঠ. ৬

শিশু আত্মদর্শনের খুব নিকটে। সত্যের রাজ্যে প্রবেশ করতে হলে আমাদের শিশু হতে হবে। সুতরাং আমাদের পাণ্ডিত্যের অহংকার ত্যাগ করতে হয়। এরূপে দেহ থাকাকালেই পুনর্জন্মের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয় যে, শিশুর মুখের কথা বিদ্বানের জ্ঞান হতে অধিক সারগর্ভ।

শ্রীরমণ মহর্ষি ভারতীয় শাস্ত্রের আধারের ওপর এমন একটি পথ প্রদর্শন করেছেন যা যুক্তিসহ ও নীতিগত হওয়া সত্ত্বেও সারতঃ আধ্যাত্মিক।

এস রাধাকৃষ্ণণ
ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি, ভারত

সূচী

শ্রীরমণায়ন সম্ভার

১। উপদেশ মঞ্জরী ও স্বরচিত কবিতা
২। শ্রীরমণ বাণী
৩। স্তুতিপঞ্চকম্ ও সদ্‌বিদ্যা
৪। রমণ মহর্ষি ও আত্মজ্ঞানের পথ
৫। শ্রীরমণ বচনামৃত—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ
ঐ তৃতীয় ভাগ (যন্ত্রস্থ)
৬। শ্রীরমণাশ্রমের পত্রাবলী—প্রথম খণ্ড
ঐ দ্বিতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)
৭। শ্রীরমণ ত্রয়ী „
৮। শ্রীরমণ সিদ্ধান্ত রত্ন „
৯। শ্রীরমণায়ন „

ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষি

ওঁ

নমো ভগবতে শ্রীরমণায়

রমণ মহর্ষি

ও

আত্মজ্ঞানের পথ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম জীবন

শৈবেরা 'অরুদ্রদর্শন' দিবস শ্রদ্ধাপূর্বক মহাসমারোহে পালন করে। এইদিন শিব নটরাজ রূপে অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গীতে নিজ ভক্তদের দর্শন দিয়েছিলেন। ১৮৭৯ সালে এই দিনে আবছা অন্ধকারে দক্ষিণ ভারতের তামিল প্রদেশের তিরুচুড়ী সহরে শিব-ভক্তরা খালি পায়ে ধূলা ভরা রাস্তা দিয়ে মন্দিরের পবিত্র পুষ্করিণীতে স্নানে যাচ্ছিল। স্নান ব্রাহ্মমুহূর্তে করাই প্রচলিত রীতি। সূর্যোদয়ের রক্তিমা পড়ছিল সেই বিশাল চতুষ্কোণ সরোবরের পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যাওয়া কেবল ধুতি পরা খালি গা পুরুষ ও লাল সোনালী শাড়ি পরা মহিলা স্নানার্থীদের ওপর। উৎসবটা ডিসেম্বর মাসে পড়ায় হাওয়ায় ঠাণ্ডার আমেজ; যাহোক, এদেশের লোকেরা শীত-সহিষ্ণু। কয়েকজন গাছের তলায় বা পুকুরপাড়ের ঘরে কাপড় ছাড়লে, কিন্তু বেশীর ভাগই রৌদ্রে কাপড় শুকিয়ে যাবে ভেবে ভিজে কাপড়েই ছোট সহরের অতি প্রাচীন মন্দিরের দিকে চলল। তামিল প্রদেশের তেষট্টি জন শৈব ভক্তকবিদের অন্যতম সুন্দরমূর্তিস্বামী অতীতে স্তুতি-বন্দনা গানে এই মন্দিরকে মুখরিত করেছিলেন।

মন্দিরের শিবমূর্তিকে ফুলের মালায় সাজিয়ে ঢাক-ঢোল, শঙ্খধ্বনি আর স্তোত্র পাঠের সঙ্গে সারা দিন ও রাত শোভাযাত্রা করান হয়েছে।

রাত্রি একটা বাজে, শোভাযাত্রা শেষ হল, তখনও অরুদ্রদর্শন চলছে কারণ হিন্দুমতে সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয় অবধি দিন হয়। শিবমূর্তি মন্দিরে ফিরে গেলেন আর যার মধ্যে শিব শ্রীরমণ রূপে আবির্ভূত হবেন সেই শিশু বেঙ্কটরমণ, সুন্দরম আইয়ার ও তাঁর পত্নী আলা-গাম্মালের ঘরে সংসারে প্রবেশ করলেন। হিন্দুদের পর্বও পশ্চিমী ইস্টারের মত চাঁদের তিথি অনুসারে হয় ; এই বছর অরুদ্রদর্শন ২৯শে ডিসেম্বর পড়েছিল। শিশুটি সময়, দিন ও বর্ষ হিসাবে প্রায় তু'হাজার বছর আগে জন্মানো বেথেলহেমের সেই দিব্য শিশুটির থেকে কিছু পরেই জন্ম নিলে। দেহাবসানেও এরূপ সংযোগ ঘটতে দেখা গেল, শ্রীরমণ ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যায় দেহত্যাগ কবেন, গুডফ্রাইডের বিকালে, সময় ও বারের একটু পরে। তু'টি দিনই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। মধ্য-রাত্রি ও মকর সংক্রান্তির সময় হতে সূর্যদেব পৃথিবীতে আলোর উপচয় শুরু করেন। আর বাসন্তিক বিষুবে দিন ও রাত সমান হয়ে দিন বড় হতে আরম্ভ করে।

সুন্দরম আইয়ার সে সময়ের পক্ষেও অত্যন্ত হাস্যকর বেতন মাসিক তু'টাকায় একজন হিসাবনবীসের সহকারী রূপে জীবিকা আরম্ভ করেন ; দরখাস্ত লেখার ব্যবসা শুরু করেন। তার কিছুদিন পরে অপ্রমাণিক উকিল হিসাবে কাজ করার অনুমতি পান। অর্থাৎ একরূপ গ্রামীণ উকিলের কাজ। তিনি সে কাজে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন ও একটি বাড়ীও করেন, সেখানে শিশুটির জন্ম হয়। বাড়ীটি যথেষ্ট বড় ছিল যার জন্য এর এক অংশ অতিথিদের জন্য রাখা হয়েছিল। ইনি যে কেবল সামাজিক ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন তা নয়, সরকারী ব্যক্তিদের ও সহরে নবাগতদেরও বাড়ীতে আশ্রয় দিতেন, যার ফলে তিনি সহরের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি বলে পরিচিত হন, এতে তাঁর ব্যবসারও খুব উন্নতি হয়।

সাফল্য লাভ করলেও, এই পরিবারের ওপর একটি বিচিত্র বিধান এসে পড়েছিল। বলা হয় যে, একবার একজন পরিব্রাজক সাধু

তাঁদের কোন পূর্বপুরুষের ঘরে ভিক্ষার জন্য আসে, ভিক্ষা না পাওয়ায় সাধু শাপ দেয় যে, এঁদের প্রত্যেক পুরুষে একজন করে সাধু হবে ও ভিক্ষা করে খাবে। শাপ আর বর যাই বল এটা সত্য হয়েছিল। সুন্দরম আইয়ারের এক কাকা গেরুয়া পরে দণ্ড কমণ্ডলু নিয়ে বেরিয়ে যায়, তাঁর বড় ভাই একজন প্রতিবেশীর জমি দেখতে যাচ্ছি বলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, আর সেখান থেকে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেয়।

সুন্দরম আইয়ারের পরিবার সম্বন্ধে কোন বিশেষত্ব দেখা যায়নি। বেঙ্কটরমণ সাধারণ স্বাস্থ্যবান বালক হয়ে বড় হয়ে উঠলেন। কিছু-দিনের জন্য স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ক'রে, এগার বছর বয়সে ডিণ্ডিগুলে পড়তে যান। তাঁর নাগস্বামী নামে দু'বছরের বড় এক ভাই ছিল। ছ'বছর পরে তৃতীয় ছেলে নাগসুন্দরম হল ও আরও দু'বছর পরে মেয়ে আলামেলু। একটি সুখী অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবার।

বেঙ্কটরমণের বারো বছর বয়সে সুন্দরম আইয়ার মারা যান। আর পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। নিকটে মাদুরা সহরে তাদের কাকা সুব্বিয়ারের বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা চলে যায়। বেঙ্কটরমণকে প্রথমে স্কট্স্ মিডিল স্কুলে ও পরে আমেরিকান হাই স্কুলে দেওয়া হয়। সে সময় তাঁর ভবিষ্যতে বিদ্বান হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি ; খেলা-ধূলা ও বাইরে ঘোরার বেশ সখ ছিল আর কুস্তী, ফুটবল ও সাঁতারে খুব আনন্দ পেতেন। তাঁর একমাত্র গুণ ছিল অসাধারণ স্মরণশক্তি, যার দ্বারা তিনি একবার শোনা পাঠ মুখস্থ করে নিজের অলসতার দোষ পূরণ করতেন।

ছোটবেলায় তাঁর একমাত্র অসামান্য লক্ষণ হল অসাধারণ গাঢ় ঘুম। শ্রীভগবানের এক ভক্ত দেবরাজ মুদেলিয়ার নিজের ডায়েরীতে একটি স্মৃতিচারণ লিখেছে। শ্রীভগবান অনেক বছর পরে কথা প্রসঙ্গে তাঁর এক আত্মীয় আসা উপলক্ষ্যে ভক্তদের বলেছিলেন—

"তোমাকে দেখে আমার ছেলেবেলাকার ডিণ্ডিগুলের একটা

ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। তোমার কাকা পেরিয়াপ্পা শেষায়ার তখন সেখানে থাকত। তার বাড়ীতে কি একটা উৎসব উপলক্ষ্যে সবাই গিয়েছিল আর সেখান থেকে মন্দিরে যায়। আমি বাড়ীতে একলা ছিলাম। আমি বাইরের ঘরে পড়-ছিলাম কিন্তু খানিক বাদে সামনের দরজা বন্ধ ক'রে জানালা লাগিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। তারা মন্দির থেকে ফিরে চীৎকার ক'রে, দরজা ধাক্কা দিয়ে কিছুতেই আমায় জাগাতে পারলে না। শেষকালে সামনের বাড়ী থেকে একটা চাবি নিয়ে কোন রকমে দরজা খুললে; তারপর তারা আমায় ধাক্কা দিয়ে জাগাতে চেষ্টা করলে। সব ছেলেরা আমায় তাদের মনের সাধে পেটালে, তোমার কাকাও মারলে কিন্তু কিছুই হল না। আমি পরের দিন সকালে তারা না বলা অবধি কিছুই জানতে পারিনি···। এ রকম ব্যাপার মাদুরা থাকতেও হয়েছিল। আমায় ছেলেরা জাগা অবস্থায় ছুঁতে সাহস করত না, তাদের যদি কোন প্রতিশোধ নেওয়ার থাকত, আমি ঘুমিয়ে পড়লে তারা আসত আর যেখানে ইচ্ছা আমায় বয়ে নিয়ে যেত, যত ইচ্ছা মারধর করত ও তারপর আবার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যেত, আর পরদিন তারা আমায় না বললে, আমি জানতেও পারতাম না।"

শ্রীভগবান এর কোন গুরুত্ব দিতেন না আর বলতেন এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কোন কোন দিন রাত্রে অর্ধঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে থাকতেন। সম্ভবতঃ এই দুই অবস্থা আধ্যাত্মিক জাগরণের পূর্ব সঙ্কেত। প্রগাঢ় নিদ্রা যদিও তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন ও নিষেধাত্মক তবু এটা মনকে ত্যাগ করে মনের অতীতে গভীরে যেতে পারার ও অর্ধঘুমন্ত অবস্থা, সব কিছুর সাক্ষী হয়ে তটস্থ অবস্থায় থাকার ক্ষমতার ইঙ্গিত করে।

আমাদের কাছে শ্রীভগবানের ছেলেবেলাকার কোন ছবি নেই। তিনি একবার তাঁর বিচিত্র ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে বলেছিলেন যে

ছোটবেলায় একসময় তাঁদের পরিবারের সকলের ফোটো তোলা হয়; তাঁকে বেশ অধ্যয়নশীল দেখাবে বলে একটা বড় গোছের বই ধরতে বলা হয়। কিন্তু ঠিক ফোটো তোলবার মুহূর্তে তাঁর গায়ে একটা মাছি বসে আর তিনি সেটা তাড়াতে যান। যা হোক সে ছবি আর পাওয়া যায়নি, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সেটা আর নেই।

অরুণাচলের সঙ্কেতই উষার পূর্বাভাস। বিত্থালয়ের ছাত্র বেঙ্কটরমণ কোন দার্শনিক গ্রন্থ পড়েন নি। তাঁর এইটুকু ধারণা ছিল যে, অরুণাচল একটা পুণ্যময় স্থান। ভবিষ্যতের পূর্ব সূচনাই তাঁকে বিচলিত করে। একদিন তাঁর একজন বয়স্ক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয় যাকে তিনি তিরুচুড়ী থাকা কালেই জানতেন। সে কোথা থেকে আসছে জানতে চাইলে বৃদ্ধ লোকটি বলে, "অরুণাচল থেকে।"

হঠাৎ পাহাড়টি যে বাস্তব, এই পৃথিবীতেই আছে আর লোকে দেখতে যেতে পারে শুনে বেঙ্কটরমণ অভিভূত হলেন, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে কেবল জিজ্ঞাসা করলেন, "কি! অরুণাচল থেকে? সেটা কোথায়?"

সেই বৃদ্ধ বালকের নির্বুদ্ধিতায় আশ্চর্য হয়ে বললে, "অরুণাচল হল তিরুভন্নমালাই।"

পরে শ্রীভগবান তাঁর অরুণাচল স্তুতি-অষ্টকমের প্রথম শ্লোকে এর উল্লেখ করেছেন।

অচল অরুণাচল, শোন! এর মর্ম
বুদ্ধির অগম্য, রহস্যপূর্ণ কর্ম।
মনে হল বাল্যে, সরল হৃদয়ে
এ এক অপার সৌন্দর্যময়,
তিরুভন্নমালাই আর এই
দুই এক জেনেও মর্ম জানি নাই।
রুদ্ধ মনে, বদ্ধ পাশে, নিকটে এসে
দেখিলাম, কি এক অমোঘ স্থৈর্যে॥

এটা ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে ঘটল। তাঁর তখন হিন্দুমতে সতের আর ইংরাজী মতে ষোল বছর বয়স।

দ্বিতীয় পূর্বাভাস এব কিছু পরেই এল। এবার এটা একটা বই-এর মাধ্যমে এল। দিব্যানুভূতি যে পৃথিবীতে সম্ভব একথা জেনে তাঁর হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেল। তাঁব কাকা একখানা 'পেরিয়াপুরাণ' এনেছিল, এটি তেষট্টিজন তামিল শৈব ভক্ত-কবিদের জীবনগাথা। বেঙ্কটরমণ যখন সেটা পড়লেন তখন তাঁব হৃদয় দিব্য বিস্ময়ে অভিভূত হল—এত বিশ্বাস, এরূপ প্রেম, এমন দিব্যোন্মাদনা হওয়া সম্ভব আব মানবজীবন এত সৌন্দর্য-মাধুর্যে ভরা! দিব্য মিলনের আকুল আহ্বানে সর্বস্ব ত্যাগের কাহিনী পড়ে শ্রদ্ধায় ও আকাঙ্ক্ষায় তাঁব মন ভরে গেল।

সমস্ত স্বপ্নের থেকে বড়, সকল কামনাব শ্রেষ্ঠ একটা কিছুর বাস্তব সম্ভাবনার ঘোষণা শোনা গেল, আর এই অভিব্যক্তিতে তিনি আনন্দময় কৃতজ্ঞতায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন।

সেইদিন থেকে একটা চেতনার স্রোত যাকে শ্রীভগবান ও তাঁর ভক্তেরা ধ্যান বলেন, বইতে লাগল। এ অবস্থা কোন কিছু জানা নয়, সব জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ দ্বৈত বোধের অতীত, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিকে কর্মক্ষম রেখে তার অতীত আনন্দময় চেতনা।

শ্রীভগবান তাঁর অভ্যস্ত সরলতার সঙ্গে এব বর্ণনা দিয়ে, মাদুরায় মীনাক্ষী মন্দির দর্শনের সময় এই চেতনা কিভাবে তাঁর ভিতর প্রস্ফুটিত হল বলতেন। তিনি বলেছিলেন, "প্রথমে আমি ভাবলাম এ এক রকম জ্বর হয়েছে, পরে ভাবলাম তাহলেও বেশ মধুর, তবে এটা থাক।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাগরণ

ভগবান রমণ মহর্ষির জ্ঞানমার্গের উপদেশ ও শিক্ষানুসারে যদি এই চেতনার স্রোতকে অবিরত প্রযত্নের দ্বারা প্রবাহিত রাখা যায় তবে এটি ক্রমশঃ আরও শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ়তর হয়ে সময়ে আত্মোপলব্ধিতে পর্যবসিত হয়; অবশেষে সহজ সমাধিতে নিয়ে যায়। সহজ সমাধি সাধারণ জীবনযাত্রার কোনরূপ হানি না ক'রে নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময় অবস্থা। পার্থিব জীবনে এই স্থিতি লাভ করা অত্যন্ত দুর্লভ। এই জীবন আত্মোপলব্ধি-রূপ দীর্ঘ তীর্থপথের একটু অংশ, ঠিক যেমন একজন তীর্থযাত্রী রাতে কোন পান্থশালায় ঘুমিয়ে সকালে সেখানেই জেগে ওঠে, সেরূপ প্রত্যেক পথিক যতদূর অবধি চলেছে তার পর থেকে চলা শুরু করে। আর আগামী দিনে সে কতদূর এ গিয়ে যাবে সেটা অংশতঃ কতদূর সে চলে এসেছে আর অংশতঃ তার প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে। এমনকি জীবনটা যে একটা তীর্থযাত্রা, তার যে একটা লক্ষ্য আছে এবং এই পথে চলার জন্য দৃঢ় নিশ্চয়তা এটাও এক বিরাট আবিষ্কার বা প্রাপ্তি। শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে এটি কয়েক মাস পরে বিনা অনুসন্ধানে, বিনা চেষ্টায় ও বিনা প্রস্তুতিতে ঘটে গেল। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন—

"আমি চিরকালের মত মাদুরা ছাড়ার ছ' সপ্তাহ আগে আমার জীবনে সেই মহান পরিবর্তন হয়ে গেল। এটা নিতান্ত আকস্মিক। আমি আমার কাকার বাড়ীর দোতলার ঘরে একলা বসেছিলাম। আমার প্রায় কোনদিন কোন অসুখ হত না, আর সেদিন আমার শরীরে কিছুমাত্র অসুস্থতা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একটা দারুণ মৃত্যুভয় আমাকে এসে ধরল। স্বাস্থ্য কিছু খারাপ ছিল না যার জন্যে এরকম হতে পারে। এটা যে কেন হল তার জন্য বা ভয়ের কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করলাম না। কেবল অনুভব করলাম আমি এখন মারা

যাচ্ছি আর এ সম্বন্ধে কি করা যায় ভাবতে লাগলাম। আমার ডাক্তার, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদের ডাকার কথা একবারও মনে হল না। মনে হল এই সমস্যাটাকে সেইক্ষণে আমায় নিজেকেই সমাধান করতে হবে।

"মৃত্যুভয়ের আঘাতে আমার মন অন্তর্মুখী হল, আমি আমার মনকে মনে মনেই বললাম 'এখন মৃত্যু এসে গেছে, এর অর্থ কি? কি মারা যাচ্ছে? এই শরীরটাই মারা যায়।' আমি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর অভিনয় করা শুরু করে দিলাম। হাত পা ছড়িয়ে শক্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম। আর যাতে অনুসন্ধান আরও বাস্তবানুগামী হয় সেজন্য শবের মত পড়ে রইলাম। শ্বাসরুদ্ধ করে, দুই ঠোঁট শক্ত করে চেপে ধরলাম যাতে 'আমি' বা অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ না হয়। আমি নিজেকেই বললাম 'তা হলে শরীরটা এখন মরে গেল। এটাকে এখন শ্মশানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আর দাহ করা হবে, এটা ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু এই শরীরের মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও কি মরে যাব? আমি কি শরীর? আমার শরীর কোন কথা বলে না, এটা জড়, কিন্তু আমি আমার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ শক্তি অনুভব করছি, তাছাড়া নিজের অন্তরে একটা 'আমিত্ব'ও বোধ করছি। সুতরাং আমি শরীরের অতিরিক্ত আত্মা। শরীরের মৃত্যু হয় কিন্তু আত্মাকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না। তার অর্থ আমি অমর আত্মা।' এগুলো কেবলমাত্র শুষ্ক বিচার নয় পরন্তু জীবন্ত সত্যের মত কোনরূপ মানসিক প্রক্রিয়া ছাড়াই স্পষ্ট আমার মধ্যে বিদ্যুতের মত ঝলকে উঠল। 'আমি' একটা কিছু স্পষ্ট সত্য, আমার বর্তমান অবস্থার একমাত্র সত্য, আর আমার যাবতীয় সচেতন শারীরিক ক্রিয়াশীলতা সেই 'আমি'তে কেন্দ্রিত রয়েছে। সেই মুহূর্ত থেকে 'আমি' বা আত্মা নিজের ওপরই একটা প্রবল আকর্ষণে কেন্দ্রীভূত হল।

মৃত্যুভয় চিরকালের জন্য চলে গেল। আত্মস্থিতি সেই থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে লাগল। অন্য চিন্তাগুলো সানাই-এর সরগমের মত আসে যায় কিন্তু 'আমিটা' ঠিক যেন প্রধান শ্রুতির মত পোঁ ধরেই আছে আর তার ওপর সব রাগ ও রাগিণী খেলে যাচ্ছে। শরীর যাতেই ব্যস্ত থাক না কেন, কথা বলা, পড়া বা অন্য কিছু, আমিটা কিন্তু সেই 'আমিতে'ই ধরা আছে। এই ঘটনা হওয়ার আগে আমার নিজের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না আর তার প্রতি কোন আকর্ষণও ছিল না। আমি এর প্রতি কোন অনুভবনীয় বা প্রত্যক্ষ আগ্রহও অনুভব করিনি, তাতে স্থায়িভাবে থাকা তো দূরের কথা।"

এইরূপে বাগাড়ম্বর ও বাক্য বিন্যাস না করে সাদাসিধে সরল ভাষায় বর্ণনা কংলে এ অবস্থা অহংকার থেকে ভিন্ন মনে হয় না, পরন্তু এটা কেবল 'আমি' বা 'আত্মা' শব্দের দু'টি অর্থ হওয়ার জন্য। পার্থক্যটা মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা থেকে স্পষ্ট হয়, কারণ অহংকারে যার চেতনা কেন্দ্রীভূত সে মনে করে 'আমি' একটা ব্যক্তিগত সত্তা, তার সেই অহংকারসত্তা লোপের ভয়জনিত মৃত্যুভয় থাকে, অপরপক্ষে এখানে 'আমি' যে সমষ্টিগত অবিনাশী আত্মা ও প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে একই-রূপে বিরাজমান, এটা উপলব্ধি হওয়ার ফলে মৃত্যুভয় চিরতরে অদৃশ্য হল। এমনকি একথা বলাও ঠিক হয় না যে, তিনি জানতেন যে, তিনি বিশ্ব চেতনার সঙ্গে একাত্ম, তাহলে মনে হবে যে এটা জানার জন্য একটা পৃথক 'আমি' ছিল, অন্যপক্ষে তাঁর সেই 'আমি'টাই সেই পরম-চৈতন্য।

কিছুকাল পরে শ্রীভগবান একজন পাশ্চাত্য জিজ্ঞাসু পল্ ব্রাণ্টনের কাছে এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা করেন।

ব্রাণ্টন—আপনি যে আত্মার কথা বলছেন তার স্বরূপ কি? আপনি যা বলছেন তা যদি সত্য হয় তবে এ অবস্থায় মানুষের দু'টি আত্মা থাকতে হবে।

শ্রীরমণ—একজনের দু'টি পরিচয় বা দু'টি আত্মা হওয়া কি সম্ভব ? এ বিষয়টা বুঝতে গেলে মানুষকে আগে আত্ম-বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ সে অন্যেবা যেমন ভাবে, সেইরূপে বহুকাল ধরে ভাবতে অভ্যস্ত আর সে তার প্রকৃত 'আমি' স্বরূপের সম্মুখীন হয়নি। তার কাছে তাব নিজেব প্রকৃত স্বরূপের চিত্র নেই, সে অনাদিকাল থেকে নিজেকে শরীর বা মস্তিষ্ক বলে নির্ধারণ করে এসেছে। সেই জন্য আমি তোমায় 'আমি কে ?' রূপ বিচার চালিয়ে যেতে বলছি।

তুমি আমায প্রকৃত আত্মার কথা বর্ণনা করতে বলছ। কি বলা যেতে পারে ? এটা সেই যা থেকে ব্যক্তিগত সত্তার উৎপত্তি হয় আর যাতে সেই সত্তাকে আবার লয় হয়ে যেতে হবে।

ব্রাণ্টন—লয় ? একজন নিজের ব্যক্তিগত সত্তা কি করে হারাতে পারে ?

শ্রীরমণ—প্রত্যেক মানুষের প্রথম ও প্রধান চিন্তা, মৌলিক চিন্তা হল 'আমি'-চিন্তা। কেবল এই 'আমি'-চিন্তার জন্ম হওয়ার পরই অন্যান্য চিন্তার উদয় হতে পারে। প্রথমে উত্তম পুরুষ 'আমি' সর্বনাম মনে উৎপন্ন হলেই মধ্যম পুরুষ 'তুমি' সর্বনামের উদয় হয়। তুমি যদি মনে মনে এই 'আমি'-র সূত্রটা ধরে তাকে তার উৎস অবধি অনুসরণ করতে পার তাহলে তুমি আবিষ্কার করবে যে, এটা যেমন প্রথম চিন্তা যা মনে ওঠে, ঠিক তেমনি এটাই শেষ চিন্তা যা লয় হয়। এটা অনুভবের দ্বারা জানা যায়।

ব্রাণ্টন—আপনি বলতে চান যে নিজের মধ্যে এ রকম একটা মানসিক বিশ্লেষণ করা সম্ভব ?

শ্রীরমণ—নিশ্চয়ই। যতক্ষণ না শেষ 'আমি'-চিন্তা ক্রমশঃ লয় হয় ততক্ষণ অন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব।

ব্রাণ্টন—কি প'ড়ে থাকবে ? সেই লোকটি কি একেবারে অচেতন হয়ে যাবে কিংবা জড়বুদ্ধি হয়ে যাবে ?

শ্রীরমণ—না, বরং তার বিপরীত, সে সেই চৈতন্য লাভ করবে যা অবিনাশী আর সে নিজের প্রকৃত স্বরূপে জেগে উঠে প্রকৃত জ্ঞানী হবে। যা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত স্বরূপ।

ব্রাণ্টন—কিন্তু এর সঙ্গে নিশ্চয় 'আমিত্বে'র ভাবও থাকবে ?

শ্রীরমণ—'আমিত্বে'র ভাব ব্যক্তি, শরীর ও মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত। যখন মানুষ তার প্রকৃত আত্মাকে প্রথমবার অনুভব করে, সেই সময়ে তার সত্তার অন্তস্তল থেকে আরও একটা কিছু উঠে তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। সেই বস্তুটা মনের অতীত, অসীম, দিব্য ও শাশ্বত। কেউ একে 'স্বর্গরাজ্য' বলে, কেউ 'আত্মা', আবার কেউ 'নির্বাণ' আর হিন্দুরা একে 'মুক্তি' বলে। তুমি একে যা ইচ্ছা নাম দিতে পার। যখন এটা হয় তখন মানুষ সত্যই নিজেকে হারায় না বরং নিজেকে খুঁজে পায়।

যতক্ষণ না মানুষ এই প্রকৃত আত্মার অনুসন্ধান করবে, ততক্ষণ তার জীবনের প্রতি পদে পদে সংশয় ও অনিশ্চয়তা ঘিরে থাকবে। বড় বড় রাজা ও রাজনীতিবিদ্গণ সকলের ওপর প্রভুত্ব করতে চায় কিন্তু তারা নিজেরা ভাল করেই জানে যে তাদের নিজেদের ওপর কোন আধিপত্য নেই। যে ব্যক্তি তার অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করেছে বিশ্বের মহত্তম শক্তিও কিন্তু তার আজ্ঞাধীন। যখন তোমার নিজেকেই জানা নেই তখন আর সবকিছু জেনে কি লাভ ? মানুষ তার নিজের প্রকৃত স্বরূপের অন্বেষণকে এড়াতে চায় কিন্তু এর থেকে শ্রেষ্ঠ অন্বেষণ আর কি হতে পারে ?

সমস্ত সাধনাটায় বড় জোর আধঘণ্টা লেগেছিল ; তবুও এটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেন না এটা একটা সাধনা, এটা অনায়াস জাগরণ নয়, এখানে জ্ঞানের জন্য প্রয়াস ছিল। কারণ সাধারণতঃ গুরু যে পথে সাধনা ক'রে সিদ্ধিলাভ করেছেন সেই পথেই শিষ্যদের চালিত করেন। যেটা শ্রীভগবান আধঘণ্টায় শেষ করেছিলেন সেটা যে কেবল এক জীবনব্যাপী সাধনা তা নয় কারণ বেশীর ভাগ

সাধকের পক্ষে এটা বহু জীবনব্যাপী সাধনার ফল। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এটা আত্মানুসন্ধানের প্রয়াসের দ্বারাই সাধিত হয়েছিল ; যা তিনি পরে তাঁর ভক্তবৃন্দকে বলতেন। তিনি তাদের এ সাবধানও করতেন যে, যে সিদ্ধি এর লক্ষ্য তা সাধারণতঃ সহজে লাভ করা যায় না, কিন্তু দীর্ঘ প্রযত্নের ফলে লাভ হয়। তিনি আরও বলতেন "নির্বিশেষ পূর্ণ সত্তা যা তোমার প্রকৃত স্বরূপ তা লাভের পক্ষে এটি একটি অব্যর্থ ও প্রত্যক্ষ উপায়।" (শ্রীরমণবাণী ২য় ভাগ)। তিনি বলেছেন যে, এর ফলে সেই মুহূর্ত থেকে রূপান্তর আরম্ভ হয়ে যায় যদিও এটা সম্পূর্ণ হতে হয়ত বহুদিন লাগে। "কিন্তু অহং ভাব যতই নিজেকে জানতে চেষ্টা করে, সে ক্রমশঃ যাতে সে অভিভূত হয়ে আছে সেই শরীরের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে আত্মার প্রতি অধিকতর সচেতন হতে আরম্ভ করে।"

এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে শ্রীভগবান সাধনার সিদ্ধান্ত ও অভ্যাস সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জেনেও একাগ্রতার জন্য প্রাণায়ামের সাহায্য নিয়েছিলেন। সুতরাং প্রাণায়াম যে মনের একাগ্রতার সাহায্য করে একথা তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি কিন্তু একমাত্র এইজন্য ছাড়া প্রাণায়ামের ব্যবহারকে উৎসাহ দিতেন না—বস্তুতঃ এরূপ প্রাণায়ামের উপদেশও কখন দেন নি।

প্রাণায়ামও একটা সাধনা। অন্যান্য বিধির মত মনের একাগ্রতার জন্য এটাও করা হয়। প্রাণায়ামে মনের চঞ্চলতা দমন হয়ে একাগ্রতা লাভের সাহায্য হয়, সেজন্য এটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু একজনকে সেখানেই থামলে চলবে না। প্রাণায়ামের দ্বারা মনের নিয়ন্ত্রণ লাভ হলে তজ্জনিত বিভিন্ন অনুভূতি লাভে সন্তুষ্ট না হয়ে, সেই নিয়ন্ত্রিত মন যতক্ষণ না আত্মাতে লীন হয় ততক্ষণ 'আমি কে?'-রূপ অনুসন্ধান করতে হবে।

চৈতন্যের এই পরিবর্তনের ফলে স্বভাবতঃ বেঙ্কটরমণের মূল্যবোধ ও স্বভাবের পরিবর্তন হল। আগে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনে হত এখন

সে সব অকিঞ্চিৎকর মনে হতে লাগল, পরম্পরাগত জীবনের লক্ষ্য তুচ্ছ হয়ে গেল, যাকে এতদিন অগ্রাহ্য করা হয়েছিল সেটা এখন অবশ্য-করণীয় হল। এই নবীন চৈতন্যময় জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞের পক্ষে সহজ হয়নি। তিনি এ সম্বন্ধে কারও সঙ্গে কোন কথা বলেন নি ; পরিবারের সঙ্গে থেকে স্কুলে যেতে লাগলেন। বস্তুতঃ তিনি বাহ্যতঃ যতদূর সম্ভব কম পরিবর্তন দেখানো যায় তাই করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করলে আর সেটা মোটেই পছন্দ করলে না। এটাও তিনি বর্ণনা করেছেন।

> "এই নূতন চেতনার ফল শীঘ্র আমার জীবনে দেখা গেল। সর্বপ্রথমে আমার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল তা নষ্ট হ'য়ে গেল। পড়াশুনা কেবল যান্ত্রিক-ভাবে করতে লাগলাম। আমি আমার আত্মীয়দের খুশি করার জন্য, যেন পড়ছি বলে সামনে বই খুলে রাখতাম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার মন এই তুচ্ছ বিষয় থেকে সুদূরে কোথাও চলে যেত। লোকেদের সঙ্গে ব্যবহারেও আমি নম্র ও বাধ্য হয়ে গেলাম। আগে আমায় অন্য ছেলেদের থেকে বেশী কাজ দিলে আপত্তি করতাম, আর কোন ছেলে আমার সঙ্গে লাগতে এলে তাকে উচিত শিক্ষা দিতাম। কেউ আমার সঙ্গে ঠাট্টা, ইয়ার্কি বা পেছনে লাগতে সাহস করত না। এখন সব বদলে গেল। যে-কোন কাজ দেওয়া হোক না, যত ঠাট্টা করা আর পেছনে লাগা হোক না কেন আমি শান্তভাবে সহ্য করতাম। আগেকার অহংকার যে অভিযোগ করত ও প্রতিশোধ নিত সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলা ছেড়ে দিয়ে একান্তে থাকতে লাগলাম। প্রায়ই একলা কোন একটা ধ্যানের আসনে বসে, আত্মার যে শক্তির ধারায় আমি গঠিত,

তাতে লীন হয়ে যেতাম। দাদার ব্যঙ্গ করে আমায় 'সাধু' বা 'যোগী' বলা ও প্রাচীনকালের ঋষিদের মত বনে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া উপেক্ষা করেও এইভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

"আমার আরও একটা পরিবর্তন হল যে, খাওয়ার বিষয়ে কোন রুচি বা অরুচি রইল না। যা দেওয়া হত সুস্বাদ বা বিস্বাদ, ভাল বা মন্দ সমান উদাসীনতার সঙ্গে আমি খেয়ে যেতাম।

"নূতন অবস্থায় আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হল মীনাক্ষী মন্দির সম্বন্ধে আমার ধারণার পরিবর্তন। আগে আমি মাঝে মাঝে বন্ধুদের সঙ্গে শ্রীমূর্তি দর্শন করতে ও কপালে বিভূতি-কুমকুম লাগাতে সেখানে যেতাম। আধ্যাত্মিকভাবে কিছুমাত্র প্রভাবিত না হয়ে বাড়ী ফিরে আসতাম। কিন্তু জাগরণের পর, প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে যেতাম। শিব, মীনাক্ষী, নটরাজ বা তেষট্টিজন শৈব ভক্তদের মূর্তির সামনে একলা স্থির হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম আর সেই অবস্থায় হৃদয়ে নানা ভাবের তরঙ্গ উছলে উঠে আমায় অভিভূত করত। দেহাত্মবোধ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার শরীরকে আমি বলা ত্যাগ করার ফলে সে এখন একটা নূতন অবলম্বন খুঁজছিল, সেজন্যই মন্দিরে ঘন ঘন যাওয়া আর অশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমে হৃদয় নিবেদন। এটা আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের লীলা। সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বনিয়ন্তা ও ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কখন কখন কৃপার জন্য প্রার্থনা করতাম যাতে আমার ভক্তি তেষট্টিজন শৈব ভক্তদের মত প্রবল ও চিরন্তন হয়। বেশীর ভাগই কোন প্রার্থনা না করে কেবল নীরবে আপন আন্তর সত্তার অমৃত প্রবাহকে অনন্ত সত্তায় মিশে যেতে দিতাম। এই প্রবাহের বাহ্যিক চিহ্নরূপে যে অজস্র অশ্রুধারা বয়ে যেত সেটা কোন বিশেষ সুখ বা দুঃখের জন্য নয়। আমি

নৈরাশ্যবাদী ছিলাম না। জীবন সম্বন্ধে কিছু জানতাম না আর সেটা যে দুঃখপূর্ণ তাও জানতাম না। পুনর্জন্ম বোধ করা বা মোক্ষ বা বৈরাগ্য লাভ বা মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হইনি। পেরিয়াপুরাণ, বাইবেল, তায়ুমনাবর ও তেবরমের কিছু অংশ ছাড়া কোন বই পড়িনি। আমার ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা পুরাণে যা পাওয়া যায়, তাই ছিল। ব্রহ্ম, সংসার ইত্যাদি শব্দ বা এসব তত্ত্ব কখন কানেও শুনিনি। আমি এও জানতাম না যে, সব কিছুর মধ্যে একটা নির্বিশেষ সত্তা অনুস্যূত হয়ে আছে আর ঈশ্বর ও আমি তার সঙ্গে অভিন্ন। পরে তিরুভন্নমালাই-এ যখন ঋভুগীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ শুনলাম তখন এসব জানলাম আর দেখলাম যে, যা আমি বিশ্লেষণ না করে, নাম না জেনে স্ফুরণরূপে অনুভব করেছিলাম, ধর্মগ্রন্থে সেই বস্তুর বিশ্লেষণ ও নামকরণ করা হয়েছে। বই-এর ভাষায় জাগরণের পরে যে অবস্থায় আমি ছিলাম তাকে শুদ্ধমন বা বিজ্ঞান বা স্ফুরণ-চৈতন্যের স্বজ্ঞা বলা যায়।”

এটা সেই রহস্যবাদীর অবস্থা থেকে নিতান্ত পৃথক, যে ক্ষণিকের জন্য অবর্ণনীয় আনন্দ লাভ করে কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণ তাকে ঢেকে ফেলে। শ্রীভগবান নিত্য ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আত্মস্থিত হয়েছিলেন ও স্পষ্টই বলেছেন যে এরপর তাঁকে আর কোন সাধনা বা আধ্যাত্মিক প্রয়াস করতে হয়নি। আত্মস্থিতির জন্য আর কোন প্রচেষ্টা না থাকার কারণ, যে অহংকারের বিরোধের ফলে সংঘর্ষ হয় সেটা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল ; সংঘর্ষ হওয়ার জন্য বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। নিরন্তর পূর্ণ আত্মস্থিতি সাধারণ বাহ্য জীবনযাপনে ও আগন্তুক ভক্তবৃন্দের প্রতি কৃপা দৃষ্টি বিতরণে প্রতিষ্ঠিত হল আর এরপর থেকে সেটা স্বাভাবিক ও অনায়াস হয়ে গেল। তবুও সেখানে যে একটা বিকাশ হচ্ছিল সেটা শ্রীভগবানের কথা থেকে বোঝা যায় যে, আত্মা একটা নূতন আশ্রয় খুঁজছিল।

সন্তদের অনুকরণের ইচ্ছা আর গুরুজনেরা কি বলবেন, এই দু'টি থেকে শ্রীভগবানের জীবনে তখনও একটা দ্বৈতভাবের বাস্তব স্বীকৃতি দেখা যায়, পরে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই প্রক্রিয়ার একটা শারীরিক সংকেতও ছিল। 'জাগরণে'র সময় থেকে আরম্ভ করে তিরুভন্নমালাই দেবালয়ের গর্ভগৃহে প্রবেশ করা পর্যন্ত শ্রীভগবানের শরীরে অনবরত একটা জ্বালার অনুভূতি হত।

———

তৃতীয় অধ্যায়

যাত্রা

বেঙ্কটরমণের জীবনের পরিবর্তনের জন্য সংঘর্ষ আরম্ভ হল। বিদ্যালয়ের পাঠে আগের থেকে আরও অমনোযোগ দেখা দিল। সেটা এখন খেলাধুলার জন্য না হয়ে প্রার্থনা ও ধ্যানের জন্য হতে লাগল। বড় ভাই ও কাকা তাঁর এই অবাস্তব জীবনের জন্য আরও তীব্র সমালোচনা করতে লাগল। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল বেঙ্কটরমণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি কিশোর পুত্র যার সেই পরিবারের জন্য অর্থোপার্জন ও পরিবারের সাহায্যের জন্য সমস্ত শক্তি লাগান উচিত।

২৯শে আগস্ট সেই চরম মুহূর্ত এল, 'জাগরণে'র প্রায় ছ'মাস পরে। বেঙ্কটরমণকে বিদ্যালয়ের পাঠ মুখস্থ না করার দণ্ডসরূপ 'বেন্‌স্' গ্রামারের কিছু অংশ তিনবার কপি করতে বলা হয়েছিল। সকালবেলা তিনি দাদার সঙ্গে ঘরে বসেছিলেন। ছ'বার কপি করলেন আর প্রায় তৃতীয় বার কপি করতে যাচ্ছেন তখন হঠাৎ এই কাজের ব্যর্থতা তাঁকে এমনই প্রবল ভাবে ধাক্কা দিল যে, তিনি কাগজ সরিয়ে রাখলেন ও আসন পিঁড়ি হ'য়ে বসে ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

এই দৃশ্য দেখে বিরক্ত হয়ে বড় ভাই নাগস্বামী ব্যঙ্গ করে বললে, "এর এ সব জিনিসের কি দরকার ?" অর্থ সুস্পষ্ট—যে সাধুর মত জীবনযাপন করবে তার পারিবারিক জীবনের সুখ-সুবিধার অধিকার নেই। বেঙ্কটরমণ এই মন্তব্যের যথার্থতা অনুভব করলেন আর তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সেই কঠোর সত্য (বা ন্যায্য যা সত্যেরই ব্যবহারিক-রূপ) স্বীকার করে তৎক্ষণাৎ সর্বস্ব পরিত্যাগ করার মানসে উঠে পড়লেন। তাঁর কাছে এর অর্থ তিরুভন্নমালাই ও তার পবিত্র পাহাড় অরুণাচলে যাওয়া।

যা হোক তিনি জানতেন যে কিছু কৌশলে কাজ সম্পন্ন করতে হবে, কেন না হিন্দু পরিবারে গুরুজনের শাসন বড়ই কঠিন। তাঁর

কাকা ও দাদা একথা জানতে পারলে যেতে দেবে না। সুতরাং তিনি বললেন যে তাঁকে বিদ্যুৎ বিষয়ক একটা বিশেষ ক্লাসের জন্য স্কুলে যেতে হবে।

নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁকে যাত্রার পাথেয় দিয়ে দাদা বললে, "তাহলে নীচের ঘরের বাক্স থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে, যাওয়ার পথে আমার কলেজের মাইনে দিয়ে দিও।"

বেঙ্কটরমণের পরিবারে আধ্যাত্মিক চেতনার অভাব ছিল বলা যায় না, তথাপি তারা তাঁর নবজাগরণ উপলব্ধি করতে পারেনি। কেউ বুঝতে পারেনি। মনের আত্মাভিমুখীনতা অন্যের প্রত্যক্ষ নাও হতে পারে। সাধারণতঃ এরূপ অবস্থায় পারম্পরিক সম্বন্ধক্রমে আত্মার প্রভাব মানুষের ব্যক্তিত্বে উপচিত হয় ও তার ফলে অলৌকিক শক্তি আর মহত্ত্বের প্রকাশ হয় যাতে যারা তার নিকটে আসে তারা সম্মোহিত ও অভিভূত হয়।

এই পারম্পরিক প্রবাহ অনিবার্য নয়। অনেক গুপ্ত সাধকও আছেন। তাঁর আন্তর অবস্থার মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য তখন অবধি তাঁর শরীরকে পরিব্যাপ্ত না করায়, এ অবধি কোন বাহ্যিক লক্ষণ ছিল না। একজন বিদ্যালয়ের সাথী রঙ্গ আইয়ার কিছুকাল পরে তাঁকে তিরুভন্নমালাই-এ দেখতে এসে, তাঁকে দেখে ভক্তি ও সম্ভ্রমে এতই অভিভূত হয় যে চরণে লুটিয়ে পড়ে, কিন্তু সে তো তার সামনে তার চিরপরিচিত বেঙ্কটরমণকেই দেখছিল। পরে যখন সে শ্রীভগবানকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে তখন তিনি কেবল এই উত্তর দিয়েছিলেন যে, কেউ তাঁর পরিবর্তন বুঝতে পারেনি।

রঙ্গ আইয়ার আরও জিজ্ঞাসা করেছিল, "তখন আপনি অন্ততঃ আমায় বলতে পারতেন যে গৃহত্যাগ করে যাচ্ছেন?"

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে কি করে বলব? আমি নিজেই জানতাম না।"

বেঙ্কটরমণের কাকী নীচের ঘরে ছিল। সে তাঁকে পাঁচটি টাকা

দিলে ও খাবার দিয়ে দিলে। তিনি সেটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলেন। একটা ম্যাপ ছিল, সেটা খুলে দেখলেন যে তিরুভন্নমালাই-এর সব থেকে নিকটবর্তী স্টেশান তিণ্ডিবনম্। আসলে একটা ছোট শাখা লাইন তিরুভন্নমালাই অবধি ছিল, কিন্তু ম্যাপটি পুরাতন হওয়ায় তাতে সেটা ছিল না। রাহাখরচে তিন টাকা লাগতে পারে আন্দাজ করে তিনি কেবল তিন টাকা নিলেন। দাদা যাতে চিন্তা না করে ও তাঁর খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা না করে সেজন্য একটা চিঠি লিখে বাকী দু'টাকা চিঠির সঙ্গে রেখে দিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল ঃ

> "আমি আমার পিতার আজ্ঞানুসারে তাঁর অনুসন্ধানে বার হলাম। একটা পুণ্যময় কাজে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি, সুতরাং এর জন্য কেউ যেন চিন্তিত না হয় বা এর খোঁজের জন্য অযথা অর্থব্যয় যেন না করা হয়। আপনার কলেজের মাহিনা দেওয়া হয়নি। দু'টাকা এখানে রইল।"

এই সকল ঘটনা থেকে শ্রীভগবানের এই কথনই স্পষ্ট হয় যে তাঁর আত্মা শরীর-সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে যার সঙ্গে সে নিজেকে একাত্মবোধ করেছে তখনও সেই আত্মস্থিতির নিত্যাশ্রয়ের খোঁজ করছিল। বিদ্যালয়ে বিদ্যুতের ক্লাস করতে যাওয়ার ভাঁওতা কারও ক্ষতিকারক না হলেও পরে আর এরূপ করা সম্ভব ছিল না। অনুসন্ধানের কথাও ওঠে না, কেন না যে পেয়ে গেছে সে আর খোঁজে না। ভক্তেরা যখন তাঁর চরণে নতমস্তক হত তখন তিনি পরমপিতার সঙ্গে একাত্ম, তিনি তাঁর খোঁজ করছেন না। চিঠিটিও দ্বৈত অবস্থার প্রেমভক্তি থেকে অদ্বৈত অবস্থার আনন্দময় শান্তি নিরূপণ করে। চিঠি আরম্ভ হল 'আমি', 'আমার পিতা' আর তাঁর আজ্ঞা ও খোঁজের কথা দিয়ে, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে আর লেখককে 'আমি' না বলে 'এ' বলা হল। যখন স্বাক্ষরের প্রশ্ন এল তখন তিনি অনুভব করলেন যে, কোন অহংকার না থাকায় সই করার জন্য কোন নামও নেই, তাই স্বাক্ষরের স্থানে একটা দাগ দিয়ে শেষ হল। এরপর তিনি জীবনে আর কখনও চিঠি লেখেননি বা

স্বাক্ষর করেননি, কেবলমাত্র দু'বার তাঁর নামটা লিখেছিলেন। আরও অনেক বছর পরে আশ্রমে এক চীনদেশীয় দর্শনার্থীকে শ্রীভগবানের 'আমি কে?' বইটি দেওয়া হলে, সে সৌজন্যের সহিত স্বাক্ষর করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে। শ্রীভগবান পরিশেষে বইটি হাতে নিয়ে সৃষ্টির অণুপরমাণুতে পরিব্যাপ্ত আদ্য অক্ষর 'ওঁ'কারটি সংস্কৃত অক্ষরে লিখে দেন।

বেঙ্কটরমণ তিনটি টাকা নিয়ে দু'টাকা রেখে গিয়েছিলেন। এটাও লক্ষণীয় যে, তিনি তিরুভন্নমালাই যেতে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই নিয়েছিলেন। এটি তাঁর আশ্রয়। একবার পৌঁছে গেলে আর অর্থ বা ভরণপোষণের কোন প্রশ্ন থাকবে না।

তিনি যখন বাড়ী ছাড়েন তখন প্রায় দুপুর বারোটা। স্টেশান আধমাইল দূরে, তিনি খুব তাড়াতাড়ি চলে এলেন কারণ বারোটার সময় ট্রেন ছাড়ার কথা। যা হোক তাঁর দেরি হলেও, তিনি যখন স্টেশানে পৌঁছালেন তখনও ট্রেন এসে পৌঁছায়নি। একটা ট্রেন-ভাড়ার তালিকা টাঙ্গানো ছিল, সেই তালিকায় তিণ্ডিবনমের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া দেখলেন ২ টাকা ১৩ আনা। তিনি টিকিট কিনলেন, কাছে আর তিন আনা রইল। তিনি যদি তালিকার আর একটু নীচে অবধি দেখতেন তাহলে তিরুভন্নমালাই-এর নামও পেতেন আর দেখতেন যে ভাড়াটা ঠিক তিন টাকা। যাত্রার ঘটনাপ্রবাহ সাধকের লক্ষ্যাভিমুখী গতির প্রয়াসের প্রতীক—প্রথমতঃ ঈশ্বরের কৃপায় তাঁর যাত্রার অর্থানুকূল্য এসে গেল, দ্বিতীয়তঃ যদিও তিনি দেরিতে যাত্রা শুরু করেন তবু ট্রেনও পাওয়া গেল; তারপর তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছাবার জন্য যতটুকু অর্থ প্রয়োজন ঠিক তাই ছিল। কিন্তু যাত্রীর উদগ্রীবতার জন্য তাঁর যাত্রা আরও দীর্ঘ, ক্লেশকর ও ঘটনাবহুল হল।

বেঙ্কটরমণ যাত্রীদের মধ্যে আত্মানুসন্ধানের আনন্দে আত্মহারা হয়ে নীরবে বসেছিলেন। কয়েকটা স্টেশান চলে গেল। একজন সাদা

দাড়িওলা মৌলভী সন্তদের জীবনী ও বাণীর ওপর বক্তৃতা দিচ্ছিল ; সে বেঙ্কটরমণের দিকে চেয়ে বললে—

"স্বামী! তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"তিরুভন্নমালাই।"

"আমিও সেখানে যাচ্ছি," মৌলভী জবাব দিলে।

"কি বললেন! তিরুভন্নমালাই যাচ্ছেন?"

"ঠিক তিরুভন্নমালাই নয়, তার পরের স্টেশানে।"

"পরের স্টেশান কি?"

"তিরুকৈলুর।"

তারপর নিজের ভুল বুঝে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি বললেন! এ গাড়ী তিরুভন্নমালাই যায়?"

"তুমি তো অদ্ভুত যাত্রী হে! কোথাকার টিকিট কেটেছ?" মৌলভী জিজ্ঞাসা করলে।

"তিণ্ডিবনমের।"

"আরে বাবা, অতদূর যাওয়ার দরকার নেই। আমরা ভিল্লুপুরমে নেমে তিরুভন্নমালাই ও তিরুকৈলুরের গাড়ী বদল করব।"

ঈশ্বরের অসীম কৃপায় তাঁর প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যও মিলে গেল। বেঙ্কটরমণ আবার আত্মানন্দে ডুবে গেলেন। সূর্যাস্তের সময় গাড়ী ত্রিচীনপল্লী পৌছালে তাঁর ক্ষুধা পেল, তিনি দু'পয়সা দিয়ে দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের বড় শক্ত ধরনের দু'টি দেশী নাশপাতী কিনলেন। যদিও তিনি এতদিন পেটভরে খেতেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, দু'কামড় দিতে না দিতে তাঁর ক্ষুধা মিটে গেল। জাগ্রত-নিদ্রার আনন্দময় অবস্থায় বসে থাকতে থাকতে অতি প্রত্যুষে তিনটার সময় গাড়ী ভিল্লুপুরম্ পৌছাল।

ভোর না হওয়া অবধি তিনি স্টেশানে কাটালেন তারপর তিরুভন্নমালাই-এর রাস্তার নির্দেশ সহরে খুঁজতে লাগলেন। বাকী পথ পায়ে হেঁটে যাবেন মনস্থ করেছিলেন। কোন সাইনবোর্ডে

তিরুভন্নমালাই-এর নাম পাওয়া গেল না আর তাঁর জিজ্ঞাসা করতেও ইচ্ছা হল না। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরির পর ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হয়ে একটা হোটেলে ঢুকে খাবার চাইলেন। হোটেলের মালিক বললে দুপুরে খাবার পাওয়া যাবে, সুতরাং তিনি বসে অপেক্ষা করতে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন। কিছু পরে আহার্য এল, খাওয়ার পর তিনি আহার্যের মূল্যরূপে দুই আনা পয়সা দিতে গেলেন। কিন্তু হোটেলওলা নিশ্চয়ই লম্বাচুল, কানে মাকড়ীপরা, সাধুর মত বসে থাকা ব্রাহ্মণ যুবকটিকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে থাকবে। সে বেঙ্কটরমণের নিকট সবশুদ্ধ কত পয়সা আছে জানতে চাইলে। যখন সে জানল যে সর্বসাকুল্যে তাঁর কাছে আড়াই আনা আছে তখন সে পয়সা নিতে অস্বীকার করলে। সেই তাঁকে বললে যে, সাইনবোর্ডে যে মাম্বালাপট্টু নাম দেখেছে সেটাই তিরুভন্নমালাই-এর রাস্তা। তার ফলে বেঙ্কটরমণ স্টেশানে ফিরে গিয়ে একটা মাম্বালাপট্টুর টিকিট কিনলেন, তাঁর আড়াই আনা পয়সায় এই পর্যন্তই যাওয়া সম্ভব ছিল।

তিনি বিকালে মাম্বালাপট্টু পৌঁছে গেলেন ও তারপর হাঁটা শুরু করে দিলেন। রাত হতে হতে দশ মাইল পথ চলে গেলেন। তারপর সামনে একটা প্রকাণ্ড শিলার ওপর তৈরী অরয়ানীনল্লুর মন্দির দেখা গেল। এই দীর্ঘ পথ যার বেশীর ভাগ দুপুরের গরমে চলেছেন তাতে তাঁকে ক্লান্ত করেছিল, তিনি বিশ্রামের জন্য মন্দিরে বসলেন। একটু পরে একজন লোক এসে মন্দিরের পুরোহিত ও অন্যান্যের সান্ধ্য পূজার জন্য মন্দিরের দরজা খুললে। বেঙ্কটরমণও ঢুকলেন আর মন্দিরের স্তম্ভকক্ষে বসে পড়লেন, এইখানটাই যা তখন অবধি গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে যায়নি। তিনি তৎক্ষণাৎ একটা জ্যোতিতে সমস্ত মন্দির ভরে যেতে দেখলেন। এই জ্যোতি নিশ্চয় গর্ভগৃহের দেবমূর্তি থেকে আসছে ভেবে সেখানে গিয়ে কিছু দেখতে পেলেন না। এটা কোন জাগতিক আলো নয়। এটা মিলিয়ে গেল, তিনিও ধ্যানমগ্ন হলেন।

শীঘ্রই পাচক ব্রাহ্মণের পূজা শেষ হয়ে গেছে ও মন্দিরের দরজা বন্ধ করার সময় হয়েছে বলাতে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হল। এরপর তিনি পূজারীর কাছে কিছু আহার্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তাঁকে বলা হল যে কিছু নেই। তারপর তিনি রাতটুকু সেখানে থাকার অনুমতি চাইলেন, তাও পাওয়া গেল না। পূজারী বললে যে সে পৌনে একমাইল দূরে কিল্লুরের মন্দিরে পূজা করতে যাচ্ছে, সেখানে কিছু খাবার পাওয়া গেলেও যেতে পারে। সুতরাং তিনিও তাদের সঙ্গে চললেন। মন্দিরে ঢুকতে না ঢুকতে আবার সমাধি। রাত তখন প্রায় ৯টা, তারা পূজা শেষ করে খেতে বসল। বেঙ্কটরমণ আবার জিজ্ঞাসা করলেন। প্রথমে মনে হল তাঁর ভাগ্যে কিছুই জুটবে না, কিন্তু মন্দিরের ঢাকী মনে হয় তাঁর আকৃতি ও ভক্তিভাব দেখে আকৃষ্ট হয়ে থাকবে, সে তার নিজের ভাগের খাবার তাঁকে দিলে। তিনি একটু জল খেতে চাইলে তাঁকে সেই পাতা হাতে ধরা অবস্থায় নিকটে এক শাস্ত্রীর বাড়ী দেখিয়ে দেওয়া হল, যেখানে জল পাওয়া যেতে পারে। সেই বাড়ীর সামনে অপেক্ষা করার সময় তাঁর পা কেঁপে গেল আর কয়েক পা গিয়ে অজ্ঞান বা ঘুমে মাটিতে পড়ে গেলেন। একটু পরে হুঁস হলে তিনি দেখলেন যে তাঁর চারিদিকে কয়েকজন লোক কৌতূহলী হয়ে তাঁকে দেখছে। তিনি জল পান করলেন, ছড়ান ভাত থেকে কিছুটা তুলে খেলেন ও মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন সোমবার ৩১শে আগস্ট, গোকুলাষ্টমী (জন্মাষ্টমী), শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন, হিন্দুদের একটি পুণ্য তিথি। তিরুভন্নমালাই এখনও ২০ মাইল দূর। বেঙ্কটরমণ তিরুভন্নমালাই-এর পথ খোঁজার জন্য আরও ঘোরাঘুরি করে আবার ক্লান্তি ও ক্ষুধায় পীড়িত হলেন। সেকালের ব্রাহ্মণদের রীতি অনুসারে তাঁর কানে চুনি বসান সোনার মাকড়ী ছিল। তিনি সে দু'টি খুলে টাকা যোগাড় করে বাকী পথটুকু ট্রেনে যাওয়া ঠিক করলেন। এখন প্রশ্ন হল এ দু'টি কোথায় ও কার কাছে বিক্রি

করা যায়। তিনি একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন, সেটা একজন মুথুকৃষ্ণ ভাগবতারের বাড়ি। সেই বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে খাবার চাইলেন। কৃষ্ণের জন্মোৎসবের দিন একজন তেজপূর্ণ-নয়ন সুন্দর ব্রাহ্মণ বালককে বাড়ীর সামনে আসতে দেখে গৃহকর্ত্রী নিশ্চয় প্রভাবিত হয়ে থাকবে; সে তাঁর সামনে কিছু ঠাণ্ডা খাবার ধরে দিলে। দু'দিন আগে ট্রেনে যেমন হয়েছিল, একগ্রাস খাওয়ার পর তাঁর ক্ষুধা চলে গিয়েছিল, তবু গৃহিণী মায়ের মত সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত খাবারটা তাঁকে খাওয়ালে।

এখন মাকড়ীর প্রশ্নটা রইল। সে দু'টির নিশ্চয় টাকা কুড়ি দাম হবে কিন্তু তিনি সে দু'টির বদলে মাত্র চার টাকা ধার চাইলেন, যাতে বাকী রাস্তার খরচ চলে যায়। পাছে কোন কৌতূহল জাগে সেজন্য বললেন যে, তিনি একজন তীর্থযাত্রী, পথে মালপত্র খোয়া গেছে তাই নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। মুথুকৃষ্ণ মাকড়ী দু'টি দেখলে আর আসল বলে পরীক্ষা করার পর তাঁকে চারটি টাকা দিলে। যা হোক সে ছেলেটির ঠিকানার জন্য পীড়াপীড়ি করলে ও যাতে ছেলেটি কোন সময়ে তার মাকড়ী ছাড়াতে পারে সেজন্য নিজের ঠিকানা দিয়ে দিলে। এই দম্পতি তাঁকে দুপুর অবধি বাড়িতে রাখলে, মধ্যাহ্ন ভোজন করালে ও শ্রীকৃষ্ণের জন্য তৈরী তখনও নিবেদন না করা কিছু মিষ্টান্ন একটা মোড়কে করে দিলে।

বাড়ী ছাড়তেই তিনি ঠিকানার কাগজ ছিঁড়ে ফেললেন, কেননা তাঁর মাকড়ী ছাড়াবার কোন বাসনা ছিল না। স্টেশনে গিয়ে, আগামী কাল সকালের আগে তিরুভন্নামালাই-এর কোন ট্রেন নেই শুনে সেরাত্রি স্টেশনেই ঘুমালেন। কোন লোকই নির্ধারিত সময়ের আগে যাত্রা শেষ করতে পারে না। ১৮৯৬ সালে ১লা সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে বাড়ী ছাড়ার তিনদিন পরে তিনি তিরুভন্নামালাই স্টেশনে পৌঁছালেন।

দ্রুত পা চালিয়ে আনন্দে উন্মত্তের মত তিনি সেই বিশাল মন্দিরের

অভিমুখে রওনা হলেন। মৌন স্বাগতের চিহ্নস্বরূপ তিনটি বড় ফটক ও ছোট দরজাগুলো এমনকি গর্ভগৃহের দরজাও খোলা। গর্ভগৃহের ভিতরে কেউ ছিল না, তিনি একলা সেখানে প্রবেশ করলেন ও তাঁর পিতা অরুণাচলেশ্বরের সামনে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেখানে মিলনের পরমানন্দে অনুসন্ধানের পূর্ণতা ও যাত্রার পরিসমাপ্তি হল।

———

চতুর্থ অধ্যায়

আপাত তপ

মন্দির ত্যাগ করার পর বেঙ্কটরমণ সহরের এদিক-ওদিক ঘুরছিলেন, কেউ একজন জিজ্ঞাসা করলে তিনি মাথা কামাতে চান কিনা। এটা যেন দৈব প্রেরণা কারণ এই ব্রাহ্মণ যুবক যে গৃহত্যাগ করেছেন ও সংসার ত্যাগ করতে চান এরূপ কোন বাহ্য চিহ্ন ছিল না। তিনিও তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন, তাঁকে আইনাকুলাম সরোবরের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে কয়েকজন নাপিত মাথা কামাবার কাজ করছিল। তিনি মাথা মুড়িয়ে ফেললেন। আর সরোবরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বাকী তিন টাকার কিছু বেশী পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এরপর তিনি আর কখন পয়সা ছোঁননি। তখন হাতে ধরা খাবারের মোড়কও ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। "এই জড় শরীরটাকে আবার মিষ্টান্ন খাওয়ান কেন ?"

জাতি চিহ্নসরূপ উপবীত খুলে ফেলে দিলেন, কারণ যে সংসার ত্যাগ করে সে কেবল গৃহ ও সম্পত্তি ত্যাগ করে না—উপরন্তু জাতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠাও ত্যাগ করে।

তারপর তিনি তাঁর পরনের ধুতিটা নিয়ে খানিকটা ছিঁড়ে কৌপীন তৈরী করে বাকীটাও ফেলে দিলেন।

সংসার পরিত্যাগের অনুষ্ঠান শেষ করে আবার মন্দিরে ফিরে এলেন। মন্দিরের কাছে আসতেই তাঁর মনে পড়ল যে শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে মুণ্ডনের পর স্নান করার বিধি আছে কিন্তু তিনি নিজেকে বললেন, "এই জড় শরীরটাকে আর স্নানের আরাম দেওয়ার দরকার কি ?" তৎক্ষণাৎ কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি নামল, সুতরাং মন্দিরে প্রবেশের আগে স্নানও হয়ে গেল।

তিনি আর মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন নি। প্রয়োজনও ছিল না। বস্তুতঃ তিন বছরের আগে আর তিনি সেখানে যান নি।

চারিদিক খোলা উঁচু পাথরের বিশাল সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ, ছাদটি অসংখ্য কারুকার্যে ভরা, তিনি সেখানে স্থান নিলেন আর আত্মানন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। দিনের পর দিন একভাবে দিবারাত্র বসে রইলেন। তাঁর সংসারে আর কি প্রয়োজন, পরমসত্তায় লীন হয়ে বসে থাকা বেঙ্কটরমণের সংসারের ছায়াময় সত্তায় আর কোন আকর্ষণ রইল না। কয়েক সপ্তাহ এই ভাবে প্রায় না উঠে মৌন অবস্থায় কাটল।

আত্মোপলব্ধির পর তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা আরম্ভ হল। প্রথম অবস্থায় ঐশ্বর্য গুপ্ত ছিল আর শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি অনুগত হ'যে আগেকার জীবনযাত্রা মেনে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় অবস্থায় সমস্ত বিশ্বসংসারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তিনি অন্তর্মুখী হলেন। আর পরে দেখা যাবে যে এটিও ক্রমশঃ তৃতীয় অবস্থায় পর্যবসিত হল, যা প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ছিল। সেই অবস্থায় যারাই তাঁর কাছে এসেছে তাঁর প্রভা মধ্যাহ্ন সূর্যের মত তাদের ওপর পড়েছে। যা হোক এই অবস্থা বিভাগ কেবলমাত্র বাহ্য স্থিতি অনুসারে। তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁব চৈতন্যের অবস্থা বা আধ্যাত্মিক অনুভূতিব কিছু মাত্র পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয়নি।

শেষাদ্রি নামে এক সাধু কয়েক বছর আগে তিরুভন্নমালাই-এ এসেছিল। তখন বেঙ্কটরমণ ব্রাহ্মণস্বামী নামে পরিচিত ছিলেন। সে-সময়ে শেষাদ্রি তাঁর যতটুকু প্রযোজন দেখাশুনা করার ভার নিজের ওপর নিলে। এতে যে সবটাই সুবিধা হল তা নয় কারণ অন্যেরা শেষাদ্রিকে কিছুটা বিকৃত মস্তিষ্ক মনে করত, যার ফলে ছেলেরা তার পিছনে লেগে বিরক্ত করত। তারা শেষাদ্রির আশ্রিত, যাকে তারা ছোট শেষাদ্রি বলত, তার প্রতিও মনোযোগ দিলে। তারা খানিকটা বালক সুলভ নির্দয়তা ও খানিকটা তাদের মত বয়স হওয়া সত্ত্বেও এক-জন পাথরের মূর্তির মত বসে আছে বলে তাঁর প্রতি পাথর ছুঁড়ত। কারণ, একজন বালক পরে বলেছিল যে, তারা জানতে চাইত যে তিনি সত্যকারের স্বামী না নকল।

বালকদের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা শেষাদ্রির বিশেষ সফল হয়নি, বরঞ্চ উল্টো ফলই হয়েছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণস্বামী পাতাল লিঙ্গে আশ্রয় নিলেন। এটা সহস্রস্তম্ভের মধ্যে যেখানে কোনদিন সূর্যের কিরণ প্রবেশ করে না এরূপ অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে একটা ভূগর্ভ-গৃহ। কচিৎ কখন সেখানে মানুষ যেত, পোকামাকড়, পিঁপড়ে, মশার আবাস ছিল। তারা তাঁকে বেশ করে কামড়ে পায়ে, উরুতে ক্ষত করে দিয়েছিল, তা থেকে পুঁজও পড়ত। তার দাগ তাঁর সারা জীবন ছিল। যে কয়েক সপ্তাহ তিনি সেখানে ছিলেন তা প্রায় নরকতুল্য হলেও আত্মানন্দে বিভোর বেঙ্কটরমণ এতে কিছুমাত্র বিচলিত হননি কারণ তাঁর কাছে সবই মিথ্যা বোধ হত। একজন ভক্তিমতী মহিলা রত্নাম্মাল মাটির নীচেব ঘরে ঢুকে খাবার দিত। সে তাঁকে সেখান ছেড়ে তার বাড়ী যেতে একবার অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি সেটা শুনলেন কিনা বোঝা গেল না। সে একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে তাঁকে তার ওপর বসতে, শুতে কিংবা পোকা-মাকড়ের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে অনুরোধ করলে, কিন্তু তিনি সেটা ছুঁলেনও না।

অত্যাচারী বালকেরা অন্ধকার নীচের ঘরে ঢুকতে ভয় পেয়ে প্রবেশ পথে পাথর, মাটির হাঁড়ি ভাঙ্গা ইত্যাদি ছুঁড়ত, সেগুলো ভেঙ্গে টুকরো হয়ে ভিতরে যেত। শেষাদ্রিস্বামী অনেক সময় পাহারা দিত, তাতে ছেলেদের অত্যাচার আরও বেড়ে গেল। একদিন দুপুর বেলা বেঙ্কটাচল মুদালি নামে একজন সহস্রস্তম্ভের কাছে এসেছিল, সে ছেলেদের মন্দিরের মধ্যে পাথর ছোঁড়া দেখে লাঠি নিয়ে ছেলেদের তাড়িয়ে দিলে। ফেরার পথে সে শেষাদ্রিস্বামীকে সেই ঘুপসি ঘর থেকে বার হতে দেখলে। প্রথমে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল, পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে শেষাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করলে তার আঘাত লেগেছে কিনা। সে উত্তর দিলে "না, কিন্তু ভিতরে গিয়ে ছোট স্বামীকে দেখাশুনা করো।" এই বলে সে চলে গেল।

আশ্চর্য হয়ে মুদালি সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেই পাতালঘরে ঢুকলে।

তুপুরের চড়া আলো থেকে অন্ধকারে সে প্রথমে কিছুই দেখতে পেলে না, ক্রমশঃ তার চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেল আর সে তরুণস্বামীকে দেখতে পেল। সেখানে যা দেখল তাতে সে স্তব্ধ হয়ে গেল আর বাইরে এসে যে সাধু নিকটে ফুলের বাগানে কয়েকজন শিষ্য নিয়ে কাজ করছিল তাকে সব বললে। তারাও দেখতে এল। তরুণস্বামী নড়লেন না, কথাও বললেন না, মনে হল তাদের উপস্থিতির কথা বুঝতে পারলেন না। সুতরাং তারা তাঁকে পাঁজাকোলা করে ধরে তুলে বাইরে নিয়ে এল। তারা তাঁকে সুব্রমণীয়াম মন্দিরের সামনে বসিযে দিলে, তাঁর এ সব সম্বন্ধে কোন চেতনা আছে বলে বোঝা গেল না।

ব্রাহ্মণস্বামী প্রায় ছ'মাস সুব্রমণীয়াম মন্দিরে ছিলেন। সমাধিতে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতেন আর কখন কখন খাদ্যদ্রব্য তাঁর মুখে ঢেলে দেওযা হত কারণ তাঁর এ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই ছিল না। কযেক সপ্তাহ কৌপীন পরার কথাও মনে ছিল না। তখন আরও একজন মৌনীস্বামী সেই মন্দিরে থাকত, সে-ই তাঁকে দেখত।

মন্দিরের উমা দেবীর মূর্তিকে প্রতিদিন তুধ, জল, হলুদগুঁড়ো, শর্করা, কলা আরও অন্যান্য দ্রব্যের দ্বারা স্নান করান হত আর মৌনীস্বামী সেই বিচিত্র মিশ্রণ একটা গেলাসে করে প্রতিদিন তরুণস্বামীব জন্য নিয়ে যেত। তিনি স্বাদ-গন্ধের কথা না ভেবে সেটা গিলে ফেলতেন আর তাঁর এটাই একমাত্র খাদ্য ছিল। কিছুদিন পরে মন্দিরের পূজারী এটা লক্ষ্য করলে আর ব্রাহ্মণস্বামীর জন্য মৌনীস্বামীকে প্রতিদিন খাঁটি তুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করলে।

কয়েক সপ্তাহ বাদে ব্রাহ্মণস্বামী মন্দিরের বাগানে চলে গেলেন, বাগান দশ বারো ফুট উঁচু বড় বড় করবী ফুলের গাছে ভরা ছিল। এখানেও তিনি সমাধিস্থ হয়ে পরমানন্দে বসে থাকতেন। তাঁর চলা-ফেরাও প্রায় ভাবাবেশেই হত, কেন না কোন কোন দিন তিনি নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন গাছের তলায় দেখতেন আর সেখানে যে তিনি কি

করে এলেন তাও জানতেন না। তারপর তিনি মন্দিরের রথঘরে ছিলেন এই রথে ক'রে পুণ্য তিথিতে দেবমূর্তিদের শোভাযাত্রা করানো হয়। এখানেও তিনি কখন কখন বাহ্যজ্ঞান লাভ করে নিজেকে বিভিন্ন স্থানে দেখতেন আর দেখতেন যে নিজের অজ্ঞাতসারে বাধাবিঘ্ন পার হয়ে, শরীরে আঘাত না পেয়ে কিভাবে সেখানে এসে গেছেন।

এর পর তিনি কিছুকাল রাস্তার পাশে একটা গাছের তলায় বসে থাকতেন। রাস্তাটা মন্দিরের প্রাচীরের ভিতর আর মন্দিরের চারিদিকে পরিবেষ্টিত, শোভাযাত্রার সময় এই রাস্তার ব্যবহার হয। কিছুকাল এখানে আর মঙ্গাই পিল্লায়ার মন্দিরে কাটল। প্রতিবছর কার্তিক মাসের উৎসবের সময় যেটা নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বব মাসে পড়ে তখন ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত শিবের জ্যোতিস্তম্ভরূপে দর্শন দেওয়ার স্মারকরূপে এই পাহাড়ের চূড়ায় আলোক সংকেত স্থাপন করা হয়। সেসময় তিরুভন্নমালাই-এ তীর্থযাত্রীদের খুব ভিড় হয়। এ বছর বহু লোক তরুণস্বামীকে দেখতে ও প্রণাম করতে এল। এই অবসরে সর্বপ্রথম একজন ভক্ত তাঁর নিয়মিত সেবা করতে শুরু করলে। উদ্দণ্ডী নয়ীনার আধ্যাত্মিক শাস্ত্র পড়েছে কিন্তু শান্তি লাভ করেনি। তরুণস্বামীকে নিরন্তর সমাধিস্থ ও শরীর সম্বন্ধে একান্ত নিঃস্পৃহ দেখে বুঝলে যে এখানে আত্মোপলব্ধি হয়েছে আর এঁর থেকে তার শান্তি পাওয়া সম্ভব। স্বামীর সেবা করলে মনে আনন্দ হত কিন্তু সেবা করার কি-বা ছিল। দর্শকদের স্বামীকে বিরক্ত করা ও ছেলেদের অত্যাচার করা সে বন্ধ করলে; বেশীর ভাগ সময় অদ্বৈত সিদ্ধান্তের তামিল গ্রন্থ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে কাটাত। তার খুব আশা ছিল যে স্বামী তাকে উপদেশ দেবেন, কিন্তু স্বামী কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলেন নি আর সেও প্রথমে কথা ব'লে স্বামীর মৌন ভঙ্গ করতে চায়নি।

প্রায় এই সময় আন্নামালাই তাম্বিরম নামে এক ব্যক্তি, তরুণস্বামী যে গাছের তলায় বসেছিলেন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মৌনভাবে নিশ্চিন্ত মনে সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকা স্বামীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে সে

এমনই মুগ্ধ হল যে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে প্রণাম করলে ও প্রতিদিন প্রণাম করার জন্য আসতে লাগল। সে নিজেও একজন সাধু, কয়েকজন সাথীর সঙ্গে ভজন গান গেয়ে সহরে ঘুরে বেড়াত। যা ভিক্ষা পেত তাই দিয়ে গরীব-দুঃখীকে খাওয়াত আর আদিগুরুর সমাধিতে পূজা দিত।

কিছুদিন পরে তার মনে হল যে, তরুণস্বামী যদি 'গুরুমূর্তম' নামে খ্যাত মন্দিরে গিয়ে থাকেন, তাহলে কম ব্যতিব্যস্ত হবেন ও শীত-কালের পক্ষে তাঁর ভাল আশ্রয় হবে। স্বামীকে তার একথা বলতে সঙ্কোচ হল, তাই সে প্রথমে নয়ীনারকে বললে। কেউ স্বামীর সঙ্গে এ পর্যন্ত কথা বলেনি। শেষ অবধি তারা পরামর্শ দেওয়ার সাহস সঞ্চয় করলে। স্বামী যেতে রাজী হলেন। ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিরুভন্নমালাই আসার ছ'মাসেব মধ্যে তিনি তাম্বিরমের সঙ্গে 'গুরুমূর্তমে' গেলেন।

সেখানে গিয়েও তাঁর জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন হল না। মন্দিরের মেঝেতে পিঁপড়ের বাসা কিন্তু তাদের তাঁর শরীরের ওপর চলাফেরা আর কামড়ানোতে স্বামীর ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছুদিন পবে পিঁপড়ে থেকে বাঁচাবার জন্য এক কোণে একটা টুল রাখা হল আর পায়াগুলো জলে বসান হল, তাহলে কি হয় তিনি দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে পিঁপড়েদের জন্য রাস্তা করে দিলেন। অনবরত একভাবে বসার জন্য দেওয়ালে পিঠের একটা স্থায়ী চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

তীর্থযাত্রী ও দর্শকবৃন্দ গুরুমূর্তমেও ভিড় করতে লাগল। বহুলোক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে আসত, কেউ কেউ মনস্কামনা পূর্তির জন্য প্রার্থনা করত, কেউ হয়ত কেবল শুদ্ধা ভক্তিভাবে তাঁর কাছে আসত। ভিড় এতই বাড়ল যে তাঁর চারিদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়ার প্রয়োজন হল যাতে অন্ততঃ তাঁকে স্পর্শ করা থেকে বাঁচানো যায়।

প্রথমে তাম্বিরম তার গুরুর মন্দিরে দেওয়া পূজা থেকে সামান্য যা ...য় প্রয়োজন হত তা জোগাত কিন্তু অল্পকাল পরেই সে তিরুভন্নমালাই

ছেড়ে চলে গেল। সে নয়ীনারকে বললে যে সে এক সপ্তাহ পরে ফিরবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে তার ফিরতে এক বছরের বেশী দেরি হল। কয়েক সপ্তাহ পরে নয়ীনারকে তার মঠে যেতে হল আর স্বামীর দেখাশুনার জন্য কেউ রইল না। ভোজনের জন্য কোন অসুবিধা ছিল না। ইতিমধ্যে যারা নিয়মিত খাদ্য আনতে ইচ্ছুক এরূপ কয়েকজন ভক্ত এসে গেছে। প্রয়োজনটা ছিল তীর্থযাত্রী ও দর্শকদের ভিড় ঠেকিয়ে রাখা।

অল্পদিনের মধ্যেই একজন নিয়মিত সেবক এসে গেল। একজন মালয়ালী সাধু পালানীস্বামী বিনায়কের (গণেশের) পূজায় নিজে জীবন উৎসর্গ করেছিল। সে খুব কঠোর জীবনযাপন করত, ঠাকুরে পূজা ও ভোগ হলে একবেলা খেত, তাও নুন ও মশলা ছাড়া। শ্রীনিবাস আইয়াব নামে তার এক বন্ধু একদিন তাকে বললে, "এই পাথরেব ঠাকুরের পূজায় জীবন কাটাচ্ছ কেন? গুরুমূর্তমে একটি রক্তমাংসে তরুণস্বামী রয়েছেন। পুরাণে বর্ণিত ধ্রুবের মত গভীর তপস্যায় মগ্ন তুমি যদি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সেবায় নিজেকে সমর্পণ কর তাহলে ধন্য হয়ে যাবে।"

এই সময়ে আরও অন্য লোক তাকে তরুণস্বামীর কথা বলে আর বলে যে তাঁর সেবক নেই, তাঁর সেবা করার সুযোগ একটা সৌভাগ্য বিশেষ। সে অনুসারে সে একদিন গুরুমূর্তমে গেল। স্বামীকে দেখ মাত্র ভাবে অভিভূত হল। তবু কিছুদিন কর্তব্যানুরোধে বিনায়ক মন্দিরে পূজা করতে লাগল, কিন্তু তার প্রাণ জীবন্ত স্বামীর কাছে পড়ে থাকত। শীঘ্রই সে স্বামীর সেবায় তন্ময় হয়ে গেল। সে তার সেবা উৎসর্গ করে একুশ বছর স্বামীর সেবক হয়েছিল।

সেবা করার বিশেষ কিছুই ছিল না। ভক্তদের কাছ থেকে খাবা আসত, তার মধ্যে স্বামীর জন্য দুপুরে এক বাটির মত খাদ্য রেখে বাকীটা তাদের প্রসাদ বলে ফিরিয়ে দেওয়া হত। যদি পালানীস্বামী কোন ধর্ম বা শাস্ত্রগ্রন্থ আনার জন্য সহরে যাওয়ার প্রয়োজন হত, সে

মন্দিরে চাবি দিয়ে চলে যেত আর ফিরে এসে স্বামীকে যেভাবে বসা দেখে গিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই বসা দেখত।

স্বামী শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, তাকে একেবারে উপেক্ষা করতেন। স্নান নেই, ঘন ঝাঁকড়া চুল জট পাকিয়ে গিয়েছে, হাতের নখ বড় হয়ে বেঁকে গিয়েছে। কেউ কেউ এটা আবার তাঁর অধিক বয়সের চিহ্ন মনে করত আর কানাঘুষা করত যে স্বামী যোগ-শক্তি বলে শরীরে যৌবনকে অটুট রেখেছেন। বস্তুতঃ তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে তিনি প্রায়ই উঠতে পারতেন না, একটু উঠে বসে পড়তেন, দুর্বলতার জন্য মাথা ঘুরত, বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলে তবে দাঁড়াতে পারতেন। একবার এই অবস্থায় কোন প্রকারে দরজা অবধি গিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় তিনি দেখলেন যে পালানীস্বামী তাঁকে ধরে রয়েছে। কারও কাছে সাহায্য নেওয়া সব সময় অপছন্দ করার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "কেন ধরে আছেন ?" পালানীস্বামী বললে "স্বামী পড়ে যাচ্ছিলেন তাই পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাবার জন্য ধরে আছি।"

যাঁরা দিব্যসত্তার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে, অনেক সময়ে তাঁদের দেবমূর্তির মত অভিষেক, পুষ্পোপহার, চন্দন-লেপ, কর্পূর আরতি ও মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে পূজা করা হয়। যখন তাম্বিরম গুরুমূর্তমে ছিল তখন সে স্বামীকে এইভাবে পূজা করতে মনস্থ করলে। প্রথম দিন স্বামী হঠাৎ তার অভিপ্রায় বুঝতে পারেননি তাই সে সফলকাম হল, কিন্তু পরের দিন তাম্বিরম যখন তার প্রাত্যহিক ভোজনের বাটি নিয়ে এল, তখন সে স্বামীর মাথার কাছে দেওয়ালে তামিলে "এর জন্য এই সেবাই যথেষ্ট" লেখা রয়েছে দেখলে। তার অর্থ এই শরীরের জন্য যে খাদ্য দেওয়া হয় তাই যথেষ্ট।

ভক্তদের কাছে এটা একটা আশ্চর্যের বিষয় যে স্বামী ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করেছেন ও লিখতে পড়তে জানেন। তার মধ্যে একজন

এর থেকে স্বামী কোথা থেকে এসেছেন ও তাঁর কি নাম ছিল জানতে মনস্থ করলে। সে হল বেঙ্কটরাম আইয়ার, একজন বয়স্ক লোক, সহরের তালুক কার্যালয়ের গাণনিক। সে প্রতিদিন সকালে আসত ও কাজে যাওয়ার আগে স্বামীর সান্নিধ্যে কিছুক্ষণ ধ্যান করত। মৌন-ব্রতকে সকলেই শ্রদ্ধা করে। তিনি কথা না বলাতে সবাই তাঁকে মৌনব্রতাবলম্বী বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু যে কথা বলে না সে কখন কখন লিখে উত্তর দেয়। এখন যখন জানা গেল যে স্বামী লিখতে পারেন, সে জেদ ধরলে ও তাঁর সামনে পালানীস্বামীর আনা একখানা বই-এর ওপর একটা সাদা কাগজ ও পেন্‌সিল রেখে তাঁকে নাম ও জন্মস্থান লেখার জন্য প্রার্থনা করলে।

স্বামী তার প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন না, তখন সে বললে যে, স্বামী না লিখলে সে খাবেও না, অফিসও যাবে না। তখন তিনি ইংরাজীতে 'বেঙ্কটরমণ, তিরুচুড়ী' তুটি শব্দ লিখে দিলেন। তাঁর ইংরাজী জানাও আর এক আশ্চর্যের বিষয়, কিন্তু বেঙ্কটরাম তিরুচুড়ী নামটার ইংরাজী 'zh' বানানে গোলমালে পড়ে গেল, বিশেষ করে 'ড়'-এর zh বানানে।

এই অক্ষরটা দেখানোর জন্য যে বইটার ওপর কাগজ ছিল সেটা তামিল বই কিনা দেখার জন্য স্বামী সেটা তুলে নিলেন। জাগরণের আগে একসময় যে বই তাঁকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল, সেই 'পেরিয়া পুরাণ' দেখে, যেখানে তিরুচুড়ীকে একটি সহর বলে বর্ণনা করা হয়েছে ও সুন্দরমূর্তি তার প্রশস্তি গীত গেয়েছেন সেই স্থানটা খুঁজলেন ও বেঙ্কটরাম আইয়ারকে দেখালেন।

১৮৯৮ সালে বৎসরাধিক কাল গুরুমূর্তমে বাস করার পর স্বামী পাশেই একটি আম বাগানে চলে গেলেন। এই বাগানের মালিক বেঙ্কটরাম নায়কার পালানীস্বামীর কাছে স্থান পরিবর্তনের প্রস্তাব ক'রে বলে, বাগানটি সুরক্ষিত, তালা লাগাবার ব্যবস্থা আছে, তাতে তাঁর নির্জন বাসের সুবিধা হবে। স্বামী ও পালানীস্বামী তু'জনে এক একটা

চৌকিদারের ঝুপড়ীতে থাকতে লাগলেন। মালিক তার মালীদের কড়া হুকুম দিলে যে পালানীস্বামীর বিনা অনুমতিতে কাউকে যেন বাগানে ঢুকতে না দেওয়া হয়।

তিনি এখানে প্রায় ছ'মাস ছিলেন আর এখানেই তাঁর অশেষ শাস্ত্রের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশঃ আহরিত হয়। স্বভাবতঃই এটা জ্ঞান সঞ্চয়ের ইচ্ছায় নয় পরন্তু একটি ভক্তকে সাহায্যের অনুরোধে হয়। পালানীস্বামী দর্শন শাস্ত্রের বই আনত কিন্তু সে যা জোটাতে পারত সেগুলো সবই তামিল ভাষায়। এ ভাষাটা সে খুব কম জানত। সুতরাং তার একটা বই পড়ে বুঝতে কঠিন পরিশ্রম করতে হত। তাকে এই ভাবে কষ্ট করতে দেখে স্বামী একটা বই তুলে নিয়ে সবটা পড়ে তার সারাংশটুকু পালানীস্বামীকে ধরে দিতেন। আগেই তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হওয়ায় একবার দেখলেই গ্রন্থের গূঢ় তাৎপর্য বোধগম্য হত, আর তাঁর অদ্ভুত স্মরণশক্তির জন্য একবার যা পড়তেন তা কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। সুতরাং প্রায় বিনা চেষ্টায় তিনি শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে গেলেন। এইভাবে সংস্কৃত, তেলেগু ও মালয়ালী ভাষার বই পড়ে ও সেই ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তিনি এগুলোতে দক্ষতা লাভ করেছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন

কিশোর বেঙ্কটরমণ যখন গৃহত্যাগ করলেন, তাঁর সমস্ত পরিবার বিস্মিত হয়ে গেল। তাঁর পরিবর্তন ও পরিবারের ভাগ্যে এরূপ থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। খোঁজাখুঁজি অনেক হল কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তাঁর মা তখন মানামাদুরায়ে আত্মীয়দের কাছে ছিলেন, কষ্টটা তাঁরই সবচেয়ে বেশী। তিনি তাঁর দেওরদের, সুব্বিয়ার ও নেল্লিয়াপ্পিয়ারকে তাঁকে না পাওয়া অবধি বাইরে খোঁজার জন্য অনুরোধ করলেন। শোনা গেল যে তিনি একটা যাত্রার দলে যোগ দিয়ে ত্রিবান্দ্রম গেছেন। নেল্লিয়াপ্পিয়ার তৎক্ষণাৎ সেখানের বিভিন্ন যাত্রা দলে খোঁজ করলে কিন্তু কোন ফল হল না। তবু মা আলাগাম্মাল বিফলতা স্বীকার করতে রাজী হলেন না। আবার একবার তাঁকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজতে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ত্রিবান্দ্রমে তিনি বেঙ্কটরমণের বয়সী একটি ছেলেকে দেখলেন ঠিক তার মত মাথার চুল, তাঁকে দেখে ছেলেটি পিছন ফিরে চলে গেল। এই ছেলেটি যে তাঁর বেঙ্কটরমণ ও সে তাঁকে দেখে উপেক্ষা করে চলে গেল এই বিশ্বাসে তিনি নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলেন।

যে কাকার কাছে বেঙ্কটরমণ মাদুরায় থাকতেন সেই সুব্বিয়াব ১৮৯৮ সালে আগস্ট মাসে মারা গেল। নেল্লিয়াপ্পিয়ার ও তাব পরিবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেখানে গেল আর এইখানেই তারা প্রথম হারিয়ে যাওয়া বেঙ্কটরমণের খবর পেল। একটি যুবক সেখানে এসেছিল, সে বললে যে, মাদুরার এক মঠে একজন আন্নামালাই তাম্বিরমের মুখে তিরুভন্নমালাই-এর একটি কিশোর স্বামীর সম্বন্ধে খুবই ভক্তি সহকারে আলোচনা হতে শুনেছে। স্বামী তিরুচুড়ী হতে এসেছেন শুনে সে আরও বিশদভাবে জানতে চায়, আর এইটু

শুনেছে যে তাঁর নাম বেঙ্কটরমণ। "ইনি নিশ্চয় তোমাদের বেঙ্কটরমণ আর ইনি এখন একজন শ্রদ্ধেয় মহাত্মা," এই বলে সে শেষ করলে।

নেল্লিয়াপ্পিয়ার মানামাত্বরার একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল। সুতরাং প্রয়োজন হলে ছুটি নেওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না, সে নিজেই নিজের মালিক। এই খবর পেয়ে সে সত্য জানার জন্য তৎক্ষণাৎ একজন বন্ধুর সঙ্গে তিরুভন্নমালাই রওনা হল। তারা স্বামীর খোঁজ পেলে, স্বামী তখন আমবাগানে ছিলেন। বাগানের মালিক বেঙ্কটরাম নায়কার তাদের ভিতরে যেতে বাধা দিলে, "তিনি মৌনী, ভিতরে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করা কেন?" যখন তাকে বলা হল যে, এই ব্যক্তি তাঁর আত্মীয়, সে তখন বললে যে, স্বামীকে কেবল একটা চিঠি লিখে পাঠানো যেতে পারে, তার বেশী কিছু নয়। নেল্লিয়াপ্পিয়ার একটা কাগজের টুকরোতে "মানামাত্বরার উকিল নেল্লিয়াপ্পিয়ার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়" লিখে পাঠালে।

স্বামী ইতিমধ্যেই ব্যবহারিক জীবনে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অথচ সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখাতে আরম্ভ করেছেন যেটা উত্তরকালে তাঁর স্বভাব হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য বহু ভক্ত অবাক হয়ে যেত। তিনি দেখলেন যে, যে কাগজে চিঠিটা লেখা ছিল সেটা রেজিস্ট্রেশান বিভাগ থেকে এসেছে, তার পিছন দিকে বড় ভাই নাগস্বামীর হাতের লেখায় কিছু লেখা ছিল, এই থেকে নাগস্বামী যে রেজিস্ট্রেশান বিভাগে করণিকের কাজ করছে বুঝতে পারলেন। এরূপে পরবর্তী জীবনে তিনি চিঠি উল্টে প্রথমে ঠিকানা ও পোস্টঅফিসের সীলমোহর বেশ ভালভাবে নিরীক্ষণ করতেন।

তিনি দর্শনার্থীদের ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন কিন্তু তারা ভিতরে প্রবেশ করলে, উদাসীন ও মৌন হয়ে রইলেন। একটু আগে চিঠিটি দেখতে যেটুকু আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তার বিন্দুমাত্রও রইল না। কিছুমাত্র আগ্রহ দেখালে তাদের মনে তাঁর বাড়ী ফেরার নিষ্ফল আশা জাগত। নেল্লিয়াপ্পিয়ার অপরিচ্ছন্ন, অস্নাত, জটামণ্ডিত, দীর্ঘনখ

সমন্বিত মহাত্মার অবস্থা দেখে খুবই কাতর হল। স্বামী মৌন বলে, সে পালানীস্বামী ও নায়কারকে সম্বোধন করে বললে যে, তার পরিবারের একজন যে এরূপ উচ্চ অবস্থা লাভ করেছে দেখে সে খুব সুখী হয়েছে, কিন্তু শরীরকে উপেক্ষা করা যায় না।

স্বামীর আত্মীয়রা তাঁকে তাদের নিকটে রাখতে চায়, তাঁর ব্রত বা জীবনধারা পরিবর্তনের জন্য কোন চাপ দেওয়া হবে না ; তিনি মৌন সাধু হয়ে থাকুন কিন্তু সেটা মানামাদুরায় যেখানে নেল্লিয়াপ্পিয়ার বাস করে তার কাছে হলেই ভাল হয়। সেখানে একজন বিখ্যাত সন্তের সমাধি আছে ; ইনি সেখানে থাকতে পারেন, এঁকে বিরক্ত না করে কেবল প্রয়োজনটুকু মেটান হবে। উকিল মহাশয় যতদূর সম্ভব যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিফল হল। স্বামী নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন, শুনেছেন কিনা বোঝা গেল না। নেল্লিয়াপ্পিয়ারের ব্যর্থতা স্বীকার করা ছাড়া উপায় রইল না। সে মা আলাগাম্মালকে তাঁর ছেলেকে পাওয়ার শুভ সংবাদ ও তার যে পরিবর্তন হয়েছে আর সে বাড়ী ফিরবে না এই দুঃখের খবর দিলে। তিরুভন্নমালই-এ পাঁচ-দিন থাকার পর সে মানামাদুরায় ফিরে গেল।

এর কিছু পরেই স্বামী আমবাগান ছেড়ে আইনাকুলাম পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে অরুণগিরিনাথের ছোট মন্দিরে চলে গেলেন। অপরের সেবায় নির্ভর করা একান্ত অপছন্দ করার জন্য তিনি পালানীস্বামীকে তাঁর জন্যে আহার্য যোগাড় করার থেকে নিজেই প্রতিদিন ভিক্ষায় বার হবেন ঠিক করলেন। তাকে বললেন, "আপনি একদিকে ভিক্ষায় যান আমি অন্যদিকে যাব, আমরা আর একসঙ্গে থাকব না।" পালানী-স্বামীর পক্ষে এটা একটা প্রচণ্ড আঘাত। স্বামীর পরিচর্যাই তার পূজার পদ্ধতি, আদেশ অনুসারে সে একলা চলে গেল বটে কিন্তু রাত্রে অরুণগিরিনাথের মন্দিরে ফিরে এল। তার স্বামীকে ছেড়ে সে কি করে থাকবে? তাকে থাকার অনুমতি দেওয়া হল।

স্বামী তখন মৌন। তিনি কোন একটা বাড়ীর সদর দরজায় গিয়ে

তালি দিতেন আর কোন আহার্য দেওয়া হলে সেটি ছু'হাত জোড় করে নিয়ে সেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেতেন। ডাকলেও কারও বাড়ীর ভিতরে যেতেন না। প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন গলিতে যেতেন আর কখন এক বাড়িতে ছু'বার ভিক্ষা করেন নি। তিনি পরে বলতেন যে, তিরুভন্ন-মালাই-এর প্রায় প্রতি রাস্তায় ভিক্ষা করেছেন।

একমাস অরুণগিরিনাথের মন্দিরে থাকার পর তিনি প্রধান মন্দিরের একটি স্তম্ভগৃহে আর মন্দিরের 'অলারি' বাগানে আসন নিলেন। যেখানেই যান ভক্তেরা তাঁর পিছু পিছু যায়। মাত্র এক সপ্তাহ এখানে থাকার পব অরুণাচল পাহাড়ের পূর্বদিকে পবড়কুন্নুর মন্দিরে যান ও সেখানে থাকেন। এখানেও যথারীতি সেই সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকা আর পালানীস্বামী চলে গেলে একবার ভিক্ষায় বার হওয়া। প্রায়ই এমন হয়েছে যে তিনি ভিতরে আছেন কিনা না দেখে মন্দিরের পুরোহিত তাঁকে মন্দিরে তালা বন্ধ করে চলে গেছে।

এখানেই মা আলগাম্মাল তাঁর ছেলেকে খুঁজে পেলেন। নেল্লিয়াপ্পিয়ারের কাছে খবর পেয়ে বড় ছেলে নাগস্বামীর বড়দিনেব ছুটির জন্য অপেক্ষা করলেন ও তাকে সঙ্গে নিয়ে তিরুভন্নমালাই এলেন। তিনি বেঙ্কটরমণের কৃশ চেহারা ও জটা সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলেন। মায়ের প্রাণ ছেলের অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। তাঁকে তাঁর সঙ্গে ফিরে যাওয়ার জন্য কত অনুরোধ করলেন কিন্তু তিনি অবিচলিত হয়ে বসে রইলেন, উত্তর দিলেন না, শুনতে পেয়েছেন কিনা বোঝাও গেল না। একদিন তাঁর উপেক্ষায় আহত হয়ে মা কাঁদতে লাগলেন। তবুও কোন উত্তর নেই। পাছে তাঁর করুণাপ্রকাশ হলে, যা হওয়ার নয় সেরূপ কোন মিথ্যা আশা মনে জাগে তাই উঠে চলে গেলেন। আর একদিন মা সমবেত ভক্তদের সহানুভূতি লাভ ক'রে তাঁর ছুঃখের কথা ব'লে তাদের তাঁর হয়ে অনুরোধ করতে বললেন। তাদের মধ্যে একজন পচিয়াপ্পা পিল্লাই স্বামীকে বললে, "আপনার মা এত করে বলছেন, কাঁদছেন

অন্ততঃ তাঁকে একটা উত্তর তো দিতে পারেন? 'হাঁ' কি 'না' যাহোক একটা উত্তর দিতে পারেন। স্বামীর মৌন ভঙ্গ করার প্রয়োজন নেই। এখানে কাগজ ও পেনসিল রয়েছে, স্বামীর যা বলার আছে লিখে দিতে পারেন।"

তিনি কাগজ পেনসিল নিয়ে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ভাবে একটা উত্তর লিখে দিলেন।

> "বিধাতা প্রারব্ধ অনুসারে জীবের ভাগ্য নির্ণয় করেন। যত চেষ্টাই করা হোক না, যা হওয়ার নয় তা হবে না। যা হওয়ার তা যত বাধাই দেওয়া হোক না কেন, হবেই। এটা অনিবার্য। অতএব নীরব থাকাই উত্তম পন্থা।"

সারতঃ তিনি মাকে যা বললেন, যীশুও তাঁর মাকে ঠিক তাই বলেছিলেন "হে নারী, তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? তুমি কি জান না আমাকে আমার মহান পিতার কার্য সম্পন্ন করতে হবে?" শ্রীভগবানের বৈশিষ্ট্য ছিল যে প্রথমতঃ তিনি মৌন থাকতেন যার অর্থ হল অসম্মতি; যখন মৌনকে মেনে নেওয়া হত না আর স্পষ্ট উত্তরের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হত, তিনি উত্তর দিতেন কিন্তু সেটা নিতান্ত নৈর্ব্যক্তিক সিদ্ধান্তগত উত্তর হলেও ব্যক্তির প্রশ্ন-বিশেষের প্রয়োজনীয় উত্তরই হত।

শ্রীভগবানের উপদেশে এ বিষয়ে দ্বিমত ছিল না যে, যা হওয়ার তা হবে আর এর সঙ্গে এও বলতেন যে, যা কিছু হয় তা প্রারব্ধানুসারেই হয়। সেটা কার্য-কারণ সম্বন্ধে এতই দৃঢ়বদ্ধ যে তাকে 'ন্যায্য' শব্দেও অভিহিত করা যায় না। তিনি মানুষের পুরুষকার ও দৈববাদের বিতর্কের মধ্যে কখনো যেতেন না। কারণ এইসব পরিকল্প যদিও মানসিক ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী তাহলেও তারা একই সত্যের বিভিন্ন বিভাবের প্রকাশ। তিনি বলতেন, "খুঁজে দেখো কে দৈবাধীন বা কার পুরুষকার।"

তিনি স্পষ্টই বলতেন, "শরীরটাকে যা কর্ম করতে হবে সেটা তার

উৎপত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে আছে—তোমার এইটুকু স্বাধীনতা আছে যে তুমি নিজেকে শরীরের সঙ্গে একাত্ম ভাববে কিনা।" যদি একজন একটা নাটকে অভিনয় করে তা সে যাকে হত্যা করা হয়েছিল সেই সিজারের কিংবা যে হত্যা করেছিল সেই ব্রুটাসের ভূমিকা করুক তবে সমস্ত সংলাপটা আগেই লেখা হয় আর তাকে সারা সংলাপটা হুবহু বলে যেতে হয়। কিন্তু সে যে সেই ব্যক্তি নয় এটা জেনে অবিচলিত থাকতে পারে। এরূপে যে নিজেকে অবিনাশী আত্মার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করেছে সে ভয়-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে নিজের অংশটুকু অভিনয় ক'রে যায়। আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, সবই যদি আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে একজনের ব্যক্তিত্বের আর কি সার্থকতা! তারপরই এই প্রশ্ন হওয়া অনিবার্য "তাহলে আমি কে?" যে অহংকার মনে করে, সে সব সিদ্ধান্ত করে সে যদি সত্য না হয় আর তবুও আমি জানি যে আমি আছি তবে আমার স্বরূপ কি? এটা শ্রীভগবানের কথিত অনুসন্ধানের প্রারম্ভিক মানসিক রূপ পরন্তু বাস্তবিক অনুসন্ধানের পক্ষে সর্বোত্তম

আবার আপাত-বিরোধী বিচার যে, মানুষ তার ভাগ্য নির্মাণ করে, এও কম সত্য নয় কারণ প্রত্যেক ঘটনা কার্য-কারণ সম্বন্ধে সন্নিবদ্ধ আর প্রত্যেক চিন্তা, কথা ও ক্রিয়ার নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হয়। এ বিষয়ে শ্রীভগবানের সিদ্ধান্ত অন্যান্য মহাপুরুষদের মতই অটল। দশম অধ্যায় বর্ণিত ভক্ত শিবপ্রকাশ পিল্লাইকে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "জীবের কর্মফল তার কর্মানুসারে ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী লাভ হয়, সুতরাং উত্তর-দায়িত্ব জীবেরই, ঈশ্বরের নয়।" তিনি সর্বদাই চেষ্টার ওপর জোর দিতেন। 'শ্রীরমণ বাণী'তে লেখা আছে যে একবার এক ভক্ত অনুযোগ করে "অক্টোবরে এই আশ্রম থেকে চলে যাওয়ার পর ভগবানের সান্নিধ্যে যে শান্তি অনুভব হয় তা আমার সঙ্গে দশ দিন ছিল। সর্বদা সকল কাজে ব্যস্ত থাকলেও একটা নীরস বক্তৃতা শোনার

সময়ে অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় যেমন দু'টি চেতনার অনুভব হয় সেই রকম একটা একত্বের শান্তি ফল্গু-ধারার মত প্রবাহিত হচ্ছিল। তারপর সেটা একেবারে চলে গেল আর আগের মত জড়তার ভাব ফিরে এল'।" শ্রীভগবান উত্তর দিলেন, "তুমি যদি মনকে শক্তিমান করতে পার তবে এই শান্তি স্থায়ী হবে। এর স্থায়িত্ব বার বার অভ্যাসের ফলে মনের শক্তির অনুপাতের ওপর নির্ভর করে।" 'উপদেশ মঞ্জরী'তে একজন ভক্ত দৈব ও পুরুষকারের আপাতবিরোধ সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ ক'রে প্রশ্ন করে, "যদি বলা হয় যে সবই দৈবাধীন তবে সাধনার বাধাগুলো যা একজনের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রোধ করে তারাও দুরতিক্রম্য হবে, কেন না অপবিবর্তনীয় ভাগ্যই তাদের তৈরী করেছে। তাহলে সেগুলো কি করে দূর করা যাবে?" এতে শ্রীভগবান উত্তর দিলেন, "যে ভাগ্য ধ্যানের বাধা দেয় তাব অস্তিত্ব কেবল বহির্মনের জন্য, অন্তর্মনের জন্য নয়। অতএব যে আপন অন্তরে আত্মার অন্বেষণ করে তার সাধন পথে যেকোন বাধা আসুক না কেন সে ভীত হয় না। এরূপ বাধা আছে এই চিন্তাটাই একটা প্রধান বাধা।"

মাকে বলা উত্তরের শেষ অংশটি এরূপ ছিল "অতএব মৌন থাকাই সর্বোত্তম পন্থা"—এটা বিশেষ করে মায়ের কথার উত্তর, কারণ মা যা চাইছিলেন তা হওয়ার নয়। এটা সাধারণভাবে অন্যের প্রতিও খাটে, তার অর্থ "কাঁটার বিপক্ষে পদাঘাত করে কোন লাভ নেই", অর্থাৎ যা অব্যর্থ তার জন্য চিন্তা করা নিষ্ফল, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, চেষ্টা করা ছেড়ে দিতে হবে। যে বলে "সবই ভাগ্য সুতরাং আমি চেষ্টা করব না", সে একটা ভুল ধারণার অধীন হয়, "আমি জানি, ভাগ্যে কি আছে"—এমনও হতে পারে যে তার চেষ্টা করাটাই ভাগ্যের লিখন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভগবদগীতায় বলেছিলেন যে তার নিজের প্রকৃতিই তাকে যুদ্ধ করাবে।

মা বাড়ী ফিরে গেলেন আর স্বামী আগের মত রইলেন। তবে ঠিক আগের মত নয়। যে আড়াই বছর তিনি তিরুভন্নমালাই মন্দিরে

ও ছোটখাট দেবালয়ে কাটিয়েছেন তার মধ্যেই তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার বাহ্যিক লক্ষণ দেখা দিয়েছে! তিনি নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ে খাচ্ছেন, অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেই ভিক্ষায় যাচ্ছেন। কয়েকবার কথাও বলেছেন। ভক্তদের প্রশ্নের উত্তব দেওয়া, বইপড়া ও তার সাবতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করেছেন।

যখন প্রথম তিরুভন্নমালাই এসেছিলেন, তিনি জগত-সংসার ও শবীরকে উপেক্ষা করে আত্মানন্দে সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকতেন। হাতে খাবার তুলে দিলে কিংবা মুখে তুলে ধরলে কিছু খেতেন তাও যৎসামান্য, কেবলমাত্র শরীর ধারণ করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন। একে 'তপ' বলে সংজ্ঞা দেওযা হয়েছে কিন্তু 'তপ' শব্দের অর্থ অনেক ব্যাপক। এর অর্থ ধ্যান হতে পারে যার ফলে কৃচ্ছ্রসাধন হতে পারে। সাধারণতঃ এটা পূর্বকৃত পাপক্ষয় আর তার পুনরাবৃত্তি নিরাকরণের প্রচেষ্টা। এটা শক্তির মন আর ইন্দ্রিয় পথে বহির্মুখীনতা রোধ করার জন্য করা হয়।

অভিপ্রায় এই যে, সামান্যতঃ আত্মোপলব্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও কৃচ্ছ্রতার প্রচেষ্টাকে 'তপ' বলা হয়। শ্রীভগবানের পক্ষে মানসিক সংঘর্ষ, প্রায়শ্চিত্ত ও শক্তির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের একান্ত অভাব ছিল, কারণ শরীরের সঙ্গে 'আমি'র ভুল নির্ধারণ ও তার ফলে শরীরেব প্রতি আসক্তি তাঁর আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কৃচ্ছ্রতার কথা ওঠে না, কারণ তিনি নিজেকে কৃচ্ছ্রতা সাধনকারী শরীরের সঙ্গে 'এক' অনুভব করা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি সেটা এ ভাবে বলতেন "আমি খেতাম না, তাই ওরা বলত উপবাস করছি। কথা বলতাম না, তাই তারা বলত মৌনী।" সহজ ভাষায় বলতে গেলে এই আপাত তপস্যা আত্মো-পলব্ধির জন্য নয় পরন্তু আত্মোপলব্ধির পরিণাম। তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে মাদুরায় তাঁর কাকার বাড়ীতে আধ্যাত্মিক জাগরণের পর তিনি আর কোন সাধনা করেন নি।

যেখানে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার জন্য মৌনব্রত ধারণ করা

হয়, এরূপ সাধারণ অর্থে শ্রীভগবান মৌনী ছিলেন না। সাংসারিক প্রয়োজনীয়তার অভাবে তাঁর কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া একজন মৌনীকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল মৌন ধারণ করলে উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

প্রথম কয়েক মাস আত্মানন্দে এতই বিভোর ছিলেন যে জাগতিক বোধ প্রায়শঃই লুপ্ত হয়ে যেত। তিনি এটি তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে বলেছেন—

"আমি চোখ খুলে কখন দেখতাম দিন কখন রাত। কখন সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হত জানতাম না।" এ অবস্থা পরেও খানিকটা ছিল তবে সেটা সব সময় না হয়ে বিরল অবসবে কখন কখন দেখা দিত। পরবর্তীকালে শ্রীভগবান একবার বলেছিলেন যে, প্রায়ই প্রাত্যহিক বেদপারায়ণের প্রথম ও শেষ অংশ তিনি শুনতে পান কিন্তু এতই তন্ময় হয়ে যান যে মধ্যের অংশ কিছু শোনেন না আর ভাবেন এত তাড়া-তাড়ি কি করে শেষ হয়ে গেল, তবে কি ওরা কিছু বাদ দিয়ে গেল নাকি! তা সত্ত্বেও তিরুভন্নমালাই-এর প্রথমদিকে হওয়া ঘটনা সম্পর্কে কখন কখন পূর্ণ সচেতন ছিলেন, আর পরবর্তী জীবনে সেকালের ঘটনার যথাযথ বর্ণনা করতেন, যা লোকে সে সময়ে মনে করেছিল যে তিনি কিছুই জানেন না।

আত্মানন্দে পূর্ণস্থিতি জনিত বহির্জগৎ বিস্মৃতিকে নির্বিকল্প সমাধি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এটাও পরমানন্দের অবস্থা কিন্তু স্থায়ী হয় না। শ্রীভগবান একে (শ্রীরমণবাণী পুস্তকে) কূপে ডোবান বালতির সঙ্গে তুলনা দিয়েছেন। বালতির জল (মন) কূপের জলের (আত্মা) সঙ্গে এক হয়ে যায় কিন্তু দড়ি ও বালতির (অহংকার) সত্তা এ পর্যন্ত থাকার জন্য এটা ওপরে উঠে আসে। সর্বোচ্চ ও চরম অবস্থা হল সহজ সমাধি যা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এটা শুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্য, যা মানসিক ও শারীরিক স্তরের অতীত অথচ এতে বাহ্য জগতের সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানও রয়েছে আর মানসিক ও শারীরিক

শক্তির সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীলতাও আছে ; এটা নির্বিকল্প সমাধির পরমানন্দ অবস্থারও অতীত সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থা ও পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের অবস্থা। তিনি একে মহাসাগরের জলে নদীর জল মিশে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ অবস্থায় অহংকার তার সকল সীমারেখার সহিত চিরকালের জন্য আত্মায় মিশে গেছে। এখানে পূর্ণ স্বাধীনতা, শুদ্ধ চৈতন্য, বিশুদ্ধ আমিত্ব যাতে কোন শরীর বা ব্যক্তিসত্তার সীমিত ভাব নেই।

শ্রীভগবান আগেই এই পরমাবস্থা লাভ করেছিলেন যদিও বাহ্য চেতনা তখনও নিরবচ্ছিন্ন হয়নি। বাহ্যক্রিয়াশীলতা যা পরে এসেছিল তাও আপাত, কোন প্রকৃত পরিবর্তন নয়। শ্রীভগবান 'শ্রীরমণবাণী'তে এর বর্ণনা দিয়েছেন—

> "জ্ঞানীর পক্ষে অহংকারের উদয় ও অস্তিত্ব কেবল একটা ভান মাত্র আর এই উদয় ও অস্তিত্ব সত্ত্বেও সে তার মনোযোগ উৎসে নিবদ্ধ ক'রে নিরবচ্ছিন্ন তুরীয় অবস্থা অনুভব করে। এরূপ অহংকার ক্ষতিকর নয়। এটা একটা পোড়া দড়ির মত—যদিও আকারটা আছে কিন্তু বাঁধার কাজে লাগানো যায় না।"

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

অরুণাচল

অরুণাচলকে যেন কেমন একটা রুক্ষ এবড়োখেবড়ো মনে হয়। পাথরগুলো যেন একটা দৈত্যের হাতে এলোমেলো ছড়ানো। শুকনো কাঁটাগাছ ও ফণীমনসার বেড়া, রোদে পোড়া ক্ষেত, ছোট ছোট ক্ষয়ে যাওয়া নেড়া পাহাড়, ধূলাভরা পথের ধারে বিশাল ছায়াময় গাছ আর এখানে ওখানে পুকুর বা কূপের পাশে ঘন সবুজ ধানের ক্ষেত। চারিপাশে এই রুক্ষ সৌন্দর্যের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে অরুণাচল। মাত্র ২,৬৮২ ফুট উঁচু, তবু সমস্ত সহরটিতে তার আধিপত্য। দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ আশ্রমের দিকে এটি আপাতদৃষ্টিতে বেশ সরল, যেন একটি সমমিত পাহাড় যার দু'টি সানু প্রায় সমান। এই সমতাকে আরও স্পষ্ট করে প্রতিদিন সকালে তার চূড়ায় একটি বাষ্প বা মেঘের মুকুট। কিন্তু কি আশ্চর্য যতই প্রদক্ষিণের আট মাইল পথে, পাহাড়কে ডান দিকে রেখে দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে এগিয়ে যাওয়া যায়, দৃশ্যও বদলায় আর প্রতিটি দৃশ্য যেন তার বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে—কোথাও প্রতিধ্বনির অনুরণন ভেসে আসে, কোথাও দু'টি ছোট পাহাড়ের মাঝে চূড়াটি উঁকি দেয়, যেন দু'টি চিন্তার মাঝে আত্মতত্ত্বের ক্ষণিক স্ফুরণ, আবার কোথাও পঞ্চচূড়া, কোথাও শিবশক্তিরূপে দু'টি, আরও কত দৃশ্য!

আটদিকে পুণ্যসরোবর আর বিভিন্ন মহত্বপূর্ণ স্থানে মণ্ডপ (পাথরের বড় বড় চৌতারা)। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ দক্ষিণামূর্তি মণ্ডপটি দক্ষিণ দিকে, যেখানে শিব দক্ষিণামূর্তিরূপে মৌন উপদেশ দেন, এই অরুণাচল।

দ্রষ্টা কে? খুঁজিয়া আপন অন্তরে
দ্রষ্টার বিলয়ে, এ প্রকাশময়।

যেখানে 'আমি দেখি' চিন্তা নাই
'আমি দেখি নাই' ভাব রহে কোথায় ?
পুরাকালে কথিত যা মৌন ব্যাখ্যায়
ভাষায় প্রকাশ করি, এ শক্তি কোথায় ?
মৌন ব্যাখ্যার ছলে যে তুরীয় স্থিতি,
অরুণাচলরূপে আছ ব্যাপি নভ ক্ষিতি ॥

অরুণাচল অষ্টক-২

শ্রীভগবান ভক্তদেব সব সময় পাহাড় প্রদক্ষিণের উৎসাহ দিতেন। এমন কি বৃদ্ধ ও অশক্তদেরও তিনি নিরুৎসাহ করতেন না, পরন্তু তাদের ধীরে ধীরে চলার পরামর্শ দিতেন। বস্তুতঃ প্রদক্ষিণ ধীরে করা উচিত "যেমন একজন গর্ভবতী সম্রাজ্ঞী তার নয় মাস গর্ভাবস্থা কালে ধীরে ধীরে চলে।" পরিক্রমা হয় মৌন অবস্থায় না হয় গান গাইতে গাইতে কিংবা শাঁখ বাজাতে বাজাতে কোন যানবাহন বিনা খালি পায়ে হেঁটে করাই ভাল। প্রদক্ষিণের সর্বাপেক্ষা শুভ সময় শিবরাত্রি ও কার্তিকী পূর্ণিমা, যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রমণ্ডলী পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে সম্মিলিত হয়। এই দুই উপলক্ষ্যে ভক্তদের অবিরত প্রদক্ষিণের স্রোতকে অরুণাচলের গলায় মালার সঙ্গে তুলনা করা হয়।

একজন বয়স্ক পঙ্গু লাঠি নিয়ে একবার প্রদক্ষিণের পথে বার হয়েছে। সে বহুবার প্রদক্ষিণ করেছে কিন্তু এবার সে তিরুভন্নমালাই ছেড়ে চলে যাবে স্থির করেছে। নিজেকে সে পরিবারের ভারসরূপ মনে করে, বাড়ীতে ঝগড়া হয়, তাদের ছেড়ে কোন রকমে কোথাও গিয়ে থাকবে ঠিক করেছে। হঠাৎ একটি ব্রাহ্মণ যুবক তার সামনে এসে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে বললে, "তোমার লাঠির দরকার নেই।" ভিতরের রাগটা কথায় প্রকাশ হওয়ার আগেই সে অনুভব করলে যে তার পা সোজা হয়ে যাচ্ছে আর তার লাঠির প্রয়োজন নেই। সে আর তিরুভন্নমালাই ছাড়লে না, সেখানেই রইল, সবাই তার কথা শুনলে। শ্রীভগবান এই গল্পটা বিস্তারিত ভাবে কোন ভক্তকে বলেন

আর এও বলেছিলেন যে 'অরুণাচল স্থল পুরাণে' বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে এর খুব মিল আছে। সে সময় তিনি তরুণস্বামী-রূপে পাহাড়ে বাস করতেন কিন্তু তিনি কখনও একথা বলেন নি যে তিনিই ব্রাহ্মণ যুবক-রূপে দেখা দিয়েছিলেন।

অরুণাচল ভারতের সকল পুণ্যময় স্থানের মধ্যে প্রাচীন তীর্থস্থানের একটি। শ্রীভগবান একে পৃথিবীর হৃদয় ও বিশ্বের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র বলতেন। শ্রীশঙ্কর একে মেরু পর্বত বলে বর্ণনা করেছেন। স্কন্দ পুরাণ বলে—

এ-ই সেই পরম পুণ্য অরুণাচল।
সর্বোত্তম সংসারে, বিশ্বের হৃদয়।
এ-ই গুহ্য পবিত্র শিব অন্তঃকরণ,
অরুণ-গিরি-রূপে শিব বিরাজমান॥

অগণিত মহাত্মা এখানে বাস ক'রে আপন আপন পবিত্রতা পাহাড়ে মিশিয়ে দিয়েছেন। আর এও বলা হয় ও শ্রীভগবানও সেটা স্বীকার করেছেন যে এর গুহাসমূহে শরীরী বা অশরীরী রূপে আজও বহু সিদ্ধ বাস করেন, কাউকে কাউকে রাত্রে জ্যোতিরূপে পাহাড়ে বিচরণ করতে দেখা যায়।

পাহাড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। একবার বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বিবাদ হয়। এই বিবাদের ফলে পৃথিবী রসাতলে যেতে বসে ; তখন দেবতারা শিবের কাছে গিয়ে তাঁকে বিবাদ মিটিয়ে দিতে অনুরোধ করে। তার ফলে শিব নিজেকে এক জ্যোতিস্তম্ভ রূপে তাঁদের সামনে প্রকট করেন, সেই স্তম্ভ থেকে একটি দৈববাণী হয় যে, যে এই স্তম্ভের শিখর বা মূল খুঁজে পাবে সে-ই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু এক শূকরের রূপ ধরে মূল অনুসন্ধানের মানসে পৃথিবী খুঁড়তে আরম্ভ করলেন আর ব্রহ্মা এক হংস হয়ে শিখরের উদ্দেশ্যে উড়ে চললেন। বিষ্ণু মূলে পৌঁছাতে বিফল হলেন কিন্তু প্রত্যেকের হৃদয়স্থিত সেই পরম জ্যোতিকে নিজের মধ্যে অনুভব

করে ধ্যানমগ্ন হয়ে নিজের শরীর-জ্ঞান ও যে খুঁজছিল সেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা একটি পাহাড়ী গাছের ফুলকে ওপর থেকে পড়তে দেখে ছলনা করে জিতে যাওয়ার জন্য সেটি নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি বললেন যে ফুলটি তিনি শিখর থেকে এনেছেন।

বিষ্ণু হার স্বীকার করলেন ও ঈশ্বরেব স্তুতি-বন্দনা করে বললেন, "আপনি আত্মজ্ঞান, আপনিই ওঁকার। আপনি প্রত্যেক বস্তুর আদি, মধ্য ও অন্ত। আপনিই সব আর সবকিছু প্রকাশ করছেন।" বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা হল আর ব্রহ্মা লজ্জিত হয়ে ভুল স্বীকার করলেন।

এই কাহিনীর বিষ্ণু অহংকার বা ব্যক্তিসত্তা, ব্রহ্মা মন আর শিব আত্মা।

কাহিনীতে বলা হয়েছে যে এই জ্যোতিস্তম্ভ বা লিঙ্গ অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল, চোখে দেখা যাচ্ছিল না, সুতরাং শিব নিজেকে অরুণাচল পাহাড় রূপে প্রকাশ ক'রে বলেন, "যেমন চন্দ্রমা সূর্যের আলোয় প্রকাশিত হয় সেইরূপ সমস্ত পুণ্যভূমি অরুণাচলের পবিত্রতা দ্বারাই পুণ্যময় হয়। এই একমাত্র স্থান যেখানে আমি ভক্তদের উপাসনা ও জ্ঞানলাভের জন্য রূপ ধারণ করলাম। অরুণাচল স্বয়ং ওঁকার। আমি প্রতি বছর কার্তিকী পুর্ণিমায় এব শিখরে শান্তির আলোক-সঙ্কেত-রূপে আবির্ভূত হব।" এটা কেবল অরুণাচলের মহত্ত্ব নয় পরন্তু অদ্বৈততত্ত্ব ও আত্মানুসন্ধানের পথের মহত্ত্ব, যার কেন্দ্র অরুণাচল, তাও নির্দেশ করে। শ্রীভগবানের উক্তি "পরিশেষে সবাইকে অরুণাচলেই আসতে হবে", এ থেকে যে-কেউ এটা বুঝতে পারবে।

তিরুভন্নমালাই আসার ছ'বছরের কিছু বেশী সময় পরে শ্রীভগবান পাহাড়ে বাস করা আরম্ভ করেন। ততদিন অবধি মন্দিরে কিংবা কোন না কোন দেবালয়ে বাস করতেন। কেবল ১৮৯৮ সালের শেষের দিকে তিনি বহু শতাব্দী পূর্বে গৌতম ঋষির বাসের দ্বারা পবিত্র

পবড়কুন্নুরু মন্দিরে বাস করেন। সেখানে তাঁর মা তাঁকে পেয়েছিলেন। তিনি তারপর আর অরুণাচল ত্যাগ করেন নি। পরের বছরের গোড়ার দিকে পাহাড়ের একটি গুহায় আসেন, আর তারপর ১৯২২ সাল অবধি একটার পর একটা গুহায় বাস করেন। এরপর তিনি পাহাড়ের সানুদেশে নেমে আসেন। সেখানেই বর্তমান আশ্রম গড়ে ওঠে আর এখানেই বাকী জীবন কাটান।

পাহাড়ে থাকা কালে প্রায় সব সময়ই তিনি দক্ষিণ সানুতে ছিলেন। আশ্রমও দক্ষিণ দিকে, ঠিক দক্ষিণামূর্তি মণ্ডপের পাশে। দক্ষিণামূর্তি শ্রীভগবানের ১০৮ নামের মধ্যে একটি, এই ১০৮ নাম এখন তাঁর সমাধি মন্দিবে পাঠ করা হয়। এই নামটি সামান্যতঃ আধ্যাত্মিক যোগ্যতার প্রতীক যেমন সদ্‌গুরুকে মেরু বলা হয়, যাকে কেন্দ্র করে বিশ্বসংসাব আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ ভাবে এটি দক্ষিণামূর্তির নাম। দক্ষিণামূর্তি মৌন ভাবে উপদেশদাতা শিব। এই অধ্যায়ের প্রথমে যে কবিতাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে শ্রীভগবান অরুণাচল ও দক্ষিণামূর্তিকে এক বলেছেন। নিম্নোক্ত পদে তিনি অরুণাচল ও রমণকে এক বলেছেন।

> "বিষ্ণু অবধি সকল জীবের হৃদয় কমল অভ্যন্তরে,
> অরুণাচল রমণ পরমাত্মন্ শুদ্ধসত্ব জ্যোতির্ময়।
> প্রেমে গলিত মন, হৃদয়ে হলে ধারণ সেথা প্রিয়তম,
> শুদ্ধ বোধের সূক্ষ্মদর্শনে, আত্মস্বরূপ নিরীক্ষণ॥"

যে গুহায় তিনি সর্বপ্রথম যান ও সব থেকে বেশী সময় থাকেন সেটা দক্ষিণ-পূর্ব ঢালুতে অবস্থিত। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন মহাত্মা বিরূপাক্ষের নামে এটি বিখ্যাত। ইনি এখানে বাস করতেন ও এখানেই তাঁর সমাধিও আছে। আশ্চর্যের বিষয় যে গুহাটি ওঁ এই অক্ষরের আকারে গঠিত। সমাধি এর একেবারে অন্তর্দেশে অবস্থিত। বলা হয় যে গুহার ভিতর ওঁকার ধ্বনি শোনা যায়।

নগরস্থ বিরূপাক্ষ মঠের স্বত্বাধিকারী এই গুহার অধিকারী। কার্তিকী পূর্ণিমার সময়ে তারা দর্শনার্থী যাত্রীদের ওপর সামান্য প্রণামী ধার্য করত। যে সময় শ্রীভগবান সেখানে বাস করতে যান তখন প্রণামী গ্রহণ বন্ধ ছিল কারণ দুই বিরুদ্ধ পক্ষের গুহার স্বত্ব নিয়ে মামলা চলছিল। যখন মামলার রায় বের হল, বিজয়ী দল আবার প্রণামী গ্রহণ শুরু করলে। ইতিমধ্যে দর্শনার্থীর ভিড় যথেষ্ট বেড়েছে, আর সেটা কেবল কার্তিকী পূর্ণিমা না হয়ে সারা বছর চলেছে। এই দর্শনার্থীরা শ্রীভগবানের উপস্থিতির জন্য সেখানে যেত, সেজন্য এই প্রণামী একরূপ শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য দিতে হয় মনে হত। এটা না হতে দেওয়ার জন্য শ্রীভগবান গুহার সামনে সমতল স্থানে চলে এলেন, আর একটা গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। প্রণামী আদায়কারীও সেই স্থানটি তার এলাকাভুক্ত ক'রে আরও এগিয়ে গাছের তলায় যাওয়ার রাস্তায় তার স্থান বদল করলে। সুতরাং শ্রীভগবান সেই স্থান ত্যাগ ক'রে আরও নীচে, সদ্‌গুরুস্বামীর গুহায় চলে গেলেন। সেখানে কিছু দিন থেকে অন্য একটা গুহায় চলে যান। বিরূপাক্ষ গুহার দর্শনার্থীর ভিড় থেমে গেল। যখন স্বত্বাধিকারীরা দেখলে যে তাদের কিছু লাভ হল না, কেবল স্বামীর অসুবিধা করা হল তখন তারা তাঁর কাছে গিয়ে আবার গুহায় ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করলে ও কথা দিলে যে তিনি যতদিন সেখানে থাকবেন ততদিন তারা আর প্রণামী ধার্য করবে না। এই শর্তে তিনি আবার ফিরে আসেন।

গ্রীষ্মকালে বিরূপাক্ষ গুহা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠত। পাহাড়ের ঢালুতে মুলাইপলতীর্থ পুষ্করিণীর কাছে একটা গুহা ছিল সেটা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আর কাছে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। একটা আমগাছও সেই গুহার ওপর ছিল আর গুহাটিকে ছায়ায় ঘিরে রাখত, সেজন্য সেই গুহার নাম 'আম্রগুহা' হয়েছিল। শ্রীভগবানের ভক্ত দুই ভাই গুহার সামনে ঝুলে পড়া পাথর বারুদ দিয়ে ভেঙ্গে দেয় আর সামনে একটা

দেওয়াল তুলে দরজা বসিয়ে দেয়। তিনি গরমের সময় এই গুহায় থাকতেন।

১৯০০ সালে শ্রীভগবানের পাহাড়ে বাস শুরু হওয়ার কিছু পরেই নাল্লাপিলাই নামে এক ভক্ত কুম্ভকোনাম থেকে তিরুভন্নমালাই আসে ও তাঁর একটা ফোটো নেয়। একটি সুন্দর যুবকেব ছবি, প্রায় শিশুর মত, কিন্তু তা থেকেও শ্রীভগবানের শক্তি ও গাম্ভীর্য স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

পাহাড়ে থাকাব প্রথম দিকে শ্রীভগবান মৌনী ছিলেন। তাঁব তেজস্বিতায় কয়েকজন ভক্ত আকর্ষিত হয়ে এসে গেছে, একটি আশ্রমও গড়ে উঠেছে। কেবল যে সত্যান্বেষীরাই তাঁর কাছে আসত তা নয়, সাধাবণ লোক, বালক-বালিকা এমন কি জীবজন্তুও আসত। সহরের ছোট ছেলেমেয়েরা পাহাড়ে চড়ে বিরূপাক্ষ গুহায় এসে তাঁর কাছে বসত, তাঁর চারপাশে খেলাধূলা করত আর খুশি মনে আপন আপন ঘরে চলে যেত। কাঠবিড়াল ও বাঁদর তাঁর কাছে এসে হাত থেকে খাবার খেয়ে যেত।

তিনি কখন কখন ভক্তদের জন্য ব্যাখ্যা ও নির্দেশ লিখতেন, তাঁর মৌনের জন্য ভক্তদের শিক্ষার কোন ব্যাঘাত হত না। কারণ এখন বা পরে যখন তিনি কথা বলা শুরু করেছেন উভয় সময়েই তাঁর প্রকৃত শিক্ষা ছিল দক্ষিণামূর্তির ধারা অনুযায়ী মৌন শিক্ষা। এই ঐতিহ্য চীন দেশের লাউৎ-সু ও প্রাচীন 'তাও' বাদীদের মধ্যে পরম্পরাক্রমে চলে এসেছে। "যে 'তাও'কে নাম দিয়ে বলা যায় সেটা 'তাও' নয়"—যে জ্ঞানকে সূত্রবদ্ধ করা যায় তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। এই মৌন শিক্ষা প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক প্রভাব যা মন গ্রহণ করে ও পরে নিজ সামর্থ্যানুসারে ব্যাখ্যা করে। প্রথম ইউরোপীয় দর্শক এর এই প্রকার বর্ণনা করেছে।

"গুহায় পৌছে আমরা তাঁর পায়ের কাছে চুপ করে বসলাম। আমরা এরূপে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। আমার মনে হল,

যেন কিবকম উপবে উঠে যাচ্ছি। আমি আধঘণ্টা মহর্ষির চোখের দিকে চেয়ে রইলাম, তাঁর গভীর চিন্তাধারা অপরিবর্তিত ভাবে চলতে লাগল। আমি যেন কিভাবে অনুভব করতে আরম্ভ করলাম যে শবীরটা পবিত্র আত্মার মন্দিব, আমাব এইটুকু অনুভব হল যে, তাঁর শরীরটা মানুষেব নয়—এটা ঈশ্বরের যন্ত্র, যেন একটি বসে থাকা নিশ্চল শব যাব মধ্য থেকে ঈশ্বরের প্রকাশ অতি তীব্র বেগে বিকীর্ণ হচ্ছে। আমাব নিজের অনুভূতিও অবর্ণনীয়।"*

আরও একজন, পল ব্রাণ্টন, যার মনোভাব বিশ্বাসী অপেক্ষা সন্দেহবাদী ছিল; সে তাব মনেব ওপব শ্রীভগবানের মৌনেব প্রথম প্রভাব সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা দিয়েছে—

"আমার একটা পুবাতন বিশ্বাস আছে যে, মানুষের চোখ দেখেই তার আত্মার পরিচয জানা যায়, কিন্তু মহর্ষিব চোখেব সামনে নিজেকে সঙ্কুচিত, অভিভূত ও হতপ্রভ অনুভব করি···।

"আমি তাঁব দিক থেকে চোখ ফেবাতে পারি না। আমাব প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষাজনিত প্রাবম্ভিক অস্থিবতা ও হতবুদ্ধিব ভাব ক্রমশঃ তাঁব অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে প্রভাবিত হয়ে দূর হল। এই অসাধারণ দৃশ্যেব দু'ঘণ্টা পরে আমাব অনুভব হল যে আমাব মধ্যে নীববে অপ্রতিবোধে একটা পরিবর্তন হচ্ছে। যে প্রশ্নগুলো আমি ট্রেনে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যথাযথ রূপে তৈরি কবেছিলাম, সেগুলো এক এক কবে লুপ্ত হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বা না কবার কোন গুরুত্ব রইল না। এতদিন যে সংশয়গুলো আমায় ব্যতিব্যস্ত কবছিল সেগুলো সমাধান হোক বা না হোক তাতে আর কিছু এসে যায় না। আমি কেবল এইটুকু অনুভব কবলাম যেন

---

* এফ এইচ হামফ্রিস্ কর্তৃক তার লণ্ডনস্থ কোন বান্ধবীকে লেখা পত্র থেকে। এটি ইণ্টারন্যাশন্যাল সাইকিক্ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

একটা শান্তিপ্রবাহ আমার কাছ দিয়ে বয়ে চলেছে আর একটা পরম শান্তি আমার অন্তরে প্রবেশ করছে। আমার চিন্তা-জর্জরিত মস্তিষ্ক যেন একটা বিশ্রামে পৌঁছে যেতে আরম্ভ করেছে।”

কেবল যে যক্তিবাদী অশান্ত মনই শ্রীভগবানের অনুকম্পায় শান্তি পেত তা নয়, শোকাতুর হৃদয়ও জুড়িয়ে যেত। মণ্ডাকোলাতুর গ্রামের লক্ষ্মী আম্মাল, যাকে আশ্রমে এচাম্মাল বলা হত, একজন স্বামী-পুত্রবতী সুখী ঘরনী ; কিন্তু পঁচিশ বছর বয়সের আগেই তার স্বামী ও তারপর তার একমাত্র পুত্র ও একমাত্র কন্যা মারা গেল। পর পর শোকের আঘাতে আর স্মৃতির অত্যাচারে সে অস্থির হয়ে উঠল। যেখানে একদিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়েছে, যাদের মধ্যে সে একদিন সুখে ছিল সেই স্থান ও পরিবেশ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। দূরে গেলে ভুলে যাওয়া সহজ হবে ভেবে বোম্বাই প্রদেশের গোকর্ণের সাধু-সন্তদের সেবা করার মানসে সেখানে চলে গেল কিন্তু সে যেমন শোকাতুর গিয়েছিল তেমনি ফিরে এল। তার কোন পরিচিত লোক তাকে তিরুভন্নমালাই-এর তরুণস্বামীর কথা বলে, যারা চায় তাদের তিনি শান্তি দেন। সে তৎক্ষণাৎ রওনা দিলে। এই শহরে তার আত্মীয় ছিল, পাছে তাদের দেখলে তার সেই বেদনাময় পুরাতন স্মৃতি জেগে ওঠে, ভেবে তাদের কাছে গেল না। একজন সাথীর সঙ্গে পাহাড়ে উঠে স্বামীর কাছে পৌঁছে গেল। নীরবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল, নিজের শোকের কোন কথাই বললে না। আর বলার প্রয়োজনও ছিল না। তাঁর নয়নের অনুকম্পার দৃষ্টি যেন তার অন্তরে শান্তির প্রলে দিচ্ছে। একটি ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল, একটিও কথা হল না। তারপর সে ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে সহরে এল, তার চলা যেন হাল্কা হয়ে গেছে, শোকের বোঝা নেমে গেছে।

এরপর থেকে সে প্রতিদিন স্বামীর দর্শনে যেত। তিনি যেন সূ তার শোকের মেঘ দূর করলেন। এখন সে আর অভিভূত না হয়ে

হারানো প্রিয়জনদের স্মরণ করতে পারে। সে বাকী জীবন তিরুভন্ন-মালাই-এ কাটালে। তার বাবার দেওয়া কিছু অর্থে আর তার ভাইদের সাহায্যে সে সেখানে একটা ছোট বাড়ী নিলে। বহু দর্শনার্থী ভক্ত তার আতিথেয়তা লাভ করেছে। সে শ্রীভগবানের জন্য রোজ আহার্য তৈরী করত যার অর্থ সমস্ত আশ্রমের জন্য করা, কারণ তিনি সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে না দিলে কিছুই গ্রহণ করতেন না। যতদিন বয়সের ভারে ও শারীরিক অসুস্থতায় সে অপারক হয়নি, তত-দিন নিজেই খাদ্যদ্রব্য বয়ে পাহাড়ে উঠে যেত আর তাঁদের পরিবেশন করে না খাওয়ানো অবধি খেত না। আশ্রম বেড়ে ওঠার সঙ্গে তার আনা খাদ্যদ্রব্য আশ্রমের সাধারণ খাদ্যের অতি সামান্যতম অংশই হত কিন্তু কোনদিন যদি কোন কারণে তার আসার দেরি হত তাহলে পাছে সে ক্ষুণ্ণ হয় ভেবে শ্রীভগবান অপেক্ষা করে থাকতেন।

এত দুঃখ ও তার থেকে শান্তি লাভ করা সত্ত্বেও তার মধ্যে স্নেহের আকাঙ্ক্ষা তখনও প্রবল ছিল যার ফলে সে আবার নতন বন্ধন গড়লে। শ্রীভগবানের অনুমতি নিয়ে একটি মেয়েকে পালন করতে লাগল। সময়ে তার বিয়ে দিলে ও নাতী হওয়াতে আহ্লাদ করলে, তার নাম দিয়েছিল রমণ। একদিন অতর্কিতভাবে সে একটা তার পেলে যে, তার পালিতা মেয়েটি মারা গেছে। সেই পুরাতন শোক আবার উথলে উঠল। সে তারটা নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে পাহাড়ে উঠে এল। তিনিও অশ্রুভারাক্রান্ত নয়নে সেটা পড়লেন ও সান্ত্বনা দিলেন, তথাপি সে শোকে কাতর হয়ে সৎকার উপলক্ষ্যে চলে গেল। সে শিশু রমণকে নিয়ে ফিরে এল, আর তাকে শ্রীভগবানের কোলে তুলে দিলে। ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আবার তাঁর চোখে জল দেখা দিল। তাঁর করুণা এচাম্মালের মনে সান্ত্বনা এনে দিলে।

এচাম্মাল একজন উত্তর-ভারতীয় গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিল ও যোগ অভ্যাস করত। দৃষ্টি নাসাগ্রে স্থির করে জ্যোতি দর্শনজনিত ভাবসমাধিতে নিশ্চল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাত, তার দেহজ্ঞান

থাকত না। শ্রীভগবানকে এ সম্বন্ধে বলা হলেও, তিনি কিছু বলেন নি, শেষে সে নিজেই একবার বললে আর তাতে শ্রীভগবান তাকে নিরুৎসাহ করেন। "যে জ্যোতি তুমি বাইরে দেখ সেটা তোমার লক্ষ্য নয়। তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত আত্মোপলব্ধি, তার থেকে নীচে কিছু নয়।" ফলে সে এই সাধনা ত্যাগ করে আর একমাত্র শ্রীভগবানের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে।

একবার একজন উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীমহাশয় বিরূপাক্ষ গুহায় শ্রীভগবানের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল, তখন এচাম্মাল খাবার নিয়ে উপস্থিত হলে তাকে অত্যন্ত উত্তেজিত ও বিচলিত দেখা গেল। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বললে যে, যখন সে 'সদ্‌গুরুস্বামী গুহার' পাশ দিয়ে আসছিল তার মনে হল যে, সে শ্রীভগবান ও একজন অপরিচিত লোককে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখলে, সে এগিয়ে যেতে আরম্ভ করলে শুনতে পেল "আর ওপরে উঠে কি হবে, আমি এখানেই রয়েছি।" সে ফিরে দেখতে গিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। সে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি আশ্রমে চলে আসে।

শাস্ত্রীমহাশয় চকিত হয়ে বলে উঠল "সে কি স্বামী! আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন আর এই মহিলাকে দেখা দিলেন, আপনি আমার প্রতি এরূপ কৃপা দেখালেন না তো!" শ্রীভগবান বললেন, "সর্বদা আমার ওপর মনকে একাগ্র করার ফলেই এচাম্মালের এরূপ দর্শন হয়েছে।"

এচাম্মালই একমাত্র মহিলা নয় যে শ্রীভগবানের দর্শন পেত। অবশ্য আমার আর কোন ঘটনার কথা জানা নেই যেক্ষেত্রে এরূপ দর্শনে ভীতি অনুভূত হয়েছে। বেশ কয়েক বছর পরে একজন বয়স্ক পাশ্চাত্য দর্শনার্থী পাহাড়ের সানুদেশের আশ্রমে এসেছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে। গরমে ক্লান্ত, ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ও দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। তখন শ্রীভগবান তার কাছ দিয়ে চলে গেলেন ও আশ্রমের পথ

দেখিয়ে দিলেন। আশ্রমবাসীরাও তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। সে ফিরে এলে তাকে কি হয়েছিল জিজ্ঞাসা করায় সে বললে "আমি একটু পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম, আর একটু পরে পথ হারিয়ে ফেললাম। রৌদ্রের তেজ ও পরিশ্রম আমার পক্ষে বেশী হয়ে গিয়েছিল, আমার খুবই দুরবস্থা হয়। শ্রীভগবান সে পথে না এলে ও আশ্রমের পথ দেখিয়ে না দিলে জানি না কি করতাম!" আশ্রমবাসীরা সবাই বিস্মিত হয়ে গেল কারণ ভগবান হলঘর ছেড়ে কোথাও যাননি।

নেপালের কাঠমণ্ডু সহবেব ত্রিচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীরুদ্ররাজ পাণ্ডে তিরুভন্নমালাই ছেড়ে যাওয়ার আগে একজন বন্ধুব সঙ্গে সহরের প্রধান মন্দিরে পূজা দিতে গেল।

> "মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার খোলা হল আর আমার পথ-প্রদর্শক আমাদের প্রায়-অন্ধকার গর্ভগৃহে নিয়ে গেল। একটি ছোট তেলের প্রদীপ আমাদের সামনে জ্বলছিল। আমার তরুণ সাথীর কণ্ঠে 'অরুণাচল' শব্দটি বেজে উঠল। আমার সমস্ত মনোযোগ দেবমূর্তি দর্শন বা গর্ভগৃহের লিঙ্গের (যা শাশ্বত অব্যক্ত পবব্রহ্মের প্রতীক) প্রতি কেন্দ্রিত হল। কিন্তু কি আশ্চর্য, লিঙ্গের স্থানে আমি মহর্ষি ভগবান শ্রীবমণের মূর্তি দেখতে লাগলাম, সেই সস্মিত মুখ, সেই উজ্জ্বল নয়ন আমার দিকে চেয়ে আছে। আর আরও আশ্চর্যের বিষয়, আমি যে একটি মহর্ষি বা দু'টি মহর্ষি কিংবা তিনটি মহর্ষি দেখলাম তা নয়, শত শত সেই হাসিমাখা মুখ, সেই জ্যোতির্ময় চোখ। গর্ভগৃহের যেদিকে চোখ ফেরাই সেই দিকেই তাঁকে দেখি। আমার চোখ মহর্ষির পূর্ণ অবয়ব দেখল না—কেবল চিবুকের উপর থেকে হাস্যময় মুখমণ্ডল। আমি অবর্ণনীয় মহানন্দে আত্মহারা—সেই সময়ের অনুভূত আনন্দ ও শান্তি ভাষায় কি বর্ণনা হয়? চোখ থেকে আনন্দাশ্রু গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। ভগবান অরুণাচলেশ্বর দেখতে মন্দিরে

গিয়েছিলাম, জীবন্ত ভগবান আমায় কৃপা করে দর্শন দিলেন। সেই প্রাচীন মন্দিরে যে গভীর অনুভূতি হল তা আর কোনদিন ভুলব না।"*

শ্রীভগবান কিন্তু এরূপ দর্শনের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষাকে কখন প্রশ্রয় দিতেন না কিংবা এরূপ দর্শন সকল ভক্ত ও দর্শনার্থীর হত না।

এই সময়ের ভক্তদের মধ্যে শেষাদ্রিস্বামী তাঁর প্রতি সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাঁর প্রথম তিরুভন্নমালাই-এ আসার সময় সে তাঁকে ছেলেদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করত। সে এসময় বিরূপাক্ষ গুহার নীচে পাহাড়ে বাস করত আর প্রায়ই বিরূপাক্ষ গুহায় যেত। সেও বেশ উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করেছিল। তার যে ফোটো পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় যে তারও বেশ গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য ছিল। এ থেকে তার পাখীর মত ভাব ও নির্লিপ্ততা অনুমান করা যায়। প্রায়ই তার খোঁজ পাওয়া যেত না, সব সময় কথাও বলত না, আর বললেও সেগুলো প্রহেলিকাপূর্ণ হতো সে সতের বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে ও অলৌকিক শক্তি লাভের জন্য দীক্ষা ও জপ নেয়। কখন কখন সারারাত শ্মশানে বসে শক্তির সাধনা করত।

সে কেবল যে ভক্তদের রমণস্বামীর (যা বলে সে তাঁকে ডাকত) কাছে যেতে উৎসাহিত করত তা নয় পরন্তু কখন কখন নিজেকে রমণ-স্বামীর সঙ্গে একাত্ম মনে করত। সে অন্যের মনের কথা বুঝতে পারত। যদি শ্রীভগবান কাউকে কিছু বলে থাকেন, সে বলত "আমি তোমাকে এই, এই বলেছি, তুমি আবার প্রশ্ন করছ কেন? বা সেটা করছ না কেন?" সে প্রায় কাউকে দীক্ষা দিত না আর প্রার্থীভক্ত যদি রমণভক্ত হত তাহলে সর্বদা দীক্ষা দিতে অস্বীকার করে বলত যে, সে সর্বোত্তম উপদেশ মৌন দীক্ষা নিয়ে থাকুক।

এক বিরল অবসরে সে একজন ভক্তকে সক্রিয় সাধনা বা জ্ঞান-লাভের পথে উৎসাহিত করে। সুব্রমণীয় মুদালি নামে একজন তার

* 'সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ' দ্বিতীয় সংস্করণ ১৬৬ পৃষ্ঠা।

স্ত্রী ও মার সঙ্গে সংসার-ত্যাগী সাধুদেব ভোজনেব জন্য সমস্ত টাকা পয়সা খরচ করত। এচাম্মালের মত তারাও প্রতিদিন শ্রীভগবানের আশ্রমে খাবার নিয়ে যেত আর শেষাদ্রির দেখা পেলে তাকেও দিত। এ সব সত্ত্বেও সুব্রমণীয় একজন জমিদার ছিল ও মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিল, সম্পত্তি আরও বাড়াবার চেষ্টায় ছিল। শেষাদ্রিস্বামী এমন একজন ভক্তকে এরূপ আসক্ত দেখে তাকে এই সব ভাবনা চিন্তা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ঈশ্বরের সেবায় আত্মনিয়োগ করে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করতে বলে। সে বললে "দেখ, আমার ছোট ভাই-এর দশ হাজার টাকা আয়, আমার হাজার টাকা, তুমি অন্ততঃ একশ' টাকা আয় করাব চেষ্টা কর না কেন ?" 'ছোট ভাই' রমণস্বামী আব 'আয়' আধ্যাত্মিক সম্পদ। যখন সুব্রমণীয তবুও তা স্বীকাব করল না, শেষাদ্রি পীড়াপীড়ি করতে লাগল আব তাকে সাবধান করলে যে, সে ব্রহ্মহত্যা-রূপ পাপ করছে। শ্রীভগবানে বেশী বিশ্বাস থাকায় সে তাঁকে জিজ্ঞাসা কবলে যে, একথা সত্য কিনা আব তিনি বুঝিয়ে দিলেন "হ্যাঁ, নিজেকে ব্রহ্ম বলে না জানার জন্য তোমাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলা যায়।"

একবার শেষাদ্রি আম্রগুহায় শ্রীভগবানের মনের কথা জানার জন্য তাঁর দিকে চেয়ে বসেছিল। শ্রীভগবানের মন আত্মার শান্তিতে ডুবে থাকায় চিন্তার কোন তরঙ্গ ছিল না সুতরাং সে আশ্চর্য হয়ে বললে "ইনি যে কি ভাবছেন বোঝা যায় না।"

শ্রীভগবান নীরব রইলেন। খানিক বাদে শেষাদ্রি বললে "কেউ যদি ভগবান অরুণাচলেশ্বরেব উপাসনা করে তাহলে মুক্তি পায়।"

তখন শ্রীভগবান বললেন "কে-ই বা উপাস্য আর কে-ই বা উপাসনা করে ?"

শেষাদ্রিস্বামী জোরে হেসে উঠল "সেটাই তো ঠিক বোঝা যায় না।"

তখন শ্রীভগবান আত্মতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন যে আত্মা সমস্তরূপে ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত, অপরিবর্তনীয়, একমাত্র সৎ ও উপাসকের আত্মারূপে থাকে। শেষাদ্রি ধৈর্য ধরে শুনলে তারপর উঠে

দাঁড়িয়ে বললে "আমি কিছু বলতে পারি না। এসব আমার কাছে অবোধ্য। আমি পূজা করি।"

এই বলে সে শিখরের দিকে ফিবে বার বার পাহাড়ের চূড়াকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে গেল।

শেষাদ্রিস্বামী কখন কখন আবাব অদ্বৈত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কথা বলত, সবই সেই আত্মাব প্রকাশ বলত—কিন্তু যে ভাবেই সে বলুক না কেন সেটা শুষ্ক ও ব্যঙ্গ-পরিহাসপূর্ণ হত। একদিন জনৈক নারায়ণস্বামী তাকে একটি মোষের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা কবলে "স্বামী কি দেখছেন ?"

"আমি এটাকে দেখছি।"

সে আগ্রহ সহকাবে বললে, "তবে কি স্বামী মোষ দেখছেন ?"

তখন মোষেব দিকে আঙ্গুল দিযে দেখিয়ে শেষাদ্রিস্বামী তাকে বললে, "বলত এটা কি ?"

সে ভাল মানুষের মত উত্তর দিলে "এটা একটা মোষ।" তাতে শেষাদ্রি চেঁচিয়ে উঠল "কি, এটা মোষ ? মোষ ? তুমি একটা মোষ!" একে ব্রহ্ম বল!" এই বলে পিছন ফিরে চলে গেল।

শেষাদ্রিস্বামী ১৯২৯ সালে মাবা যায়। প্রচলিত রীতি অনুসারে সাধুদের দেহ দাহ করা হয় না, তাকেও সমাধি দেওয়া হল। শ্রীভগবান নীরবে দাঁড়িয়ে সব দেখলেন। এখনও শেষাদ্রিস্বামীকে তিরুভন্নমালাই-এর লোকেরা শ্রদ্ধা করে আর তার মৃত্যু তিথিতে তাব ছবি নিয়ে সহবে শোভাযাত্রা হয়।

শ্রীভগবানের পাহাড়ে বাসকালের প্রথম দিকে ধীরে ধীরে তাঁর বাহ্য ক্রিয়াশীলতা ফিরে আসতে লাগল। তিনি চলা ফেরা, পাহাড় দেখে বেড়ানো, বই পড়া ও তার ব্যাখ্যা লেখা শুরু করলেন। পদ্মনাভ-স্বামী নামে একজনের পাহাড়ে আশ্রম ছিল। তার জটা থাকার জন্য তাকে জটাই স্বামী বলা হত। তার কিছু সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ ও আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ছিল। শ্রীভগবান তার কাছে যেতেন, বইগুলো নেড়ে চেড়ে

দেখতেন আর তৎক্ষণাৎ তাদের বিষয়বস্তু তাঁর আয়ত্ত হয়ে যেত, এমনই কণ্ঠস্থ হয়ে যেত যে তিনি সেগুলো মুখস্থ বলতে পারতেন এমন কি অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যাও বলে দিতে পারতেন। কোন সিদ্ধান্তের বিষয়ে তর্ক উঠলে পদ্মনাভস্বামী প্রায়ই প্রমাণের জন্য শ্রীভগবানের কাছে আবেদন করত।

পুরাণে বলা হয়েছে যে অরুণাচল পাহাড়ের চূড়ার কাছে উত্তর দিকের ঢালে অরুণগিরি যোগী নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ দূরতিগম্য স্থানে একটি বটবৃক্ষের তলায় বসে মৌন শিক্ষা দেন। তিরুভন্নমালাই-এর প্রধান মন্দিরে তাঁর নামে একটি মণ্ডপও প্রতিষ্ঠিত আছে। কাহিনীর তাৎপর্য এই যে অরুণাচলের কৃপা মৌন-দীক্ষা দিয়ে সাধককে আত্মান্বেষণের দ্বারা মুক্তির পথে নিয়ে যায়। সেটি চির ভাস্বর হলেও উপস্থিত আধ্যাত্মিক অজ্ঞতার যুগে লোকের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও প্রতীকাত্মক কাহিনীটি বাস্তবিক অর্থেও খুব অসত্য নয়। ১৯০৬ সালের কাছাকাছি একদিন শ্রীভগবান পাহাড়ের উত্তর দিকে বেড়াচ্ছিলেন। তিনি একটা শুষ্ক ঝর্ণার ওপর একটা বিরাট বড় বটপাতা দেখলেন, পাতাটা এত বড় যে তাতে অনায়াসে ভাত খাওয়া যায়। পাতাটা জলের ধারার সঙ্গে নেমে এসেছে ভেবে যে গাছ থেকে এসেছে সেটা দেখার ইচ্ছায় সেই ঝর্ণা ধরে তিনি ওপরে উঠতে লাগলেন। খুব খাড়া ও এবড়ো খেবড়ো পথে খানিকটা ওঠার পর তিনি একটা জায়গা থেকে একটা বিশাল বড় পাথরের চাঁই-এর ওপর যেটা খুঁজছিলেন সেই বটগাছ দেখলেন ; গাছটাও বিরাট ও ঘন সবুজ। তাঁর খুবই আশ্চর্য লাগল যে এতবড় একটা গাছ কি করে নেড়া পাথরের ওপর হয়েছে ! আরও উঠে যেতে লাগলেন, কাছে এগিয়ে যেতে গিয়ে তাঁর উরু একটা ঝোপে লাগল ; সেখানে একটা ভীমরুলের চাক ছিল। ভীমরুল-গুলো নাড়া খেয়ে উড়ে এসে প্রতিশোধ নেবার জন্য যেখানটা ঝোপে লেগেছিল সেই উরুতে কামড়াল। তাদের কামড়ানো শেষ না হওয়া অবধি শ্রীভগবান চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ও তাদের বাসা ভেঙ্গে

দেওয়ার জন্য নীরবে শাস্তিটা নিলেন, আর এগিয়ে না যাওয়ার নির্দেশ মনে করে গুহায় ফিরে এলেন। ভক্তেরা তাঁর ফিরে না আসার জন্য চিন্তিত হয়ে উঠেছিল ; তাঁর পায়ের স্ফীতি ও প্রদাহ দেখে ভীত হল। এরপর তিনি বটবৃক্ষের অবস্থান নির্দেশ করেছেন কিন্তু নিজে কখন দেখতে যান নি। তাঁর ভক্তরা সেখানে যেতে চাইলে নিরৎসাহ করতেন।

একবার একদল ভক্ত, যাদের মধ্যে টমসন নামে একজন ইংরাজও ছিল সেই বটগাছের কাছে যাওয়ার মনস্থ করলে। কিছুক্ষণ মরিয়া হয়ে পাহাড়ে ওঠার পর তারা এমন এক অবস্থায় পড়ল যে না পারে উঠতে না পারে নামতে। তারা শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগল ও কোন বকমে নিরাপদে আশ্রমে ফিরে এল। অন্যেরাও চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিফল হয়।

শ্রীভগবান কোন কাজ অপছন্দ করলেও খুব কম ক্ষেত্রেই সরাসরি নিষেধ করতেন। তিনি মনে করতেন উচিত বা অনুচিত নিজের ভিতর থেকেই আসবে। বর্তমান ক্ষেত্রে ভক্তদের চেষ্টা করাটা স্পষ্টতঃই উচিত হয়নি কারণ তাদের গুরু নিজেই চেষ্টা করেন নি।

একটা সময় ছিল যখন শ্রীভগবান প্রায়ই পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন, চূড়ায় উঠতেন আর প্রদক্ষিণও করতেন। তখন একদিন তিনি একলা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পথে একজন বৃদ্ধা কাঠকুড়োনীকে দেখলেন। তাকে দেখতে সাধারণ নিম্নশ্রেণীর কিন্তু সে নির্ভয়ে তরুণস্বামীকে তার ভাষায় সম্বোধন করে অতি সাধারণ ভাষায় গালাগালি দিয়ে বললে, "চুলোয় যা! এরকম করে রোদে ঘুরিস কেন? চুপ করে বসে থাকতে পারিস না?"

শ্রীভগবান যখন একথা ভক্তদের গল্প করলেন তখন বলেছিলেন, "এ নিশ্চয় সাধারণ মহিলা নয়! কে জানে সে কে?" নিশ্চয় কোন নীচুজাতের মেয়েলোক স্বামীকে একথা বলতে সাহস করবে না। ভক্তরা ধরে নিলে যে, সে নিশ্চয় অরুণাচলের আত্মা অরুণগিরি সিদ্ধ। সেই থেকে শ্রীভগবান পাহাড়ে ঘোরা ছেড়ে দিলেন।

আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে তিরুভন্নমালাই-এ আসার প্রথম অবস্থায় তিনি ভাবাবেশে চলে ফিরে বেড়াতেন। এটা ১৯১২ সালের আগে অবধি একেবারে চলে যায়নি। তখন তাঁর একটা শেষ ও পূর্ণ মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হল। তিনি বিরূপাক্ষ গুহা থেকে একদিন সকালে পালানীস্বামী, বাসুদেব শাস্ত্রী ও অন্যান্যের সঙ্গে পাচিয়াম্মান কোয়েলে (দুর্গা মন্দির) গেলেন। সেখানে তেল মেখে স্নান করলেন। ফিরে আসার সময়ে যখন কচ্ছপ শিলার কাছে এসেছেন তখন হঠাৎ একটা শারীরিক দুর্বলতা বোধ হল। তিনি সেটা পবে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

"আমার সামনের সব দৃশ্য লুপ্ত হয়ে গেল, মনে হল একটা উজ্জ্বল সাদা পর্দা কেউ যেন টেনে সব আড়াল করে দিলে। আমি ধীরে ধীবে সব মুছে যাওয়া স্পষ্ট দেখতে পেলাম। একটা অবস্থা ছিল যখন খানিকটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি আর বাকীটা ধীরে ধীরে নেমে আসা পর্দায় ঢাকা পড়ে গেছে। এটা ঠিক যেন ঘনবীক্ষণ (স্টিরিয়োস্কোপ) যন্ত্রেব সামনে একটা আড়াল টেনে দেওয়ার মত। এটা অনুভব করে পাছে পড়ে যাই ভেবে, আমি থেমে গেলাম, এটা পবিষ্কাব হয়ে গেলে চলতে শুরু করলাম। যখন দ্বিতীয়বার অন্ধকাব ও মূর্চ্ছার ভাব এল আমি সেটা চলে না যাওয়া অবধি একটা পাথবে হেলান দিলাম। তৃতীয়বার আসতে মনে হল বসে পড়াই ভাল, এই ভেবে শিলাটাব কাছে বসে পড়লাম। তখন সাদা পর্দা আমার দৃষ্টিকে একেবাবে ঢেকে দিলে, আমার মাথা ঘুরতে লাগল আর রক্ত চলাচল ও শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। গায়ের রঙ কালচে নীল হয়ে গেল। একেবারে মৃত শরীবের বর্ণ ও ক্রমশঃ তা গাঢ় হতে থাকল। বাসুদেব শাস্ত্রী আমি মরে গেছি ভেবে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে কাঁদতে ও শোক করতে আরম্ভ করে দিলে।

"তার জড়িয়ে ধরা, তার কাঁপুনি, তার কান্না ও কথাগুলোর মানে আমি সবই বুঝতে পারছি। আমি আমার শরীরের বিবর্ণতা দেখলাম আর রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়া ও শ্বাস থেমে যাওয়াও বুঝলাম, হাত পা যে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তাও অনুভব করলাম। সে অবস্থায়ও আমার অভ্যস্ত চৈতন্য সত্তার বোধ ঠিকই রইল। আমার বিন্দুমাত্র ভয় বা শরীরটার অবস্থার জন্য দুঃখ বোধ হল না। পাথরের পাশে অভ্যাস মত আসনে বসে পড়লাম, চোখ বন্ধ করলাম, কিন্তু পাথরে হেলান দেইনি। শরীরের রক্ত চলাচল ও শ্বাসক্রিয়া ছাড়াই আসন রইল। এই অবস্থা বড় জোর দশ কি পনের মিনিট ছিল। তারপর হঠাৎ একটা বিদ্যুতের শিহরণ সমস্ত শরীরে খেলে গেল, তীব্র বেগে রক্ত চলাচল শুরু হল, শ্বাসক্রিয়াও আরম্ভ হল, আর শরীরের সমস্ত রোমকূপ দিয়ে কুল কুল করে ঘাম হতে লাগল। শরীরে আবার জীবনের রঙ ফিরে এল। আমি চোখ খুলে দাঁড়িয়ে উঠলাম ও বললাম 'চল, যাওয়া যাক।' আর কোন অঘটন ব্যতিরেকেই বিরূপাক্ষ গুহায় পৌঁছে গেলাম। এই একবারই আমার রক্ত চলাচল ও শ্বাস এক সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়।"

পরে যে ভুল বিবরণ প্রচার হতে লাগল সেটা দূর করার জন্য বলেছিলেন—

"আমি কোন প্রয়োজনে ইচ্ছা করে এই অবস্থা নিয়ে আসি নি কিংবা মৃত্যুর পর শরীর কিরূপ দেখতে হয় তাও দেখতে চাইনি কিংবা একথাও বলিনি যে অন্যদের না বলে শরীর ত্যাগ করব না। এরকম আমার মাঝে মাঝে হত, কেবল এবার এটা সাংঘাতিক ভাবে হয়।"

এই অনুভবের সম্বন্ধে এটাই সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্য যে শ্রীভগবানের আধ্যাত্মিক জাগরণের সময়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল, যে

মৃত্যুতে একটা ধারাবাহিক চৈতন্য সত্তা অবিচ্ছেদে থাকে, এটা তার
পুনরাবৃত্তি। অধিকন্তু এ ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তনও দেখা গিয়েছিল
এর থেকে তামিল সাহিত্যের তায়ুমনাবরের একটি পদ মনে পড়ে যা
যা শ্রীভগবান প্রায়ই উদ্ধৃত করতেন।

আদি মধ্য অন্তহীন ব্যাপক
সত্তায় নিমজ্জিত যবে,
অদ্বৈতানন্দের অনুভূতি তবে॥

হতে পারে, এটাই শ্রীভগবানের বাহ্যিক স্বাভাবিক জীবনে ফি
আসার চরম পূর্ণতা সূচিত করল। তিনি তাঁর জীবন যাত্রায় কত
মানবীয় ও স্বাভাবিক ছিলেন এ সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেওয়াও কঠি
তবু এটা বলা দরকার, কারণ তাঁর আগেকার কঠোর তপস্যার ভ
থেকে ধারণা হতে পারে যে, তিনি রুক্ষ ও কঠোর ছিলেন। বরং
বিপরীত, তাঁর আচার ব্যবহার স্বাভাবিক ও সকল প্রকার আড়ষ্ট
শূন্য ছিল। যে কোন নবাগত তার কাছে বেশ সহজ অনুভব করত
তাঁর কথাবার্তা প্রায়ই পরিহাসপূর্ণ ছিল, তাঁর হাস্য এতই মনোমুগ্ধক
ও বালক-সুলভ সরল ছিল যে, যারা ভাষা বুঝত না তারাও তা
যোগ দিয়ে আনন্দ পেত। তাঁর সব কিছু ও আশ্রমের সব কিছু
পরিচ্ছন্ন। যখন নিয়মিত আশ্রম স্থাপন হল, সেখানের জীবন এ
সুনিয়ন্ত্রিত ও সময় ধরে চলত ঠিক যেন একটা কার্যালয়ে কাজ হচ্ছে
ঘড়িগুলো কাঁটায় কাঁটায় মেলান, দিনপঞ্জী ঠিক ঠিক তারিখ দেখাচ্ছে
কোন কিছুর অপচয় হয় না। আমি একবার একজন সেবককে এক
কাটা কাগজ থাকা সত্ত্বেও একটা নূতন কাগজ নিয়ে বই-এর মল
দেওয়াতে বকুনি খেতে শুনেছি। আর খাবার সম্বন্ধেও তাই, তাঁ
খাওয়ার পাতায় একটিও ভাতের দানা পড়ে থাকত না। শাক-সব
খোসা ফেলে না দিয়ে গোরুবাছুরের জন্য রাখা হত।

তাঁর একটা স্বাভাবিক সরলতা ও নম্রতা ছিল। যে কটা বি
তাঁর উষ্মা প্রকাশ পেত তার মধ্যে একটা হল কোন মুখরোচক খ

অন্যদের থেকে তাঁকে বেশী পরিবেশন করা। তিনি হলঘরে ঢুকলে অন্যদের উঠে দাঁড়ানো পছন্দ করতেন না, তাদের নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকার ইঙ্গিত করতেন। একদিন বিকালে তিনি পাহাড় থেকে আশ্রমে ফিরছেন; দীর্ঘকায়, সোনার বরণ, ইতিমধ্যেই শুভ্রকেশ, দুর্বল শরীর, পায়ের বাতের জন্য একটু ঝুঁকে লাঠিতে ভর দিয়ে নামছেন, সঙ্গে একজন শ্যামবর্ণ খর্বকায় সেবক। একটি ভক্ত পিছনে আসছিল, সুতরাং তিনি সরে পাশ দিয়ে বললেন, "তুমি তরুণ, তাড়াতাড়ি হাঁটবে তুমি আগে যাও।" সামান্য সৌজন্য, কিন্তু ভক্তের কাছে গুরুর একি অপূর্ব ব্যবহার!

এরকম ঘটনা অজস্র, ব'লে শেষ করা যায় না। উপযুক্ত স্থানে কতকগুলো আরও বিশদভাবে বলা হবে। কিন্তু যেহেতু এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার কথা বলা হল সুতরাং এটাও বলা আবশ্যক যে, সেই জীবন পদ্ধতি কত স্বাভাবিক, কত মানবীয় আর কত উদার ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

অপ্রতিরোধ

যে-কোন সংস্থাপিত ধর্মে অপ্রতিরোধ অবাস্তব মনে হয় কারণ প্রত্যেক দেশে বিচারালয় ও আরক্ষাদল আর আধুনিক পরিস্থিতিতে কিছু না কিছু প্রতিরক্ষা বাহিনী রাখা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। যা হোক ধর্মের দায়িত্বের দু'টি বিভাগ, একটি তার নিম্নতম দায়িত্ব—যারা সেই ধর্মানুসরণ করে তাদের প্রতি ও যে দেশে সেটি স্থাপিত আছে তার প্রতি, আর দ্বিতীয়টি তার পূর্ণতম দায়িত্ব—যারা তার নির্ধারিত পথ অনুসরণ ক'রে, জাগতিক সর্বস্ব তুচ্ছ ক'রে সেই সার্বিক আনন্দের খোঁজে জীবন সমর্পণ করে তাদের প্রতি। কেবল এই দ্বিতীয় ও উচ্চতম অর্থে শ্রীভগবান একটি পথ প্রদর্শন করেছেন আর সেজন্য তাঁর নিজের বেলায় ও তাঁর অনুগামীদের বলতে পারতেন, "অন্যায়ের প্রতিরোধ করো না।" এটা সমগ্র সমাজের জন্য কোন সামাজিক অনুশাসন নয়, পরন্তু এটা তাঁর পথ অনুসরণকারীদের পক্ষে একটা জীবন পদ্ধতির সঙ্কেত। এটা কেবল তাদেরই করা সম্ভব যারা ভগবৎ ইচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করেছে ও সাংসারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্ভাগ্য মনে হলেও যা তাদের সামনে আসে তাকে তারা উচিত ও আবশ্যক বলে স্বীকার করতে পারে। শ্রীভগবান একবার একজন ভক্তকে বলেছিলেন "তুমি তোমার সৌভাগ্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, কিন্তু যেটা দুর্ভাগ্য বলে মনে হয় তার জন্য ধন্যবাদ দাও না আর এইখানেই তোমার ভুল হয়।"

একটা আপত্তি হতে পারে যে, এই সরল বিশ্বাস শ্রীভগবানের উপদিষ্ট অদ্বৈত সিদ্ধান্ত থেকে একেবারে আলাদা, কিন্তু কেবল মনের স্তরেই এরূপ বিরোধ হয়। তিনি বলতেন "ঈশ্বর, গুরু বা আত্মার নিকট সমর্পণই দরকার। পরের অধ্যায়ে দেখান হবে যে, এই তিন প্রকার সমর্পণ পদ্ধতি বস্তুতঃ পৃথক নয়। এখানে এইটুকু বললেই

যথেষ্ট হবে যে, যে ব্যক্তি এই ধারণা ধরে থাকে যে একই আত্মা আছে আর সব বাহ্য গতিবিধি একটা স্বপ্নের মত বা চলচ্চিত্রের মত সেই আত্মার আধারের ওপর ঘটে যাচ্ছে, সে একজন তটস্থ দর্শকের মত সব দেখে যেতে পারে। অন্যায় ও উৎপীড়নের যে ক'টা ঘটনা ঘটেছিল সে সময়ে শ্রীভগবানের এই মানসিকতা ছিল।

গুরুমূর্তমের চারিধারে তেঁতুলগাছ ছিল, তিনি যখন সেখানে ছিলেন তখন কখন কখন কোন একটার তলায় বসতেন। একদিন যখন সেখানে আর কেউ ছিল না, একদল চোব পাকা তেঁতুল চুরি করতে এল। একজন তরুণস্বামীকে একটা গাছের নীচে নীরবে বসে থাকতে দেখে বললে "কিছু অম্লরস এনে এর চোখে দিয়ে দেখা যাক ; কথা বলে কি না।" এটা এমন একটা জিনিস যাতে তীব্র যন্ত্রণা তো হবেই এমনকি লোকে অন্ধও হয়ে যেতে পারে, তবু তিনি তাঁর চোখ বা তেঁতুল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। সেই দলের আর একজন বললে "যাকগে, ওর জন্য ভেবো না! ও কি করবে? এস আমাদের কাজ করি।"

পাহাড়ে থাকার প্রথমদিকে মাঝে মাঝে বাধা ও বিরোধ দেখা দিত। সাধুদের বিচিত্র জগতে, যেখানে কিছু ভণ্ডও আছে এবং কিছু লোক খানিকটা সাধনা করে নিম্ন বাসনা ক্ষয় না করেই কিছু যোগ-শক্তি লাভ করেছে সেখানে এমন একজন অল্পবয়সীর মধ্যে ঐশ্বরিক ভাবের প্রকাশ, ভক্তদের প্রশংসা, বেশীর ভাগ সাধুরা মেনে নিয়ে তাঁর কৃপা প্রার্থী হলেও, কয়েকজনের মনে স্বাভাবিকভাবেই বিদ্বেষ জাগিয়ে ছিল।

পাহাড়ের গুহায় একজন বয়স্ক সাধু থাকত ; যতদিন শ্রীভগবান গুরুমূর্তমে ছিলেন ততদিন সে তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা ভক্তি করত। বিরূপাক্ষগুহায় আসার পর শ্রীভগবান মাঝে মাঝে তাকে দেখতে যেতেন ও তার কাছে নীরবে বসে থাকতেন। সে বেশ কঠোর জীবন যাপন করত, তার কিছু ভক্তও ছিল, তা সত্ত্বেও তার মনুষ্যোচিত কামনা

বাসনার ওপর আধিপত্য হয়নি। সে তরুণস্বামীর ভক্তসংখ্যা বেড়ে যাওয়া ও তার নিজের কমে যাওয়া সহ্য করতে পারলে না। শ্রীভগবানকে হত্যা করা বা তাঁকে ভয় দেখিয়ে পাহাড় ত্যাগ করতে বাধ্য করার ইচ্ছায় সে এক সন্ধ্যাবেলা বিরূপাক্ষ গুহার ওপর এক জায়গায় লুকিয়ে থেকে পাথর ও নুড়ি গড়িয়ে দিতে লাগল, যাতে সেগুলো নীচে তাঁর গায় পড়ে। যদিও একটা পাথরের চাংড়া তাঁর খুব কাছে গড়িয়ে এল তা সত্ত্বেও শ্রীভগবান অবিচলিত ভাবে বসে রইলেন। সর্বদা অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় তিনি বেশ জানতেন যে ঘটনাটা কি হচ্ছে এবং একবার চুপিচুপি তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠে সেই বৃদ্ধকে হাতে-নাতে ধরেও ফেললেন। তখন বৃদ্ধটি এটা একটা পরিহাস বলে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।

তার চেষ্টা ব্যর্থ হলে সেই সাধু, যে সাধুর বেশে লোকেদের ধোঁকা দিয়ে বেড়াত এরূপ বালানন্দ নামে একজন সুদর্শন, লেখাপড়া জানা সাধু-বেশী ভণ্ডের সাহায্য নিলে। সে লোকটা শ্রীভগবানকে উপলক্ষ্য করে অর্থ ও খ্যাতি লাভের ফন্দি করলে। সে ঠিকই বুঝেছিল যে তরুণস্বামী তাঁর সাধুবৃত্তির জন্য প্রতিরোধ করবেন না সুতরাং সে নিজেকে তাঁর গুরু বলে প্রচার শুরু করলে। দর্শনার্থীদের বলত "এই তরুণস্বামী আমার শিষ্য" কিংবা "হ্যাঁ, বাচ্চাকে কিছু মিষ্টি দিয়ে যাও" আর সে শ্রীভগবানকে বলত "এই যে বেঙ্কটরমণ, বাপু, মিষ্টিটা নিয়ে নাও তো।" সে তার তথাকথিত শিষ্যের জন্য বাজারে গিয়ে জিনিসপত্র কেনার ভান করত। তার এতদূর ধৃষ্টতা ছিল যে, সে শ্রীভগবানকে একলা পেলে স্পষ্ট বলত "আমি বলব যে আমি তোমার গুরু আর এই বলে দর্শকদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেব। তোমার এতে কোন ক্ষতি নেই, তুমি আপত্তি করবে না।"

এই লোকটির অহংকার ও আস্পর্ধার আর অন্ত ছিল না। একদিন তার এতই বাড়াবাড়ি হল যে, সে গুহার বারাণ্ডায় শৌচক্রিয়া করলে। পরের দিন সকালে সে তার বাড়তি কাপড়-চোপড় যার মধ্যে কিছু জরি

দেওয়া রেশমী কাপড় ছিল, গুহায় রেখে চলে গেল। শ্রীভগবান কিছু বললেন না। তিনি সকালে পালানীস্বামীর সঙ্গে দূরে একটি পবিত্র সরোবরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যাত্রার আগে পালানীস্বামী বারাণ্ডা ধুয়ে সেই সাধুর কাপড়-চোপড় বাইরে ফেলে গুহায় তালা বন্ধ করলে।

বালানন্দ ফিরে এসে রেগে আগুন। সে পালানীস্বামীকে তার কাপড়ে হাত দেওয়ার জন্য যাচ্ছেতাই করলে আর শ্রীভগবানকে তৎক্ষণাৎ তাকে দূর করে দিতে হুকুম করলে। এঁরা দু'জন কোন উত্তর দিলেন না বা গ্রাহ্য করলেন না। রেগে গিয়ে বালানন্দ শ্রীভগবানের গায়ে থু-থু দিলে। তা সত্ত্বেও শ্রীভগবান নিরুদ্বেগে বসে রইলেন। তাঁর সঙ্গে যে ভক্তরা ছিল তারাও কোন প্রতিরোধ না করে শান্তভাবে বসে রইল। যা হোক একজন ভক্ত নীচে একটা গুহায় থাকত, সে শুনতে পেয়ে দৌড়ে উঠে এল আর চীৎকার করতে লাগল; "কি! এতবড় আস্পর্ধা, আমাদের স্বামীর গায়ে থুথু দেওয়া!" বালানন্দকে তার হাতে মার খাওয়া থেকে অতি কষ্টে বাঁচানো হল। বালানন্দ বুঝলে যে নেহাতই বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, এখন তিরুভন্নমালাই ত্যাগ করাই ভাল। এ পাহাড়টা থাকার উপযুক্ত নয় বলে সে খুব দর্পের সঙ্গে চলে গেল। রেল স্টেশানে গিয়ে বিনা টিকিটে একটা দ্বিতীয় শ্রেণী কামরায় উঠল। একটি অল্পবয়সী দম্পতি সেই কামরায় ছিল। সে সেই ছেলেটিকে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে ও তাকে হুকুম করতে শুরু করলে, যখন ছেলেটি গ্রাহ্য করলে না তখন রেগে গিয়ে বললে "কি! আমার কথা শুনছ না? এই মেয়েটির মোহে ভুলে গিয়ে তুমি আমায় অসম্মান করছ।" ছেলেটিও রেগে গিয়ে চটি খুলে তাকে এতদিনের পাওনা উত্তম-মধ্যম দিলে।

কয়েক মাস বাদে বালানন্দ আবার ফিরে এল আর উৎপাত শুরু করলে। একবার সে জোর করে শ্রীভগবানের চোখের দিকে চেয়ে বসে থেকে তাঁকে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়ে দেওয়ার ভান করলে

কিন্তু কার্যতঃ সে নিজেই ঘুমিয়ে পড়ল আর শ্রীভগবান অন্য ভক্তদের নিয়ে উঠে চলে গেলেন। এরপব থেকে লোকেদের তার ওপর এমন একটা ধারণা হল যে, সে সেখান থেকে চলে যাওয়াই মঙ্গল মনে করলে।

আরও একজন 'সাধু' নিজেকে তরুণস্বামীব গুরু বলে খ্যাতি লাভ কবতে চেষ্টা কবেছিল। সে কালহস্তী থেকে ফিরে এসে বললে "আমি এতদূব থেকে কেবল তুমি কেমন উন্নতি করছ তাই দেখতে এলাম। তোমায় আমি দত্তাত্রেয় মন্ত্রে দীক্ষা দেব।"

শ্রীভগবান নড়লেন না বা কিছু বললেন না, সুতরাং সে বলে চলল "ঈশ্বর আমায় স্বপ্নে দর্শন দিযে তোমায় এই উপদেশ দিতে বলেছেন।"

"বেশ তো" শ্রীভগবান পরিহাস কবে বললেন "তিনি আমায় স্বপ্নে দর্শন দিয়ে উপদেশ নিতে বলুন তাহলে আমিও নেবো।"

"না, উপদেশটা খুব ছোট, কেবল ক'টা অক্ষর, তুমি এখনই শুরু করতে পারো।"

"তোমার উপদেশে আমার কি লাভ হবে, যদি দীক্ষা না নি, জপ না করি? উপযুক্ত শিষ্য খোঁজ, আমার দ্বারা হবে না।"

কিছুদিন বাদে, যখন একদিন সেই সাধু ধ্যানে বসেছে তখন তার শ্রীভগবানকে দর্শন হল আর তিনি যেন তাকে বললেন "ঠকে যেও না!" নিশ্চয় শ্রীভগবানের কোন সিদ্ধাই আছে যা তিনি তার ওপর প্রয়োগ করেছেন ভেবে, ভয় পেয়ে, সে তাড়াতাড়ি বিরূপাক্ষ গুহায় দৌড়ে এল আর সেই প্রয়োগ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করলে। শ্রীভগবান তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, তিনি কোন শক্তি প্রয়োগ করেন নি আর সেও দেখলে যে তাঁর মধ্যে কোন ক্রোধ বা বিরক্তি নেই।

এই রকম উৎপাত একবার একদল মদ্যপ সাধুও করেছিল। একদিন বিরূপাক্ষগুহায় এসে তারা খুব গম্ভীরচালে বললে আমরা পোড়িকৈ পাহাড় থেকে আসছি, সেখানে প্রাচীন অগস্ত্য ঋষি সহস্রবর্ষ ধরে এখনও

তপস্যা করছেন। তিনি আমাদের আদেশ করেছেন যে তোমায় প্রথমে শ্রীরঙ্গমের সিদ্ধসঙ্ঘে নিয়ে যেতে হবে, তারপর পোড়িকৈ পাহাড়ে নিয়ে যেতে হবে। যে ধাতু তোমার সিদ্ধির বাধা হচ্ছে তাকে তোমার শরীর থেকে নিষ্কাশন করে দীক্ষা দেওয়া হবে।”

শ্রীভগবান যথারীতি এসব ক্ষেত্রে অভ্যাসমত কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু এবার তাঁর এক ভক্ত পেরুমলস্বামী ধূর্তদেরও ওপর দিয়ে গেল। সে বললে “আমরা আগেই তোমাদের আসবার খবর পেয়েছি আর আমাদের ওপর আদেশ হয়েছে যে তোমাদের শরীরগুলো কড়াতে চাপিয়ে তার তলায় বেশ করে আগুন জ্বালিয়ে দিতে হবে।” আর অন্য ভক্তদের হেঁকে বললে “যাও গর্তটা কর, এগুলোর জন্য আগুন জ্বালাতে হবে।” আগন্তুকেরা সরে পড়ল।

১৯২৪ সালে যখন শ্রীভগবান পাহাড়ের তলায় বর্তমান আশ্রমে বাস করতে শুরু করেছেন তখন একদল চোর মায়ের সমাধি চালায় সিঁধ দিয়ে কিছু জিনিস নিয়ে চলে গেল। কয়েক সপ্তাহ বাদে আবার তিনটি চোর এসে আশ্রমে চুরি করল।

২৬শে জুন প্রায় রাত সাড়ে এগারোটা। অন্ধকার রাত্রি। শ্রীভগবান তখন বিশ্রামের জন্য মায়ের সমাধির সামনের ঘরে বেদীতে শুয়ে পড়েছেন। জানালার কাছে মেঝেতে চারজন ভক্ত ঘুমাচ্ছে। তাদের মধ্যে দু’জন সেবক কুঞ্জস্বামী ও মস্তান বাইরে কাউকে বলতে শুনলে “ছ’জন লোক ভিতরে শুয়ে রয়েছে।”

কুঞ্জ চেঁচিয়ে উঠল, “কে ওখানে?”

চোরেরা জানালার গরাদ ভেঙ্গে উত্তর দিলে, খুব সম্ভব তারা ভিতরের লোকেদের ভয় দেখাতে চেয়েছিল। কুঞ্জ ও মস্তান উঠে পড়ল আর শ্রীভগবান যেখানে ছিলেন সেই বেদীর কাছে গেল। তারপর চোরেরা সেই দিকের একটা জানালা ভাঙ্গলে কিন্তু শ্রীভগবান স্থির হয়ে বসে রইলেন। চোরেরা দক্ষিণদিকে ছিল তাই কুঞ্জস্বামী উত্তর দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে অন্য কুটির থেকে সাহায্যের

জন্য রামকৃষ্ণস্বামীকে ডেকে আনলে। কুঞ্জস্বামী যখন দরজা খোলে আশ্রমের দু'টি কুকুর জ্যাক ও কারুপন্ন বাইরে বেরিয়ে যায়। চোরেরা তাদের মারলে, জ্যাক পালিয়ে গেল আর কারুপন্ন ঘরে ঢুকে পড়ল।

শ্রীভগবান চোরেদের বললেন যে তাদেব নেওয়াব মত বিশেষ কিছুই নেই, তাবা স্বচ্ছন্দে ভিতরে এসে যা নিতে ইচ্ছা হয় নিয়ে যেতে পারে। হয় তারা ভাবলে যে এটা একটা ছলনা কিংবা তাবা এতই বোকা যে, যা তাবা কবতে অভ্যস্ত তাছাডা আব কিছুই তাদেব মাথায় ঢোকে না; তাবা গ্রাহ্য কবলে না। তাবা ভিতরে ঢোকাব জন্য জানালার চৌকাঠ খোলাব চেষ্টায় লেগে রইল। সাধাবণতঃ যা হয় জানালায় লোহাব গবাদ লাগান ছিল। রামকৃষ্ণস্বামী তাদেব অনর্থক ক্ষতি করতে দেখে রেগে গিয়ে শ্রীভগবানের কাছে তাদেব বাধা দেওয়াব অনুমতি চাইলে কিন্তু শ্রীভগবান নিষেধ কবে বললেন, "ওদেব ধর্ম ওদের, আমাদেব ধর্ম আমাদেব। আমাদের ধর্ম সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা। ওদের কাজে হস্তক্ষেপ ক'রে কাজ নেই।"

যদিও শ্রীভগবান তাদেব দবজা দিয়ে ভিতরে আসতে বললেন, তবু তাবা তাদেব জানালা ভাঙ্গা চালিয়ে যেতে লাগল। তারা জানালা দিয়ে পটকা ছুঁড়ে মারলে, দেখাতে চায় যে তাদেব কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। আবার তাদেব দবজা দিয়ে এসে যা ইচ্ছা হয় নিয়ে যেতে বলা হল, কিন্তু তাবা কেবল ভয় দেখাতে লাগল। ইতিমধ্যে কুঞ্জস্বামী হলঘর ছেড়ে সাহায্যের জন্য সহরে রওনা দিয়েছে।

রামকৃষ্ণস্বামী আবাব চোরেদের বললে যে উৎপাত না করে যা ইচ্ছা হয় নিয়ে চলে যাক। উত্তরে তাবা ঘবে আগুন দেওয়াব ভয় দেখালে। শ্রীভগবান বললেন যে সেটা করার দরকাব নেই, তাঁবাই ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তাবাও ঠিক এটাই চাইছিল, বোধ হয় ভয় পাচ্ছিল যে তাদের কাজ হতে না হতে যদি অন্য কেউ এসে পড়ে। পাছে ফেলে রেখে গেলে কারুপন্ন আরও মার খায় তাই শ্রীভগবান রামকৃষ্ণস্বামীকে প্রথমে তাকে অন্য কুটিরে নিয়ে যেতে বললেন।

তারপর তিনি ও অন্য তিনজন, মস্তান, তাঙ্গাভেলু পিল্লাই, আর আশ্রমের পূজারী মুনিস্বামী নামে একটি ছোট ছেলে উত্তর দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন। চোরেরা লাঠি নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইল, হয় তাদের জখম করার জন্য কিংবা যাতে ভয় পেয়ে প্রতিরোধ না করে সেজন্য প্রত্যেককে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তারা মারলে। শ্রীভগবান বাঁ পায়ে চোট পেয়ে বললেন "যদি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকো অন্যটাতেও মারতে পার।" যাহোক আর মারধোর হওয়ার আগে রামকৃষ্ণস্বামী ফিরে এল।

শ্রীভগবান ও ভক্তেরা হলঘরের উত্তব দিকে একটি পর্ণশালায় (পরে ভেঙ্গে ফেলা হয়) বসে ছিলেন। চোরেরা চীৎকার করে সাবধান করলে, "ওখান থেকে নড়লে মাথা ফাটিয়ে দেবো।"

শ্রীভগবান বললেন, "সব ঘরটা তোমাদের হাতে, যা ইচ্ছা হয় কর।"

একজন চোর এসে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা চাইলে, রামকৃষ্ণস্বামী শ্রীভগবানের অনুমতি নিয়ে আলোটা দিয়ে দিলে। আবার একজন এসে আলমারির চাবি চাইলে, কিন্তু কুঞ্জস্বামী সেটা নিয়ে চলে গিয়েছিল, তাকে তাই বলা হল। তারা আলমারি ভাঙ্গলে আর সেখানে দেবমূর্তি সাজাবার জন্য কিছু পাতলা রূপার পাত রাখা ছিল, কয়েকটা আম ও সামান্য চাল মোটমাট ১০ টাকার মত জিনিস পেল। তাঙ্গাভেলু পিল্লাই-এর ছ'টা টাকাও তারা নিয়ে গেল।

এই সামান্য জিনিস পেয়ে একজন লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে "টাকা পয়সা কোথায় ? কোথায় রাখা হয় ?"

শ্রীভগবান বললেন "আমরা গরীব সাধু, লোকেদের দয়ার ওপর নির্ভর করি, আমাদের টাকা পয়সা নেই।" চোরেদের চীৎকার, চেঁচামেচি সত্ত্বেও তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হল।

শ্রীভগবান রামকৃষ্ণস্বামী ও অন্যদের তাদের আঘাতের ওপর মলম লাগাতে বললেন।

"আর আপনার ?" রামকৃষ্ণস্বামী জিজ্ঞাসা করলে।

শ্রীভগবান হেসে উঠলেন আর পরিহাস করে বললেন "আমারও পূজা হয়েছে।"

তাঁর উরুতে কালশিরা দেখে রামকৃষ্ণস্বামীর হঠাৎ রাগ হয়ে গেল। সে পড়ে থাকা একটা লোহার ডাণ্ডা তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে চোরেরা কি করছে দেখার জন্য অনুমতি চাইলে। কিন্তু শ্রীভগবান তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "আমরা সাধু। আমাদের ধর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। তুমি যদি গিয়ে ওদের মার আর কেউ যদি মারা যায় তবে লোকে তোমাকেই দোষ দেবে, তাদের নয়। তারা কুপথগামী, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন কিন্তু আমাদের ঠিক পথে চলা উচিত। যদি তোমার দাঁত হঠাৎ জিভ কামড়ে ফেলে তুমি কি তার জন্য দাঁত উপড়ে ফেল ?"

চোরের দল যখন চলে গেল, তখন প্রায় রাত ছুটো। একটু পরে কুঞ্জস্বামী গ্রামের মোড়ল ও আর দু'জন পুলিস নিয়ে এল। শ্রীভগবান তখন উত্তর দিকের চালাঘরে বসে ভক্তদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলাপ-আলোচনা করছেন। পুলিসেরা কি হয়েছে জানতে চাইলে, তিনি কেবল বললেন যে, ক'টি বোকা লোক আশ্রমে ঢুকেছিল আর কিছু না পেয়ে নিরাশ হয়ে চলে গেছে। তারা সেইটুকু লিখে মোড়লের সঙ্গে বিদায় নিলে। মুনিস্বামী তাদের পিছনে দৌড়ে গিয়ে বললে যে, চোরেরা স্বামী ও অন্যদের মারধোর করেছে। পরের দিন সকালে সার্কেল ইন্‌স্‌পেক্‌টার, সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টার ও একজন হেড কন্‌স্‌টেবল সরেজমিনে তদন্ত করতে এল, পরে ডেপুটি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টও এল। জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত শ্রীভগবান কাউকে তাঁর চোটলাগা বা চুরির কথা বললেন না। কয়েক দিন বাদে কিছু চোরাই মাল পাওয়া গেল, চোর ধরা পড়ল ও তাদের সাজাও হল।

———

অষ্টম অধ্যায়

মা

১৯০০ সালে শ্রীভগবানের মার তাঁর ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টার পর বাড়ী ফিরে যাওয়ার কিছু দিন বাদে তাঁর বড় ছেলেটি মারা গেল। দু'বছর বাদে ছোটছেলে নাগসুন্দরম মাত্র ১৭ বছর বয়সে প্রথমবাব তার সাধু ভাইকে দেখতে এল। সে তার দাদাকে দেখে এতই অভিভূত হল যে তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। শ্রীভগবান নিশ্চল মৌন ভাবে বসে রইলেন। মাও একবার কাশী থেকে ফেরার পথে অল্প দিনের জন্য এলেন। ১৯১৪ সালে মা তিরুপতির বেঙ্কটরমণস্বামীকে দর্শন করতে গেলেন ও ফেরার পথে তিরুভন্নমালাই এলেন। এই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর কয়েক সপ্তাহ সাংঘাতিক জ্বরাতিসার রোগ ভোগ করেন। শ্রীভগবান তাঁকে সযত্নে সেবা শুশ্রূষা করেন। তাঁর অসুস্থতার সময় কয়েকটি কবিতা লেখেন। সম্ভবতঃ সেগুলোই একমাত্র জানা উদাহরণ যখন তিনি ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

হে প্রভু! শরণ আমার, জন্ম মৃত্যু গতিরোধকারী।
তোমারই উচিত হতে মায়ের জ্বর রোগ-হারী॥
হে শমন দমন প্রভু! হৃদয়-পদ্মে মায়ের
রাখহ চরণ! তোমার চরণ কমলে
শরণ নিতে জন্ম দিল যে এ দেহের,
মৃত্যু হতে রক্ষা কর। মৃত্যু কি, বিচারে?
অরুণাচল, জ্ঞানময় জ্বলন্ত অনল!
তোমার জ্যোতিতে ভর, আত্মসাৎ কর
তারে। চিতাবহ্নি কিবা প্রয়োজন আর॥
অরুণাচল, মায়া মোহ ভঞ্জন!
ত্বরা করি ঘুচাও ভব বন্ধন।

তুমি বিনা কে আছে মোর আপন,
শরণাগতের কর্মজাল খণ্ডন ॥

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয়, এটি মায়ের রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা, বস্তুতঃ এটি মার আরও ভীষণ রোগ জগত-ভ্রম ও ভববিকার হতে মুক্তি ও আত্মার সঙ্গে একাত্মতা অনুভবের জন্য প্রার্থনা।

বলা বাহুল্য, আলাগাম্মাল ভাল হয়ে উঠলেন। তিনি মানা-মাতুরায় ফিরে গেলেন। কিন্তু এই প্রার্থনার পর ঘটনাচক্র এমনই দাঁড়াল যে তাঁকে সাংসারিক জীবন থেকে আশ্রম জীবনের দিকে ঠেলে দিতে আরম্ভ করলে। তিরুচুড়ীর বাড়ী দেনা মেটান ও অন্যান্য খরচের জন্য বিক্রি হয়ে গেল। তাঁর দেওর নেল্লিযাপ্পিয়ার মারা গেল আর পরিবারের খুবই দুরবস্থা হল। ১৯১৫ সালে তাঁর ছোট ছেলে নাগসুন্দরমের স্ত্রী একটি ছোট ছেলে রেখে মারা গেল, তাকে তার পিসীমা আলামেলু মানুষ করতে লাগল. আলামেলুর তখন বিয়ে হয়ে গেছে। আলাগাম্মালের মনে হল এই বৃদ্ধাবস্থায় এখন তাঁর একমাত্র আশ্রয় হল সাধু ছেলে। ১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে তিনি তিরুভন্ন-মালাই চলে এলেন।

প্রথমে তিনি কয়েকদিন এচাম্মালের কাছে ছিলেন। কয়েকজন ভক্ত তাঁর ছেলের কাছে থাকার বিরুদ্ধে ছিল, তাদের ভয় ছিল পাছে ১৮৯৬ সালের গৃহত্যাগের মত এবারও নীরব প্রতিবাদে তিনি এই স্থান ত্যাগ করে চলে যান! যা হোক এখনকার অবস্থা আগের থেকে অন্যরকম, এবার মা সংসার ত্যাগ করে এসেছেন, শ্রীভগবানকে সেখানে আটকে রাখা হয়নি। শ্রীভগবানের গাম্ভীর্য এতই প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁর সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও, তিনি কি করতে চান এরূপ প্রশ্ন উঠলে কেউ তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেত না। যদিও কেউ জিজ্ঞাসা করত তাহলে তিনি মৌন ভাবেই বসে থাকতেন কারণ তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না।

এর কিছু পরেই মা তাঁর কাছে থাকতে এলেন। শ্রীভগবান

বিরূপাক্ষ গুহা থেকে আরও একটু উঁচুতে ঠিক তার ওপরে স্কন্দাশ্রমে চলে গেলেন। এই গুহাটা বেশ বড় ও তাঁর থাকার জন্য ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কাছেই একটা ভিজা জায়গা দেখে তিনি ঠিকই ধরেছিলেন যে এখানে একটা ঝর্ণা আছে। সেটা কিছুটা খুঁড়ে ও বারুদ দিয়ে ফাটিয়ে দেওয়ার পর একটা নিরন্তজলধারা পাওয়া গেল. সেটা আশ্রম ও আশ্রমের সামনের ছোট বাগানটির পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল। মা রান্না আরম্ভ করলেন সুতরাং আশ্রম জীবনে এক নূতন যুগ শুরু হল।

তাঁর ছোট ছেলেকেও আশ্রমে ডেকে নেওয়ার জন্য তিনি একজন ভক্তকে পাঠালেন। ছোট ছেলে তিরুভেনগাড়ুর চাকরি ছেড়ে তিরুভন্নমালাই-এ বাস করার জন্য চলে এল। প্রথমে সে সহরে থাকত সেখানেই কোন বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতে খেত আর রোজ আশ্রমে আসত। অল্পদিনের মধ্যেই সে সংসার ত্যাগ করে গেরুয়া নিয়ে নিরঞ্জনানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হল, তবুও স্বামীর ছোট ভাই হওয়ার জন্য সে 'চিন্নাস্বামী বা 'ছোটস্বামী' নামেই বেশী পরিচিত ছিল। কিছু-কাল সে প্রতিদিন ভিক্ষার জন্য সহরে যেত, কিন্তু ভক্তদের এটা ঠিক মনোমত হল না যে স্বামীর ছোট ভাই সহরে ভিক্ষায় যায় কারণ আশ্রমে তখন সবার জন্য পর্যাপ্ত আহারের ব্যবস্থা ছিল। শেষ অবধি তাকে আশ্রমে থাকার জন্য রাজী করানো হল।

মনে হচ্ছিল যে, শ্রীভগবান আবার একরকম পারিবারিক জীবনে ফিরে এলেন, পরিবার বলতে এখন ভক্তগোষ্ঠী, আর কখন কখন তিনি তাদের নিজের পরিবার বলে উল্লেখও করতেন। এই আপাত অসঙ্গতির জন্যই শ্রীভগবানের মা ও ভাই প্রথমে তাঁর সঙ্গে থাকেন নি। একবার শেষাদ্রিস্বামী এ নিয়ে পরিহাস ক'রে উল্লেখ করে। একজন দর্শনার্থী তাকে দর্শনের জন্য পথে থেমেছিল, সে পরে ওপরে উঠে রমণস্বামীকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে শেষাদ্রিস্বামী বলে "হাঁ, যাও, ওপরে চলে যাও, ওখানে একজন গৃহস্থ থাকে। সেখানে তোমায় কেক ও বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়িত করা হবে।"

শেষাদ্রিস্বামীর পরিহাসের মর্মার্থ হল, গৃহস্থ আশ্রমকে বৈরাগ্যাশ্রম থেকে নীচু বিবেচনা করা হয় কারণ সাধু কেবল আত্মানুসন্ধানে সময় অতিবাহিত করতে পারে অপর পক্ষে গৃহস্থকে নানা ঝঞ্ঝাট সামলাতে হয়। গৃহ ও বিষয় সম্পত্তি ত্যাগকে আত্মোপলব্ধির পথে একটা বড় রকমের পদক্ষেপ মনে করা হয়। অতএব বহু ভক্ত শ্রীভগবানকে সংসার পরিত্যাগ করবে কিনা জিজ্ঞাসা করত। শ্রীভগবান সর্বদা নিরুৎসাহ করতেন। নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে যে, সন্ন্যাস সংসার ছাড়া নয় পরন্তু সবাইকে আপন করা।

ভক্ত—আমার ইচ্ছা হয়, কাজ ছেড়ে দিয়ে সর্বদা শ্রীভগবানের চরণে থাকি।

ভগবান—ভগবান সর্বদাই তোমার কাছে রয়েছেন। তোমার আত্মাই ভগবান। এটাই তোমায় উপলব্ধি করতে হবে।

ভক্ত—কিন্তু আমার একটা প্রবল ইচ্ছা হয় যে, সব আসক্তি ও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হই।

ভগবান—সন্ন্যাসের অর্থ বাইরের কাপড় বদলানো বা অন্য কিছু বা গৃহত্যাগ করা নয়। প্রকৃত সন্ন্যাস হল কামনা, বাসনা ও আসক্তি ত্যাগ।

ভক্ত—কিন্তু সংসার ত্যাগ না করলে আন্তরিকভাবে ঈশ্বরে ভক্তি হওয়া সম্ভব নয়।

ভগবান—না, যে সত্যকারের সন্ন্যাসী হয় সে জগতে মিশে যায় ও তার প্রেম এমনই বিস্তৃত হয় যে সমস্ত সংসার ছেয়ে যায়। গৃহত্যাগ করে গেরুয়া বসন পরার চেয়ে সার্বজনীন প্রেমই ভক্তের উপযুক্ত সংজ্ঞা।

ভক্ত—বাড়ীতে স্নেহের আসক্তি বড় প্রবল।

ভগবান—উপযুক্ত পরিপক্কতা লাভ না করে সংসার ত্যাগ করলে আরও নূতন বন্ধন হয়।

ভক্ত—সন্ন্যাস কি বন্ধন কাটাবার প্রকৃষ্ট উপায় নয়?

ভগবান—যে আগেই বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছে তার পক্ষে এটা হতে পারে। কিন্তু তুমি ত্যাগের গূঢ় অর্থ এখনও বোঝনি। যে মহাত্মারা গৃহত্যাগ করেছেন তাঁরা সংসারের ওপব বিতৃষ্ণার জন্য করেন নি পরন্তু তাঁদের উদার-হৃদয়তা ও সমস্ত মানব জাতি তথা সংসারের সকল প্রাণীর প্রতি প্রেমের জন্যই এটা করেছেন।

ভক্ত—কোন না কোন সময় সংসার বন্ধন যাবে সুতরাং যাতে আমার স্নেহ সর্বজীবে সমান হয় সেজন্য আমি উদ্যোগী হয়ে সেটা নষ্ট করে ফেলি না কেন ?

ভগবান—যখন তুমি প্রকৃতরূপে সবার প্রতি সমভাবাপন্ন হবে, যখন তোমার হৃদয় সত্যই এত উদার হবে যে সমস্ত সৃষ্টিকে নিজের অন্তর্গত মনে করবে তখন আর সংসার ছাড়ার প্রশ্ন থাকবে না, তখন তুমি পার্থিব জীবন থেকে গাছের পাকা ফলের মত অনায়াসে পড়ে যাবে। সমস্ত জগৎটাকেই তোমার বাড়ী ব'লে মনে হবে।

এটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয় যে এরূপ প্রশ্ন প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হত আর অনেকেই যা উত্তর পেত তাতে অবাক হয়ে যেত, কারণ শ্রীভগবানের দৃষ্টিভঙ্গী পরম্পরাগত প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত। যদিও যুগে যুগে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কোন ব্যতিক্রম হয় না তথাপি জগদ্‌গুরুরা সেই সত্য-উপলব্ধির পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করে সাজিয়ে দেন। বর্তমান যুগে সন্ন্যাস বা পূর্ণরূপে শাস্ত্রীয় নিষ্ঠা বজায় রাখা অসম্ভব। ভক্তরা কেউ ব্যবসায়ী, কেউ পদস্থ সরকারী কর্মচারী, চিকিৎসক, উকিল, এঞ্জিনীয়ার, সকলেই কোন না কোন ভাবে আধুনিক নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত, তা সত্ত্বেও তারা মুক্তি অভিলাষী।

শ্রীভগবান প্রায়ই বলতেন যে প্রকৃত ত্যাগ মনে, সেটা বাহ্যিক ত্যাগে বাড়েও না আর তার অভাবে কমেও না।

"তুমি নিজেকে গৃহস্থ মনে কর কেন ? তুমি সংসার ছেড়ে গেলেও তুমি সন্ন্যাসী এই চিন্তা তোমার লেগে থাকবে। তুমি সংসারে থাক

কিংবা সংসার ছেড়ে বনে যাও, তোমার মন তোমার সঙ্গে থাকবে। অহংকারই চিন্তার মূল। এটাই শরীর ও জগৎ সৃষ্টি করেছে আর এটাই তোমায় তুমি গৃহস্থ এরূপ চিন্তা করতে বাধ্য করে। তুমি যদি সন্ন্যাস নাও তাহলে সংসারের চিন্তার বদলে সন্ন্যাসের চিন্তা হবে আব সংসারের বদলে বনের পরিবেশ হবে। কিন্তু মনের বাধা তোমার ঠিকই থাকবে। এমনকি নূতন পরিবেশে সেগুলো আরও অধিক বাড়বে। পরিবেশ বদল করে কোন লাভ নেই। বাধাটা হল মনের, বনেই থাকো বা ঘরেই থাকো সেটাকে অতিক্রম করতে হবে। তুমি যদি বনে এটা করতে পার তাহলে ঘরেই বা নয় কেন? অতএব পরিবেশ বদলে কি হবে? তোমার পরিবেশ যাই হোক তুমি এখনই চেষ্টা শুরু করতে পার।"

তিনি এও বলেছেন যে কাজের জন্য সাধনার বাধা হয় না পরন্তু সেটা কোন্ মানসিকতায় করা হয় তার ওপর নির্ভর করে। আর অনাসক্তভাবে সাধারণ কাজকর্ম করা সম্ভব। তিনি 'শ্রীরমণ-বাণী'তে বলেছেন "আমি করছি এই ভাবটাই বাধা। নিজেকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে করে'? 'তুমি কে' স্মরণ রাখো। তাহলে আর কর্ম বন্ধনের কারণ হবে না। সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যাবে।" দেবরাজ মুদালিয়ারের লিখিত 'ভগবানের সঙ্গে দিনের পর দিন' বই-এ এর একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে।

"অনাসক্তভাবে জীবনের সব কাজ করা আর আত্মাকেই একমাত্র বাস্তবিক সত্য ভাবা সম্ভব। এটা মনে করা ভুল যে যদি একজন আত্মস্থিত হয় তবে তার সাংসারিক কর্তব্য যথাযথ হবে না। এ একটা অভিনয়ের মত। সে যে ভূমিকায় অভিনয় করে, তার মত পোশাক পরে, সেইমত অভিনয় করে, এমনকি তার মত অনুভবও করে কিন্তু সে বেশ জানে যে, সে সেই চরিত্র নয় আর প্রকৃত জীবনে সে অন্য কেউ। অনুরূপভাবে তুমি যদি একবার নিশ্চিত জান যে তুমি শরীর নও, আত্মা, তবে

দেহ চেতনা বা দেহাত্মবোধ তোমায় বিচলিত করবে কেন
শরীরটা যাই করুক না কেন তোমার আত্মস্থিতির ব্যাঘাত হবে
না। এরূপ আত্মস্থিতিতে শরীরের কর্তব্য যথাযথ কার্যকরীরূপে
সম্পাদনের কোন বাধা হয় না কারণ একজন অভিনেতা
নিজের বাস্তবিক স্বরূপের জ্ঞান থাকলেও তার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়
করার কোন বাধা হয় না।"

যাই নাম দাও না কেন ধ্যান বা স্মরণে যেরূপ কাজের কোন বাধা
হয় না, সেরূপ কাজেও স্মরণের বাধা হয় না। শ্রীভগবান পল
ব্রান্টনের সঙ্গে কথাবার্তার সময় এটা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

ভগবান—কর্মময় জীবন পরিত্যাগের প্রয়োজন নেই।
তুমি যদি দিনে একঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা ধ্যান কর তবে তোমার
কর্তব্য ভাল ভাবেই চালিয়ে যেতে পার। তুমি যদি ঠিকভাবে
ধ্যান কর তাহলে সেই ধ্যানের ধারা তোমার কাজের মধ্যে
অবিরত চলতে থাকবে। এটা ঠিক যেন একই চিন্তা দু'ভাবে
অভিব্যক্ত হচ্ছে, ধ্যানের সময় যে বিচার ধারা চলতে থাকে
কাজের সময়ও সেরূপ চলতে থাকবে।

পলব্রান্টন—এরূপ করলে কি ফল হবে ?

ভগবান—তুমি যতই এভাবে চলতে থাকবে ততই দেখবে
যে লোক, ঘটনা ও বস্তুর সম্বন্ধে তোমার ধারণা ক্রমশঃ পরি-
বর্তিত হয়ে যাচ্ছে। তোমার কাজ স্বতঃই তোমার ধ্যানের
অনুগামী হবে।

মানুষের উচিত যা তাকে জগতের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে
সেই ব্যক্তিগত স্বার্থ সমর্পণ করা। অসৎ আমিকে ত্যাগ করাই
প্রকৃত ত্যাগ।

পলব্রান্টন—সংসারে কর্মময় জীবন যাপন করে কিভাবে
স্বার্থশূন্য হওয়া সম্ভব ?

ভগবান—কর্ম ও জ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

পলব্রাণ্টন—আপনি বলতে চান যে একজন তার পূর্বতন জীবনধারা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে?

ভগবান—কেন নয়? সেই অবস্থায় সে একথা ভাবে না যে তার পূর্বতন ব্যক্তিত্ব ঐ কাজগুলো করছে, কেননা তার চেতনা ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়ে সেই সত্তায় প্রবেশ করে যা এই ক্ষুদ্র আমির অতীত।

অনেকেই তাঁর অনাসক্তভাবে কর্ম করার নির্দেশে গোলমালে পড়ে ত, তাদের কাজ পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ হত। থচ তাদের সামনে শ্রীভগবানের উদাহরণ ছিল কারণ তিনি যা কিছু তেন, সে প্রুফ সংশোধন হোক, বই বাঁধা হোক বা রান্না কিংবা রিকেলের মালা কেটে তার চামচ তৈরী করে তাকে পালিশ করা ক, সেগুলো সবই নিখুঁত ভাবে করতেন। বস্তুতঃ 'আমি কর্তা' ব পুরোপুরি নষ্ট হওয়ার আগেও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করলে কাজ রাপ তো হয়ই না বরং বিবেক-বিচার-সম্পন্ন হয়ে করলে দক্ষতা রও বেড়ে যায়। কারণ এর অর্থ এই নয় যে, কাজের গুণাগুণের তি উদাসীনতা পরন্তু এটা অহংকারের হস্তক্ষেপ না হওয়ার ফল। ংকারের অনধিকার প্রবেশেই যত সংঘর্ষ ও অকর্মণ্যতা হয়। যদি াই তাদের কাজ কর্তব্য বোধে নিরভিমান ও নিঃস্বার্থ ভাবে করে ব শোষণ বন্ধ হয়, প্রচেষ্টা সৎপথে নিয়োজিত হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতার ন সমন্বয় আসে আর বিশ্বের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয়। কর্ম ষ্ঠবেরও কোন হানি হয় না; এটা স্পষ্ট হবে যদি আমরা প্রত্যেক বিশ্বাসের যুগে, কর্তব্য বোধে ও নিজেকে অন্তরালে রেখে করা রুশিল্পগুলো স্মরণ করি—সে গথিক গীর্জাই হোক কিংবা মসজিদ রী, হিন্দুদের মৃৎশিল্প অথবা 'তাও'-বাদীদের অঙ্কনশিল্পই হোক। জন ডাক্তার যখন নৈর্ব্যক্তিক ভাবে কাজ করে তখন অধিক দক্ষতার করতে পারে আর ঠিক সেইজন্য সে প্রায়ই নিজের পরিবারের কৎসা করা পছন্দ করে না। তার স্বার্থ জড়িত না হলে একজন

'ফাইন্যান্সার' অনেক ঠাণ্ডা মাথায় সুবিবেচনার সঙ্গে কাজ করে। এমঃ কি খেলাধুলাতেও যে নিরপেক্ষ ভাবে খেলে তার প্রতি ভাগ্য প্রসন্ন হয়

সাংসারিক জীবন যাপনের নির্দেশে অনেকবারই এই প্রতিবাদ করা হয়েছে যে শ্রীভগবান স্বয়ং গৃহত্যাগ কবেছিলেন। এতে তিঃ সংক্ষেপে উত্তব দিতেন যে প্রত্যেকেই তার প্রাবব্ধ অনুসারে কাজ করে। যা হোক আমাদেব স্মবণ বাখতে হবে যে বাহ্যিক স্বাভাবিব জীবন যাপন ও দৈনন্দিন জীবনে সহজ ভাবে অংশ গ্রহণ, যা তিনি পরবর্তী জীবনে সম্পূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে কবে আদর্শ স্থাপন করেছিলে আর তাঁর ভক্তদের অনুসরণ কবতে বলতেন, সেটা মাদুরায় তাঁর কাকা বাড়ীতে জাগরণের অব্যবহিত পরেই হওয়া সম্ভব হয়নি। উত্তবট এই যে যেটা শ্রীভগবানের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, সেটা তিনি তাঁ কৃপাদ্বারা তাঁর অনুগামীদেব পক্ষেও সম্ভব করে দেন।

মায়ের কথায় ফিবে আসি—তিনিও কঠোর শিক্ষা লাভ করে ছিলেন। প্রায়ই শ্রীভগবান মাকে উপেক্ষা করতেন, তিনি কথ বললে উত্তব দিতেন না কিন্তু অন্যদের প্রতি মনোযোগ দিতেন। ম অনুযোগ করলে শ্রীভগবান বলতেন, "সব স্ত্রীলোকই আমার মা, কেব তুমি একলা নও।" আবার যীশুখ্রীস্টের, তাঁর মা ও ভাই-এর ভি বাইরে তাঁর সঙ্গে কথা বলাব জন্য দাঁড়িয়ে থাকা কালে, তাঁব উক্তি " আমার স্বর্গস্থ পিতাব ইচ্ছা পালন করে সেই আমার ভাই, বোন মা", মনে পড়ে যায়। প্রথম প্রথম শ্রীভগবানের মা প্রায়ই দুঃখ পে কাঁদতেন পরে ক্রমশঃ তাঁর মধ্যে বিচার খুলল। স্বামীর মা হওয়া গর্ব ক্রমশঃ চলে গেল, অহংকার দুর্বল হয়ে এল, তিনি ভক্তদের সেবা নিজেকে বিলিয়ে দিলেন

এমনকি তিনি তাঁর মায়ের আচার-বিচার নিয়ে ঠাট্টা-পবিহা করতেন। যদি তাঁর কাপড় কোন অব্রাহ্মণকে ছুঁয়ে যেত তি উদ্বিগ্ন হওয়ার ভান করে বলতেন, "এই যা! জাত চলে গেল! চলে গেল!" আশ্রমের খাদ্য বিশুদ্ধ নিরামিষ ছিল কিন্তু আলাগাম্মা

অন্যান্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কয়েকটি সবজীকে অপবিত্র ভাবতেন, আর শ্রীভগবান মজা করে বলতেন, "পেঁয়াজ থেকে সাবধান! এটা মোক্ষের মস্ত বড় বাধা!"

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে শ্রীভগবান সাধারণতঃ নিয়ম-নিষ্ঠার বিরোধী ছিলেন না। এক্ষেত্রে নিয়ম-নিষ্ঠার প্রতি অত্যধিক আসক্তি ছিল আর তিনি সেটার বিরোধিতা করতেন। সাধারণতঃ তিনি সাত্ত্বিক খাদ্যের ওপর জোর দিতেন। তিনি প্রায়ই বাহ্য আচার-ব্যবহারের ওপর কোন নির্দেশ দিতেন না, তাঁর অভ্যস্ত রীতি ছিল ভক্তের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার বীজ বপন করা আর তার বিকাশের ফলে তাদের বাহ্য জীবনের রূপান্তর হতে দেওয়া। নির্দেশ ভক্তের অন্তর থেকে আপনা হতে আসত। একজন পাশ্চাত্য ভক্ত যখন আশ্রমে এল তখন সে পুরো আমিষাশী—আমিষকে সে খাদ্যের অপরিহার্য ও একমাত্র স্বাদিষ্ট বস্তু মনে করত, এ বিষয়ে কোন কথা হল না, কিন্তু এমন এক সময় এল যখন আমিষ খাওয়ার কথাতেও তার অনীহা হত।

অহিন্দু পাঠকদের এখানে বলে রাখা যায় যে, নিরামিষ খাওয়া যে কেবল প্রাণিহত্যা না করা বা আমিষ না খাওয়া তা নয়, যদিও এটাও একটা কারণ, এটা অসাত্ত্বিক খাদ্য বলেও বটে (যার মধ্যে কয়েকটি সবজিও পড়ে)। এরা নিম্নবৃত্তিকে উত্তেজিত ক'রে আধ্যাত্মিক চেষ্টাকে বাধা দেয়।

যে তার ছেলে হয়ে এসেছে সে যে দেবমানব তা আরও অন্য উপায়েও মাকে বোঝান হয়েছিল। একবার তিনি যখন ছেলের সামনে বসেছিলেন তখন তিনি অদৃশ্য হয়ে যান আর তাঁর স্থানে মা এক জ্যোতির্ময় লিঙ্গ দেখেন। ছেলে মানব দেহ ত্যাগ করলে ভেবে তিনি কেঁদে উঠলেন কিন্তু শীঘ্রই লিঙ্গ অদৃশ্য হয়ে গেল আর তিনি প্রকট হলেন। আর একবার মা তাঁকে মাল্যভূষিত, সর্পবেষ্টিত ইষ্টদেবতা শিবরূপে দেখেন—তিনি চীৎকার করে ওঠেন "ওদের দূর করে দাও! ওদের দেখে আমার ভয় করছে!"

এরপর তিনি প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন তাঁকে কেবল মানবী রূপেই দেখা দেন। দর্শনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে গেল। তিনি অনুভ করলেন যে, যে রূপকে তিনি তাঁর ছেলে বলে জানেন ও স্নেহ করে সেটা মায়া আর অন্যান্য রূপের মত তিনি সেটা ধারণ করেছেন।

১৯২০ সাল থেকে মায়ের স্বাস্থ্য খারাপ হল। তিনি আশ্র বাসীদের অনুরোধে কম সেবা করা ও বেশী বিশ্রাম নিতে বা হলেন। তাঁর অসুস্থতার সময় শ্রীভগবান সব সময় তাঁর কা থাকতেন, প্রায়ই সারারাত জাগতেন। মৌন ও ধ্যানের দ্বারা মা মনের পরিপক্কতা হল।

১৯২২ সালে বেহুলা নবমীর দিন যেটা সে বছর ১৯শে মে পড়েছি মার দেহান্ত হল। শ্রীভগবান ও আরও কয়েকজন ভক্ত সারাদি অনাহারে মার পাশে বসে রইলেন। সন্ধ্যার সময় রান্না হল, শ্রীভগবা অন্যদের খেতে যেতে বললেন কিন্তু নিজে গেলেন না। সন্ধ্যা কয়েকজন ভক্ত তাঁর পাশে বসে বেদপাঠ আর অন্যেরা 'রাম' না করতে লাগল। প্রায় দু'ঘণ্টার ওপর তিনি এইভাবে বসে রইলে বুকটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, আর শ্বাসের টান আরম্ভ হল সমস্তক্ষণ শ্রীভগবান ডান হাত তাঁর বুকে ও বাঁ হাত তাঁর মাথায় দিয়ে পাশে বসে রইলেন। এখন আর জীবন দীর্ঘতর করার প্রশ্ন নেই, কেবল মন শান্ত করা যাতে মৃত্যুটা মহাসমাধি হয়ে আত্মায় মিশে যায়।

সন্ধ্যা ৮টার সময় তাঁর দেহত্যাগ হল। শ্রীভগবান তৎক্ষণা বেশ খুশি মনে উঠে পড়ে বললেন, "চল, এখন খাওয়া যায়, কো দোষ নেই।"

এর একটা গভীর তাৎপর্য আছে। হিন্দু সিদ্ধান্ত অনুসারে মৃত্যুতে অশৌচ হয় ও তার জন্য শুদ্ধির প্রয়োজন হয়, কিন্তু এটা মৃত্যু নয় এটা লীন হয়ে যাওয়া। এখানে পরমাত্মায় পূর্ণ মিলনের জন্য কো বিদেহ আত্মা নেই আর শুদ্ধিরও কোন প্রয়োজন নেই। কয়েকদি পরে শ্রীভগবান এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যখন কো

একজন মায়ের মৃত্যুর কথা বলে তিনি তার ভুল সংশোধন করে বলেন, 'তাঁর মৃত্যু হয়নি, তিনি লীন হয়ে গিয়েছেন।"

পরে এই প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করে তিনি বলেছিলেন, "অন্তর্নিহিত ;ংস্কার ও পরবর্তী সম্ভাবনার বীজসরূপ সূক্ষ্ম স্মৃতি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ঠেছিল। সূক্ষ্ম দেহে দৃশ্যের পর দৃশ্য খেলে গেল। বাহ্য-চেতনা াগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। জীবাত্মা অনেক অনুভূতির ভিতর দিয়ে লে গেল। এরূপে অনেক জন্মান্তর এড়িয়ে গিয়ে আত্মায় মিশে াওয়া সম্ভব হয়েছিল। আত্মা অবশেষে তার সূক্ষ্ম কোষসমূহ ত্যাগ রে যেখান থেকে আর অজ্ঞানে পুনরাবর্তন হয় না সেই চরম ক্ষ্যে, মুক্তির শান্তিধামে পৌঁছে গেল।"

শ্রীভগবান মাকে আধ্যাত্মিক পথে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন কিন্তু সটা আলাগাম্মালের সৎ-স্বভাব, তাঁর পূর্বেকার আসক্তি ও অহংকার র্জনের ফলেই গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। শ্রীভগবান পরে বলেছিলেন তাঁর বেলা এটা সফল হয়েছিল। আরও আগে আমি একবার পালানীস্বামীর শেষ অবস্থায় এটা করেছিলাম কিন্তু তখন বিফল হয়। স তার চোখ খুললে আর মারা গেল।" তিনি অবশ্য এও যোগ রেন যে পালানীস্বামীর ক্ষেত্রে একে একেবারে ব্যর্থ বলা যায় না, তার দহত্যাগের ভাবে তার শুভ পুনর্জন্মের ইঙ্গিত করে।

কোন ভক্তের প্রিয়জন বিয়োগ হলে তিনি প্রায়ই তাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে কেবল দেহটাই মরে আর দেহাত্মবোধের ভ্রমের জন্যই মৃত্যুতে শোক হয়। এখন তাঁর নিজের শোকের সময় কিছুমাত্র কাতরতা দেখা যায়নি। সমস্ত রাত্রি তিনি ও ভক্তেরা ভজন গেয়ে কাটালেন। মায়ের শরীরের মৃত্যুতে তাঁর উদাসীনতাই তাঁর মায়ের অসুস্থতার সময় করা প্রার্থনার প্রকৃত ব্যাখ্যা।

এখন প্রশ্ন হল মার দেহের কি ব্যবস্থা হবে। তিনি যে পরমাত্মায় লীন হয়ে গেছেন আর অহংকারের মিথ্যা বন্ধনে পুনর্জন্ম লাভ করবেন না—এর প্রমাণ শ্রীভগবান নিজেই দিয়েছেন, কিন্তু সমস্যা হল যে,

স্ত্রীলোক মহাত্মার দেহ কি দাহ করা হবে, না সমাধি দেওয়া হবে। তখন অন্যেরা স্মরণ করলে যে ১৯১৭ সালে গণপতি শাস্ত্রী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ শ্রীভগবানকে ঠিক এই প্রশ্ন করেছিল আর শ্রীভগবান ইতিবাচক উত্তর দিয়েছিলেন, "যেহেতু লিঙ্গ ভেদে জ্ঞান ও মুক্তির কোন পার্থক্য হয় না, সেজন্য স্ত্রীলোক মহাত্মার দেহ দাহ করার প্রয়োজন নেই। তার শরীরও ঈশ্বরের পবিত্র মন্দির।"

ভক্তদের একথাও মনে পড়ল যে শ্রীভগবান আগেই ১৯১৪ সালে মায়ের রোগ-মুক্তির প্রার্থনায় এর উত্তব দিয়েছেন—

অরুণাচল, জ্ঞানময় জ্বলন্ত অনল !
তোমার জ্যোতিতে ভর, আত্মসাৎ কর
তারে। চিতাবহ্নি কিবা প্রয়োজন আর।

ভগবান নিজে সর্বদাই কোন রকম আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন। তিনি কয়েকজন ভক্তকে বললেন রাত্রে চুপি চুপি দেহটাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের কোন গোপন স্থানে সমাধি দিয়ে দিতে যাতে লোকে জানতে না পারে। যা হোক তারা সেটা করতে পারলে না আর পরের দিন তাকে পাহাড়ের তলদেশে আনা হল ও একেবারে দক্ষিণ কোণে দক্ষিণামূর্তি মণ্ডপ ও পালীতীর্থ পুষ্করিণীর মাঝামাঝি জায়গায় আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাধিস্থ করা হল; ভগবান নিজে নীরবে দাঁড়িয়ে সব দেখলেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সহরের অনেক লোক সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিলে। বিভূতি, কর্পূর ও গন্ধদ্রব্য দেহের চারিপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হল। সমাধির ওপর পাথরের স্মারক স্থাপন করে কাশী থেকে আনা শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হল। পরে সেখানে একটি মন্দির স্থাপিত হয়, সেটা ১৯৪৯ সালে সম্পূর্ণ হয়। নাম হয় 'মাতৃভূতেশ্বর' মন্দির, মাতৃরূপে আবির্ভূত ঈশ্বরের মন্দির।

মায়ের আগমন যেমন আশ্রমে নূতন যুগ স্থাপন করেছিল তাঁর প্রয়াণও তেমনি। আশ্রমের অবনতি থেকে উন্নতিই হতে লাগল অনেক ভক্ত শক্তি বা সৃজনী ক্ষমতা রূপে তাঁর উপস্থিতি আগের থেকে

আরও স্পষ্টরূপে অনুভব করলে। একবার শ্রীভগবান বলেছিলেন "তিনি আর কোথায় গেলেন ? তিনি এখানেই আছেন।" নিরঞ্জনানন্দ-স্বামী পাহাড়ের তলদেশে সমাধির পাশে একটি কুটিরে বাস করতে আরম্ভ করলে। শ্রীভগবান স্কন্দাশ্রমেই রইলেন কিন্তু প্রায় প্রত্যেক দিনই আধঘণ্টার পাহাড়ী রাস্তা নেমে সেখানে আসতেন। তারপব প্রায় ছ'মাস বাদে একদিন তিনি বেড়াতে গিয়েছিলেন আর বেড়াতে বেড়াতে সমাধির কাছে যাওয়া আর সেখানে থাকার একটা প্রবল প্রেরণা অনুভব করলেন। যখন তিনি আব স্কন্দাশ্রমে ফিরলেন না ভক্তরাও তাঁর অনুসবণ কবলে। শ্রীরমণাশ্রম গড়ে উঠল। "আমি আমার নিজের ইচ্ছায় স্কন্দাশ্রম থেকে নেমে আসিনি" তিনি পরে বলেছিলেন, "একটা কিছু আমায় এখানে নিয়ে এল আর আমি মেনে নিলাম। এটা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, দৈবাধীন।"

———

নবম অধ্যায়

অদ্বৈত

শ্রীভগবান দার্শনিক ছিলেন না, তাঁর শিক্ষায় কোন ক্রমবিকাশও হয়নি। তাঁর প্রাথমিক ব্যাখ্যা "আত্মানুসন্ধান" ও "আমি কে?" পরে শেষ কয়েক বৎসর তিনি যে মৌখিক শিক্ষা দিতেন তা থেকে সিদ্ধান্তগত ভাবে পৃথক ছিল না। ষোল বছরের যুবক অবস্থায় তিনি যে পরমসত্তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম অনুভব করেছিলেন, যা সব কিছুতে শুদ্ধ সত্তারূপে বিরাজিত, যা নিরাকার, সেই স্ফুরণাত্মক জ্ঞানকে সিদ্ধান্ত বলে পরে স্বীকার করে নেওয়া হয়। "আমি তখন অবধি জানতাম না যে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একটা মূল বস্তু বা সবকিছুর অধিষ্ঠানরূপে একটি নির্বিশেষ সত্তা আছে, আর এও জানতাম না যে ঈশ্বর ও আমি অভিন্ন। পরে তিরুভন্নমালাই-এ যখন ঋভুগীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ শুনলাম, তখন এই সব জানলাম আর দেখলাম যে যা আমি বিনা বিশ্লেষণে ও বিনা নামে স্ফুরণাত্মক রূপে পেয়েছিলাম, এরা তার বিশ্লেষণ ও নামকরণ করেছে। এটা কোন মতবাদ নয় পরন্ত সত্যকে জানা অর্থাৎ বলা যায় যে তিনি যা পড়েছিলেন, তার থেকে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হয়নি কেবল তিনি যা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জেনেছিলেন তারই স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

হিন্দুধর্মের মধ্যে সবরকম সিদ্ধান্ত সমাবিষ্ট আছে কিন্তু তাদের ব্যাখ্যাকারগণ যা মনে করে তারা সেরূপ পরস্পর-বিরোধী নয়। সেগুলো কেবলমাত্র বিভিন্ন মানসিকতা ও পরিপকতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রণালীর সিদ্ধান্তগত ব্যাখ্যা কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য মানুষের বুদ্ধির অতীত, সেই এক সত্য যাকে মানুষ বুদ্ধি দিয়ে ধরতে পারে না বা মনেও ধারণা করতে পারে না; তা সত্ত্বেও যা মানুষকে ধরে আছে, যার মধ্যে মানুষ সমাহিত হয়ে আছে আর যাতে সে লীন হয় ও একাত্ম হয়ে যায়।

সেমেটিক ধর্মের মত, প্রেম ও ভক্তি দ্বারা সগুণ ঈশ্বর লাভের পথও আছে এমনকি ঈশ্বরের মানব অবতাররূপে রাম বা কৃষ্ণের উপাসনার ধারাও আছে। অন্য কোন ধর্মে ঈশ্বব বা তাঁর অবতারের প্রতি এরূপ ভাবময় প্রেম ও আত্মসমর্পণের কবিতার প্রাচুর্য নেই।

এরূপ সেবার দ্বারা সর্ব প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখে এবং তাদের সেবা ক'রে ঈশ্বরের উপাসনাব প্রণালীও আছে। এতে কিছুটা ভক্তিভাব আর কিছুটা সদাচারেব পদ্ধতি মিশ্রিত, এতে কোন লাভ ক্ষতি বিবেচনা না করে, কেবল ঈশ্বরসেবা ভাবে, বিশুদ্ধ সমর্পণের ভাবে নিজের কর্তব্য পালন করে যাওয়া হয়।

যা হোক প্রত্যেক স্তরেব সত্যকে অস্বীকার না ক'রে, সকল স্তরের সিদ্ধান্তের অতীত বিশুদ্ধ সত্তাকে নিজের আত্মা বলে জানাই সর্বোত্তম ও চরম সত্য। এই সেই অদ্বৈতবাদ যা প্রাচীন ঋষিগণ শিক্ষা দেন. বেদান্ত উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে আর কিছুকাল অবহেলিত হওয়ার পর শ্রীশঙ্কর যাকে স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সব থেকে সরল অথচ সব চেয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণ, সৃষ্টিতত্ত্বের জটিলতার অতীত পরম সত্য। এটাই শ্রীভগবান উপদেশ করতেন। এটা কোন নূতন ধর্ম বা অভিনব সিদ্ধান্ত নয়। কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞানই নূতন নয়, যদি নূতন হয় তবে সত্য নয় কারণ সত্যের কোন পরিবর্তন হয় না। শ্রীভগবান গুরু, তিনি সিদ্ধান্তবাদী ছিলেন না ; এটা কোন সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি বা কোন মতবাদে বিশ্বাস নয়, পরন্তু আন্তর রূপান্তরের দ্বারা সত্য উপলব্ধি। সিদ্ধান্তগত মতবাদ কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক প্রয়াসের ভিত্তি। ভগবান বিশুদ্ধতম ও একান্ত অপরিহার্য সিদ্ধান্তের উপদেশ দিতেন তার কারণ এটাই আত্মানুসন্ধানের প্রত্যক্ষ উপায়ের স্বাভাবিক আধার।

যদি কারও এই প্রত্যক্ষ পথ অত্যন্ত দুর্গম মনে হত আর কেউ যদি এর থেকে সহজ কোন পরোক্ষ সিদ্ধান্তের ওপর স্থাপিত ক্রমপথ অনুসরণ করতে চাইত, তিনি তারও স্বীকৃতি দিতেন। এমন লোকও আছে যারা এক-অদ্বিতীয় আত্মার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে ভয় পায়, পাছে তাদের

সগুণ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা ও শরণ নেওয়া ক্ষুণ্ণ হয়। তাতেও কোন ক্ষতি নেই। যতক্ষণ তারা এরূপ মনে করে ততক্ষণ তারা সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে, যেমন রাম, কৃষ্ণ বা অন্য কোন রূপের উপাসকেরা করে। তাদের ভক্তি যতই আন্তরিক ও একাগ্র হবে ততই তারা অতীন্দ্রিয় মিলনের দিকে এগিয়ে যাবে যেখানে উপাসক ও উপাস্য এক হয়ে যায়।

যতক্ষণ মানুষ তার অহংকারের বাস্তবতার ওপর বিশ্বাস করে ততক্ষণ সে বাহ্য জগতের বাস্তবতা ও তার ওপরে ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করে আর তার জন্য দ্বৈতবাদ ও উপাসনা উপযুক্ত। যদি এটা আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসরণ করা যায় তবে এ জীবনে কিংবা পর জীবনে তাকে অদ্বৈতবাদের সমীপে নিয়ে যায়। যেহেতু এটা পরম লক্ষ্য সেজন্য এটা পথের চরম সীমাও বটে। এটাই শ্রীভগবানের— "সবাইকে শেষ অবধি অরুণাচলে আসতে হবে" বলার প্রকৃত তাৎপর্য। আপাত ত্রিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেছেন "প্রত্যেক ধর্মই তিনটি মূল তত্ত্ব জীব, ঈশ্বর ও জগৎকে প্রতিষ্ঠিত করে। যতক্ষণ ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ এরাও আছে, তা না হলে বলা যায়—

সকল ধর্মের তিনটি আধার
জগৎ, জীব আর ঈশ্বর।
এক সৎই তিন রূপ হয়
এ তিন, তিন যবে রহে অহংকার।
তাই লভিতে পরম ঠাঁই
অহংকারের মূল-নাশ চাই॥" সদ্‌বিদ্যা-২

পাশ্চাত্য সমালোচকেরা প্রধানতঃ জগতের মায়াময় রূপের বিরোধিতা করে আর তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ঠিকই বলে, কারণ জগতের বাস্তবতা ঠিক ততটা, যতটা মানুষের অহংকার। যতক্ষণ না সে তার অহংকারের অবাস্তবতা ধারণা করতে পারছে ততক্ষণ জগতকেও অসৎ ভাবতে পারে না। পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্ত, আমার অহংকারটা

সত্য আর সব মিথ্যা ; এই নিয়ে তারা কিছুকাল নাড়াচাড়া করেছে ; সেটা স্পষ্টতঃই যুক্তিহীন ; কিন্তু অদ্বৈত একথা বলে না। এদের পার্থক্য, একটা স্বপ্নের উদাহরণ দিয়ে বোঝান যায়। জগৎটা মায়া আর আমার অহংকারটা সত্য বলাও যা স্বপ্নের 'আমিটা' সত্য আর যাদের স্বপ্নে দেখা হয় সেই ব্যক্তিসমূহ, স্থানসকল, পরিবেশ ইত্যাদি মিথ্যা বলাও তা ; এটা অসঙ্গত। প্রকৃত অবস্থা হল 'আমি' সমেত সমস্ত স্বপ্নটাই অবাস্তব। অতএব যে মুহূর্তে একজন তার অহংকারের অসত্যতা বুঝতে পারে সেই মুহূর্তেই সে জগতের অবাস্তবতা অনুভব করে, তার আগে নয়। এটা আরও একভাবে ব্যাখ্যা করা যায়— যেমন স্বপ্নটা স্বপ্নকালেই সত্য কিন্তু জাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে মিথ্যা, সেরূপ জগতটা আত্মার প্রকাশরূপে সত্য কিন্তু আত্মার অতিরিক্ত বাস্তব সত্তারূপে মিথ্যা। ভগবান একবার একজন ভক্তের কাছে এরূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন।

> "শঙ্করাচার্যকে তাঁর মায়াবাদের জন্য সমালোচনা করা হয় কিন্তু তাঁর দেওয়া ব্যাখ্যা নেওয়া হয় না। তিনি তিনটি কথা বলেছেন—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্মই জগৎ'। তিনি দ্বিতীয় কথাটি ব'লে থেমে যাননি। তৃতীয় সিদ্ধান্তটি প্রথম তু'টির ব্যাখ্যা ; এর অর্থ হল যখন জগতকে ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু বলে দেখা যায় সেটা মিথ্যা বা মায়া। এর অভিপ্রায় এই যে, সব কিছু যদি আত্মা বলে নেওয়া হয় তাহলে সত্য, আর আত্মার অতিরিক্ত বলে নিলে মিথ্যা।"

যখন একবার শ্রীভগবানকে (শ্রীরমণ বাণী) স্মরণ করান হয় যে, বুদ্ধ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন কথা বলতে অস্বীকার করেন, তিনি সেটা অনুমোদন করেন। "বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে শুষ্ক বিচার করা অপেক্ষা সেই সময়ে সাধকদের পথ প্রদর্শন করতে চাইতেন, এটাই তথ্য।" সুতরাং তিনিও প্রায়ই কৌতূহল মেটাতে অস্বীকার ক'রে প্রশ্নকারীকে সাধনার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন। মানুষের মৃত্যুর পর অবস্থা সম্বন্ধে

প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন "তুমি এখন কি না জেনে মৃত্যুর পর কি হবে জানতে চাও কেন ?" মানুষ বর্তমানে ও জন্ম জন্মান্তরেও এক শাশ্বত অমর আত্মা কিন্তু উপদেশ শোনা ও বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়, এর উপলব্ধির জন্য প্রচেষ্টা চাই। অনুরূপভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রায়ই উত্তর দিতেন, "নিজেকে জানার আগে ঈশ্বর সম্বন্ধে জানতে চাও কেন ? আগে খুঁজে দেখ তুমি কে ?"

যে পদ্ধতিতে এটা করতে হবে তা পরের একটা অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে ; কিন্তু যেহেতু পরের অধ্যায়ে তাঁর ভক্তদের দেওয়া উপদেশের বিবরণ দেওয়া হয়েছে সেজন্য এ বিষয়ের উল্লেখ ও নির্দেশ এখানে দেওয়া হল।

তাঁর উপদেশ দর্শন শব্দের সাধারণ অর্থে নয়, এটা এই তথ্য (পরের অধ্যায়ে শ্রীশিবপ্রকাশ পিল্লাইকে দেওয়া উত্তর) থেকে স্পষ্ট হবে যে, তিনি ভক্তদের সমস্যার সমাধান করার জন্য চিন্তা না ক'রে মনকে চিন্তা শূন্য ক'রে বিশুদ্ধ চেতনা বা অস্তিত্বের বোধ যা আত্মা, তাকে অনুভব করার জন্য নির্দেশ দিতেন। এতে মনে হতে পারে যে এই পদ্ধতি ব্যক্তিকে জড় করে দেবে কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত কথা-বার্তায় তিনি পল ব্রাণ্টনকে বলেছেন যে, উল্টোটাই সত্য। মানুষ আত্মা ও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, কিন্তু মনই একটা পৃথক ব্যক্তি বলে ভ্রম উৎপন্ন করে। সুষুপ্তিতে মন শান্ত হয়ে যায়, মানুষ আত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়, কিন্তু এটা তার অজ্ঞাতসারে হয়। সমাধিতে সে পূর্ণ সচেতন অবস্থায় আত্মার সঙ্গে এক হয় ; অন্ধকারে নয় আলোয়। যদি মনের চঞ্চলতা থেমে যায় তবে গুরু-কৃপায় আত্মবোধ হৃদয়ে জাগ্রত হয়ে সেই আনন্দময় স্বরূপের জন্য সত্তাকে তৈরী করে যা অজ্ঞান বা জড়তা নয় পরন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধ আমিত্ব-বোধ।

অনেকেই হয়ত মনের নাশ বা ব্যক্তিত্বের অবলুপ্তির (যা তারই সমপর্যায়) ধারণায় ভীত হতে পারে তথাপি এটা প্রতিদিনই আমাদের নিদ্রার সময়ে হচ্ছে। যদিও মন নিজের অজ্ঞাতসারে শান্ত হয় তবুও

আমরা ঘুমকে ভয় না ক'রে বাঞ্ছনীয় ও প্রীতিপ্রদ মনে করি। 'তন্ময়তা' বা 'ভাব সমাধিতে' মন ক্ষণিকের জন্য তার প্রকৃত স্বরূপ সেই পরমানন্দ অনুভব করে। এই শব্দগুলোতে ব্যক্তিত্বের অতীত হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করে কারণ তন্ময়তা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তৎ (সেই) ময় হয়ে যাওয়া আর সমাধি শব্দের অর্থ সমাহিত হয়ে যাওয়া। 'শ্বাসরুদ্ধকর' পদের প্রকৃত অর্থ 'মনোরুদ্ধকর' কারণ শ্বাস ও মনের উৎস এক যা শ্রীভগবান প্রাণায়ামের ব্যাখ্যার সময় বলেছেন। প্রকৃত কথা, ব্যক্তিত্ব হারায় না, তার অনন্ত বিস্তার হয়।

চিন্তাশূন্য করার উদ্দেশ্য আরও গভীর বোধে, চিন্তার ওপারে ও অতীতে একাগ্র হওয়া। এতে মনকে দুর্বল করা তো দূরে থাকুক বরং সবল করে কারণ এটি একাগ্রতার শিক্ষা দেয়। শ্রীভগবান বার বার এটি প্রতিপাদন করেছেন। কেবল দুর্বল ও অনিয়ন্ত্রিত মনই অসংলগ্ন চিন্তা ও বৃথা দুর্ভাবনার দ্বারা বিচলিত হয়; যে-কোন বিষয়ে হোক না কেন একাগ্র হওয়ার মত সবল মন তার একাগ্রতাকে আত্মানুসন্ধানের জন্য চিন্তাশূন্য করার কাজে লাগাতে পারে; আর এর বিপরীতক্রমে পদ্ধতি অনুসারে চিন্তাশূন্য করার চেষ্টায় একাগ্রতার শক্তি ও সামর্থ্য বাড়ে। যখন বাঞ্ছিত বস্তু লাভ হয় তখন মনের দক্ষতা নষ্ট হয় না— শ্রীভগবান এটা জ্ঞানীর মনকে মধ্যাহ্ন কালের আকাশে চাঁদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতেন—চাঁদ দেখা যায় কিন্তু যা তাকে প্রকাশিত করে, সেই সূর্য তার থেকে প্রখর থাকায় চাঁদের আলোর প্রয়োজন হয় না।

দশম অধ্যায়

কতিপয় প্রারম্ভিক ভক্ত

শ্রীভগবানের উপদেশের কখন পরিবর্তন হত না তথাপি প্রশ্নকর্তার স্বভাব ও বুদ্ধি অনুসারে তাঁর উপদেশ-ভঙ্গির পার্থক্য দেখা যেত। পাহাড়ে থাকার সময় কয়েকজন ভক্তের অনুভব ও তাদের ব্যাখার প্রতিলেখ রাখা হয়েছিল, নীচে কয়েকটি দেওয়া হল। বস্তুতঃ ভক্তদের অনুভবকেই শ্রীভগবানের জীবনালেখ্য বলা যেতে পারে কারণ তিনি স্বয়ং ঘটনা ও অনুভবের অতীত নির্বিকার স্থিতিতে থাকতেন।

শিবপ্রকাশ পিল্লাই

শিবপ্রকাশ পিল্লাই একজন জ্ঞানমার্গের ভক্ত। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র নিয়েছিল ও সত্তার রহস্য সম্বন্ধে আগেই চিন্তা করেছিল। সে ১৯০০ সালে দক্ষিণ আর্কট জেলায় রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত হয়। দু'বছর বাদে কার্যোপলক্ষে তাকে তিরুভন্নমালাই যেতে হয় ও সেখানে সে পাহাড়বাসী তরুণস্বামীর কথা শোনে। প্রথম দর্শনেই সে মুগ্ধ হয়ে গেল ও তাঁর একজন ভক্ত হল। সে স্বামীকে চোদ্দটি প্রশ্ন করে যেহেতু স্বামী তখন মৌন সুতরাং প্রশ্ন ও উত্তর লিখিত ভাবে হয়। শেষ প্রশ্নটির উত্তর স্বামী একটা শ্লেটে লিখে দিয়েছিলেন, শিবপ্রকাশ পিল্লাই তৎক্ষণাৎ সেটা প্রতিলিপি করে নেয়। বাকী তেরটি প্রশ্ন মন থেকে লেখা হয় কিন্তু প্রকাশিত হওয়ার আগে শ্রীভগবান সেগুলো দেখে দেন।

শিবপ্রকাশ—আমি কে? মুক্তি কি করে লাভ হয়?

ভগবান—'আমি কে' জিজ্ঞাসা-রূপ নিরন্তর আন্তর অন্বেষণে তুমি কে জানতে পারবে আর তাতেই মুক্তি লাভ করবে।

শিবপ্রকাশ—আমি কে ?

ভগবান—প্রকৃত আমি বা আত্মা শরীর নয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটাও নয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণ বা মন কিংবা সুষুপ্তি অবস্থায় যখন এ সব অনুভব হয় না, তাও নয়।

শিবপ্রকাশ—আমি যদি এগুলোর কোনটাই নই, তবে আমি কে ?

ভগবান—যখন এদের প্রত্যেকটিকে 'আমি এটা নই' বলে ত্যাগ করা যায় তখন এদের অতিরিক্ত যা থাকে তাই 'আমি', সেটাই চেতনা।

শিবপ্রকাশ—চেতনার স্বরূপ কি ?

ভগবান—সচ্চিদানন্দ, তাতে বিন্দুমাত্র আমি-চিন্তা নেই। একে মৌন বা আত্মাও বলা হয়। একমাত্র সেটাই আছে। যদি জগৎ, জীব ও ঈশ্বর এই ত্রিপুটির প্রত্যেকটিকে পৃথক মনে করা হয় তবে এরা কল্পিত বস্তু, যেমন 'শুক্তিতে রজত' ভুল হয়। ঈশ্বর, জীব ও জগৎ প্রকৃতপক্ষে শিবস্বরূপ বা আত্মস্বরূপ।

শিবপ্রকাশ—সেই সত্যকে অনুভব হয় কি করে ?

ভগবান—যখন দৃশ্যবস্তু মিলিয়ে যায় তখন দ্রষ্টা বা জ্ঞাতার স্বরূপ প্রকাশ পায়।

শিবপ্রকাশ—বাহ্যবস্তুকে দেখা কালে কি সেই তত্ত্বকে দেখা সম্ভব নয় ?

ভগবান—না, কারণ দ্রষ্টা ও দৃশ্য ঠিক যেন রজ্জু আর তাতে কল্পিত সর্পের মত। যতক্ষণ না সর্পভ্রম চলে যায় ততক্ষণ তুমি বুঝতে পারবে না যে, যা দেখছ সেটা কেবল রজ্জু।

শিবপ্রকাশ—বাহ্যবস্তু কখন লুপ্ত হবে ?

ভগবান—সকল চিন্তা ও ক্রিয়ার কারণ মন লুপ্ত হলেই বাহ্য বিষয়ও লোপ পাবে।

শিবপ্রকাশ—মনের স্বরূপ কি ?

ভগবান—মন কেবল চিন্তা সমষ্টি। এটা এক প্রকার শক্তি। এটা নিজেই সংসাররূপে প্রতিভাত হয়। মন যখন আত্মায় ডুবে যায় তখন আত্মোপলব্ধি হয়, যখন মন বহির্মুখী তখন জগৎ প্রকাশিত হয় আর আত্মানুভব হয় না।

শিবপ্রকাশ—মন লয় হয় কি ক'রে?

ভগবান—কেবল 'আমি কে' অন্বেষণে। যদিও এই অন্বেষণও একটা মানসিক ক্রিয়া তাহলেও এটা সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকে নষ্ট ক'রে মনকেও নাশ করে। এটা ঠিক যেন শবদাহ দণ্ড যার দ্বারা চিতাকে নাড়াচাড়া করা হয়, যখন শব ও চিতা পুড়ে যায় সেটাও ছাই হয়ে যায়। তারপরই আত্মোপ-লব্ধি হয়, আমি-চিন্তা নষ্ট হয়ে যায়, প্রাণ ও অন্যান্য জীবনেব চিহ্ন সংযত হয়। অহংকার ও প্রাণের (শ্বাস) উৎস এক। যে-কোন কাজ হোক না কেন অহংকার ছাড়াই অর্থাৎ 'আমি এটা করছি' ভাব শূন্য হয়ে কর। যখন কেউ এরূপ অবস্থা লাভ করে তখন তার নিজের স্ত্রীও তাব কাছে জগন্মাতা রূপে অনুভূত হয়। প্রকৃত ভক্তি হল আত্মাতে অহংকাব সমর্পণ।

শিবপ্রকাশ—মন নাশ করার আর কি কোন উপায় নেই?

ভগবান—আত্মানুসন্ধান ছাড়া আর কোন উপযুক্ত উপায় নেই। মনকে যদি অন্য কোন উপায়ে স্থির করা হয় সেটা কিছুক্ষণের জন্য শান্ত থাকে আর তারপর আবার জেগে উঠে আগেকার মত সক্রিয় হয়।

শিবপ্রকাশ—আমাদের সমস্ত বৃত্তি ও বাসনা, যেমন আত্মরক্ষার ইচ্ছা, কখন নাশ হবে?

ভগবান—যতই তুমি নিজেকে আত্মাভিমুখী করবে ততই বাসনা ক্ষয় হবে আর অবশেষে সর্বথা লয় হয়ে যাবে।

শিবপ্রকাশ—সত্যই কি আমাদের জন্মজন্মান্তরাগত বাসনাসমূহকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা সম্ভব?

ভগবান—এরূপ সংশয় মনেও এনো না ; দৃঢ়-সঙ্কল্পের সঙ্গে আত্মায় নিমগ্ন হও। যদি অনুসন্ধানের দ্বারা মনকে নিরন্তর আত্মার দিকে ফেরান যায় তবে সেটা অবশেষে লয় হয়ে আত্মায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। যখন তোমার কোন সংশয় হবে, তাকে বিচার করতে যেও না, কিন্তু জানার চেষ্টা কর যে, যার এই সংশয় হচ্ছে সে কে।

শিবপ্রকাশ—একজনকে কতদিন এরূপ অনুসন্ধান করতে হবে ?

ভগবান—যতদিন মনে বিন্দুমাত্র চিন্তাবৃত্তি থাকবে ততদিন অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। যতদিন শত্রু দুর্গ অধিকার ক'রে রয়েছে ততদিন তারা আক্রমণ চালিয়ে যাবে। তুমি যদি প্রত্যেকটি শত্রুকে দুর্গের বাইরে আসামাত্র মেরে ফেল তবে অবশেষে দুর্গের পতন হবে। এরূপে প্রত্যেকবার যখনই একটি চিন্তা মাথা তুলবে তখন তাকে এই অনুসন্ধানের দ্বারা নাশ কর। সমস্ত চিন্তাকে তাদের উৎসে ধ্বংস করাকেই বৈরাগ্য বলে। সুতরাং আত্মোপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত বিচার আবশ্যক। নিরন্তর ও নিরবচ্ছিন্ন আত্মচিন্তা অপরিহার্য।

শিবপ্রকাশ—এই সংসার ও এখানে যা ঘটছে সেগুলো কি ঈশ্বরের ইচ্ছায় নয় ? তাই যদি হয় তবে ঈশ্বর এরূপ ইচ্ছা করলেন কেন ?

ভগবান—ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য নেই। তিনি কোন কর্মফলেও বদ্ধ নন। জগতের ক্রিয়াশীলতায় তিনি প্রভাবিত হন না। সূর্যের উদাহরণ নাও। সূর্য কোন ইচ্ছা, উদ্দেশ্য বা প্রয়াস ছাড়াই উদিত হয় কিন্তু তার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অসংখ্য কর্মব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়, তার কিরণে রাখা আতসী কাচের দ্বারা আগুন উৎপন্ন হয়, কমলকলি প্রস্ফুটিত হয়, জল বাষ্প হয়, প্রতিটি প্রাণী কাজে ব্যস্ত হয়, কর্ম ক'রে চলে ও পরে

ত্যাগ করে। কিন্তু সূর্য এই ক্রিয়াসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, সে নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী, বিধান অনুসারে, কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল সাক্ষীর মত কাজ করে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তাই। কিংবা আকাশেব উদাহরণ নাও, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু সবই তার মধ্যে রয়েছে আর তাতেই রূপান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু তারা কেউ আকাশকে প্রভাবিত কবে না। ঈশ্বরের বেলায়ও তাই। যে সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, উপসংহার ও মুক্তি ইত্যাদিব অধীনে সমস্ত প্রাণী রয়েছে তাতে ঈশ্বরেব কোন ইচ্ছা বা প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরেব বিধানানুসারে জীব তার কর্মফল ভোগ কবে, সুতরাং দায়িত্ব জীবেব, ঈশ্বরের নয়। ঈশ্বরেব কোন কর্মবন্ধন নেই।

"যখন দৃশ্য বস্তুর লয় হয তখনই দ্রষ্টাব প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়", শ্রীভগবানের এই উক্তিটির কেবল শব্দার্থ নিলেই হবে না যে বাহ্য জগতেব জ্ঞান থাকবে না। সেটা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা। এই কথনের গূঢ় তাৎপর্য হল যে, দৃশ্যগুলো বাস্তব সত্য বলে মনে না হযে আত্মার বিভিন্ন রূপ বলে মনে হবে। এটা পববর্তী রজ্জু ও সর্পেব দৃষ্টান্ত দিযে স্পষ্ট করা হযেছে। এটি একটি বহু প্রচলিত দৃষ্টান্ত যা শ্রীশঙ্করও ব্যবহার করেছেন। একজন লোক আলো-আঁধাবে একটা কুণ্ডলীকৃত রজ্জু দেখে সর্প ভ্রমে ভয় পেল। যখন সকাল হল, সে দেখল যে সেটা কেবল একটা পাকান দড়ি আর তার ভয়টা মিথ্যা। সত্তার বাস্তবতা হল রজ্জু আর ভয়-উৎপাদক সর্প টা হল বাহ্য সংসার।

"চিন্তাসমূহকে তাদের উৎসে ধ্বংস করাই বৈরাগ্য"—এই বক্তব্যেরও ব্যাখ্যা করা দরকার। বৈরাগ্যের অর্থ অনাসক্তি, নিঃসঙ্গতা ও সমতা। শিবপ্রকাশ পিল্লাই-এর প্রশ্ন ছিল যে যখন মানুষের প্রবৃত্তি ও বাসনার দমন হয় তখন বৈরাগ্যের উদয় হয় যার জন্য সে চেষ্টা করার আবশ্যকতা অনুভব করেছিল। শ্রীভগবান বস্তুতঃ তাকে এই কথাই বলেছিলেন যে বিচার বা আত্মানুসন্ধানই বৈরাগ্যেব

সব থেকে সোজা ও সরল পথ। প্রবৃত্তি ও বাসনা মনের, অতএব মন সংযত হলে তারাও অবদমিত হয়, আর সেটাই বৈরাগ্য।

কোন কোন সমালোচক মনের লয় হওয়া দরকার ও মনের ক্রিয়ার নাশ হতে হবে উক্তিটির ভুল অর্থ ক'রে একে সুষুপ্তির মত শূন্য অবস্থা বলেছে। স্বভাবতঃ এরূপ সমালোচকেরা এই অবস্থাকে কেন পরমানন্দ সংজ্ঞা দেওয়া হল এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছে। তাদের অসুবিধা ঠিক বৌদ্ধদের নির্বাণ ব্যাখ্যা করার অসুবিধার মত, যার অভিপ্রায়ও ঠিক এই। বস্তুতঃ চিন্তা একটা পরোক্ষ জ্ঞান যা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা আত্মচেতনাকে আবৃত ক'রে আছে। একে সন্ত পল বলতেন "একটা কাচের মধ্যে দিয়ে অল্প দেখা"। একজন জ্ঞানী চিন্তা-শক্তি বা অন্য শক্তি হারায় না। তার মন আগে বলা মধ্যাহ্নকালীন পূর্ণ চন্দ্রের মত, প্রকাশিত কিন্তু তা দেখার কোন কাজে লাগে না।

এই উত্তরগুলো থেকে পরে বিস্তারিত ও সুসংবদ্ধভাবে 'আমি কে ?' নামক পুস্তিকা হয় ; সম্ভবতঃ এটাই শ্রীভগবানের সর্বাধিক প্রশংসিত গদ্য রচনা।

১৯১০ সালের মধ্যে শিবপ্রকাশ পিল্লাই-এর কাছে সরকারী চাকরী বিরক্তিকর ও সাধনার অন্তরায় অনুভূত হতে লাগল। সে চাকরি না করেও গৃহস্থ জীবন যাপন করার মত আর্থিক সঙ্গতি-সম্পন্ন ছিল সুতরাং চাকরিতে ইস্তফা দিলে। তিন বছর বাদে সে একটা প্রকৃত সমস্যার সম্মুখীন হল, তার কাজে ইস্তফা দেওয়া কি সাংসারিক জীবনে বৈরাগ্য কিংবা কেবলমাত্র যা বিরক্তিকর তাকে ত্যাগ ক'রে যা সুখকর তাই নিয়ে থাকা। তার স্ত্রী মারা গেল আর তার সমস্যা হল পুনর্বিবাহ করা বা সাধু হওয়া। তাকে তখন মধ্য বয়সীও বলা যায় না আর একটি মেয়ের প্রতি তার অত্যধিক আসক্তিও ছিল। কিন্তু পুনর্বিবাহে আবার নূতন করে গৃহস্থালির জন্য অর্থেরও প্রয়োজন।

সে প্রথমে এ সম্বন্ধে শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ বোধ করলে : বোধ হয় সে আগেই জানত যে উত্তরটা কি হবে সুতরাং

অন্যভাবে উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করলে। সে চারটি প্রশ্ন একটি কাগজে লিখলে—

(১) সংসারেব সকল দুঃখ-দুর্ভাবনা হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমার কি করা উচিত ?

(২) যে মেয়েটির কথা ভাবছি তার সঙ্গে কি বিয়ে হবে ?

(৩) যদি না হয়, তবে কেন নয় ?

(৪) যদি বিয়ে হয়, প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসবে ?

এই কাগজটা নিয়ে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গেল। সে ছোটবেলা থেকে বিশ্বেশ্বরের উপাসক। কাগজটা দেবমূর্তির কাছে রেখে সারারাত ধরনা দিলে যাতে উত্তরটা কাগজে লেখা হয়.বা কোন চিহ্ন পায় কিংবা কোন দর্শন হয়।

কিছুই হল না আর তার এখন স্বামীব কাছে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় রইল না। সে বিরূপাক্ষ গুহায় গেল তবু প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ বোধ করলে। দিনের পর দিন সেটা স্থগিত হয়ে রইল। যদিও শ্রীভগবান কাউকে সংসার ত্যাগ করতে উৎসাহ দিতেন না, তবুও তার অর্থ এই নয় যে, ভাগ্য যাকে মুক্তি দিয়েছে, তিনি তাকে আবার ইচ্ছাকৃত ভাবে দ্বিতীয়বার সেখানে ফিরে যেতে উৎসাহ দেবেন। শিবপ্রকাশ পিল্লাই-এর ধীরে ধীরে অনুভব হতে লাগল যে, স্বামীর শান্তিময় পবিত্রতা, স্ত্রীলোকের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য ও অর্থের প্রতি পরিপূর্ণ অনাসক্তির দ্বারা তার মনে প্রশ্নের উত্তর এসে গেছে। তার ফিরে যাওয়ার দিন এসে গেল তখনও প্রশ্ন করার সুযোগ হল না। সেদিন অনেক লোক ; যদি জিজ্ঞাসা করতে হয় তবে সবার সামনেই করতে হয়। সে স্বামীর দিকে চেয়ে বসে রইল আর দেখতে দেখতে হঠাৎ সে তাঁর মাথার কাছে একটি জ্যোতির্মণ্ডল দেখলে। আরও দেখলে যে একটি সোনার বরণ শিশু তাঁর মাথা থেকে বেরিয়ে এল, আবার মাথায় ঢুকে গেল। এটা কি তার প্রশ্নের জীবন্ত উত্তর যে সন্তান রক্তমাংসের হয় না আত্মারই হয় ? সে আনন্দে বিভোর হয়ে

গেল। তার এতদিনের সংশয় ও অনিশ্চয়তার পরিসমাপ্তি ঘটল, সে পূর্ণ স্বস্তিতে কেঁদে ফেললে।

যখন শিবপ্রকাশ পিল্লাই অন্য ভক্তদের তার অভিজ্ঞতার কথা বললে, কেউ হাসলে, কেউ অবিশ্বাস করলে. আর কেউ সে নেশা করেছে কিনা সন্দেহ প্রকাশ করলে—এটা শ্রীভগবানের সহজ স্বাভাবিক বাতাবরণের একটা উদাহরণ। তথাপি শ্রীভগবানের পঞ্চাশ ও তার অধিক বৎসর আমাদের মধ্যে থাকা কালে এগুলো নিতান্তই বিরল।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে শিবপ্রকাশ পিল্লাই সেদিন ফিরে যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করলে। পরের দিন সন্ধ্যায় সে যখন শ্রীভগবানের সামনে বসেছিল তখন তার আবার দর্শন হল। এবার শ্রীভগবানের শরার প্রাতঃকালের সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল ও তার চারিপাশে পূর্ণচন্দ্রের দ্যুতি ঝলমল করতে লাগল। তারপব আবার সে দেখল যে তাঁর শরীর ভস্মাচ্ছাদিত ও নয়নে করুণার দৃষ্টি। আবার দুদিন বাদে দর্শন হল, এবার শ্রীভগবানের শরীর যেন বিশুদ্ধ স্ফটিকে গড়া। সে অভিভূত হয়ে গেল, তার সেই স্থান ত্যাগ করতে ভয় হল পাছে হৃদয়ের অবর্ণনীয় আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। সে তার না বলা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে অবশেষে গ্রামে ফিরে গেল। বাকী জীবন ব্রহ্মচর্য করে তপস্যায় কাটিয়ে দিলে। সে তার সমস্ত অভিজ্ঞতা একটি তামিল কবিতায় বর্ণনা করেছে। শ্রীভগবানের স্তুতিমূলক আরও কবিতা সে লিখেছিল, তার কয়েকটি আজও ভক্তগণ গান করে থাকে।

নাটেশা মুদালিয়ার

সকলেই যে শ্রীভগবানের নীরব উপদেশ বুঝতে পারত তা নয়। নাটেশা মুদালিয়ার শেষ অবধি বুঝেছিল কিন্তু তার সেটা বুঝতে অনেক দিন লেগেছিল। সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কালে বিবেকানন্দের বই পড়ে ও গৃহত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নেওয়ার আর গুরু

লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। বন্ধুরা তাকে অরুণাচল পাহাড়ের স্বামীর কথা বলে আর এও বলে যে তাঁর কাছে উপদেশ পাওয়া একরূপ অসম্ভব বললেই হয়। মুদালিয়ার একবার চেষ্টা করবে ঠিক করলে। ১৯১৮ সাল, শ্রীভগবান তখন স্কন্দাশ্রমে, মুদালিয়ার সেখানে গিয়ে তাঁর সামনে বসলে ; শ্রীভগবান নীরব রইলেন। মুদালিয়ার প্রথমে কথা বলার ধৃষ্টতা না করে নিরাশ হয়ে ফিরে এল।

এই চেষ্টায় বিফল হয়ে সে অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করে বেড়ালে, কিন্তু যাকে সে আত্মসমর্পণ করতে পারে এরূপ দিব্যচেতনার উপস্থিতি কারও মধ্যে অনুভব করলে না। দু'বছর ব্যর্থ অন্বেষণে কাটিয়ে, সে মুমুক্ষুদের প্রতি স্বার্থপরের মত উদাসীন না হওয়ার জন্য ও তার প্রথম দর্শন নিষ্ফল হওয়ায় আর একবার তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে শ্রীভগবানকে একটা বড় চিঠি লিখলে। একমাস চলে গেল কোন উত্তর নেই। তারপর সে রসিদ সমেত একটা রেজিস্টারী চিঠি দিলে আর এবার লিখলে "যত জন্মই স্বীকার করতে হোক না কেন আমি একমাত্র আপনার কাছ থেকে উপদেশ নেওয়ার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। যদি আপনি আমায় উপদেশ দানের পক্ষে অপাত্র ও অপরিপক্ক ব'লে এ জীবনে প্রত্যাখ্যান করেন তবে আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে আপনাকেও জন্মগ্রহণ করতে হবে।"

এর কয়েকদিন বাদে শ্রীভগবান তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন "অনবরত আমার কথা চিন্তা করো না। প্রথমে বৃষভেশ্বর মহেশ্বরের কৃপালাভ কর। তাঁর ধ্যান কর ও কৃপা লাভ কর। আমার সহায়তা আপনা হতেই এসে যাবে।" তার বাড়ীতে বৃষভারূঢ় মহেশ্বরের একটি ছবি ছিল, সে সেটিকে তার ধ্যানের অবলম্বন করলে। কয়েকদিন বাদে তার চিঠির উত্তর এল "মহর্ষি চিঠির উত্তর দেন না ; তুমি নিজে এসে দেখা করতে পার।"

সে এ চিঠি যে শ্রীভগবানের অনুমতিক্রমে লেখা হয়েছে সেটা জানার জন্য আর একবার চিঠি লিখলে ও তারপর তিরুভন্নমালাই রওনা দিলে।

স্বপ্নে পাওয়া উপদেশ অনুসারে প্রথমে সে সহরের প্রধান মন্দিরে গেল, সেখানে ভগবান অরুণাচলেশ্বরকে দর্শন করে একরাত্রি কাটালে। সেখানে একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে তার উদ্দেশ্য বিষয়ে নিরুৎসাহ করে বললে "আমার কথা শোন, আমি রমণ মহর্ষির অনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁর কাছে ষোল বছর বৃথা কাটিয়েছি। তিনি সব বিষয়ে উদাসীন। তুমি সেখানে মাথা ভেঙ্গে ফেললেও, কেন কবছ জিজ্ঞাসা করবেন না। তাঁর কৃপা পাওয়া যখন অসম্ভব তখন গিয়ে লাভ নেই।"

শ্রীভগবান তাঁর ভক্তদের কাছে কি চাইতেন এটা তার একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে ভক্তদের চিত্ত উন্মুক্ত হয়েছে তারা তাঁকে মায়ের চেয়েও বেশী স্নেহশীল বলে দেখত। কেউ ভয়ে ও সম্ভ্রমে কম্পিত হত আর যারা কোন বাহ্যিক লক্ষণ দেখতে চাইত তারা কিছুই পেত না। নাটেশা মুদালিয়ার হাল ছেড়ে দেওয়ার মত লোক ছিল না। যেহেতু সে যাওয়ার জন্য মনস্থ করেছে, সেজন্য অন্য লোকটি বললে "যাই হোক, তুমি আর একটা উপায়ে তাঁর কৃপা পাবে কিনা জানতে পার। পাহাড়ে শেষাদ্রিস্বামী নামে আর একজন আছেন, ইনি কারও সঙ্গে মেশেন না, যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায় সাধারণতঃ তাদের তাড়িয়ে দেন। তুমি যদি তাঁর কৃপার কোন চিহ্ন দেখ তাহলে তোমার সাফল্যের শুভ সঙ্কেত বলে ধরে নিতে পার।"

পরের দিন মুদালিয়ার তার সহকর্মী জে. ভি. সুব্রমণীয়া আইয়ারকে নিয়ে সেই দুর্লভ শেষাদ্রিস্বামীর খোঁজে বেরুল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাকে পাওয়া গেল, আর মুদালিয়ারকে আশ্চর্য ও চকিত করে সে নিজেই তাদের কাছে এল। তাদের উদ্দেশ্য বলার আগেই মুদালিয়ারকে সম্বোধন ক'রে বললে, "বাপু হে! তুমি এত চিন্তিত ও দুঃখিত কেন? জ্ঞান কি? যখন মন একটা একটা করে সব বস্তু ক্ষণস্থায়ী ও অসৎ বলে ত্যাগ করে, তা সত্ত্বেও অবশেষে যা পড়ে থাকে তাই জ্ঞান। সেটাই ঈশ্বর। সবই তাই, আর একমাত্র সেই-ই আছে। পাহাড়ে

বা গুহায় গেলে জ্ঞানলাভ করা যাবে এই ধারণায় এখানে ওখানে ঘোরা মূর্খতা। নির্ভয়ে চলে যাও।" এরূপে সে তার কথা নয় বরং শ্রীভগবান ঠিক যে কথাগুলো বলতেন তাই বলে উপদেশ দিল।

এই সৌভাগ্যে আনন্দিত হয়ে তারা স্কন্দাশ্রমে যাওয়ার জন্য পাহাড়ে চড়তে লাগল। তারা যখন পৌঁছাল তখন অপরাহ্ন। চার কি পাঁচ ঘণ্টা মুদালিয়ার শ্রীভগবানের সামনে বসে রইল, কোন কথা হল না; তারপর সন্ধ্যায় ভোজন তৈরী হলে শ্রীভগবান বাইরে যাওয়ার জন্য উঠলেন। জে. ভি. এস. আইয়ার তাঁকে বললে, "এই লোকটি ভগবানকে চিঠিগুলো লিখেছিল।" তাতে শ্রীভগবান মুদালিয়ারের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে তারপর পিছন ফিবে বেরিয়ে গেলেন, তখনও কোন কথা হল না।

মাসের পর মাস মুদালিয়ার প্রতি মাসে একদিন ক'রে আসত আর শ্রীভগবানের সামনে নীরবে প্রার্থনা করত; কিন্তু শ্রীভগবান কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলেন নি আর সেও প্রথমে কথা বলার চেষ্টা করেনি। এইভাবে পুরো একটি বছর চলে গেল, সে আর সহ্য করতে না পেরে একদিন বললে, "আমি আপনার কৃপা পেতে ও অনুভব করতে চাই কারণ নানা লোকে নানা রকম বলে।"

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন, "আমি সর্বদাই কৃপা করছি। তুমি যদি বুঝতে না পার, আমার কি করার আছে?"

এবারও মুদালিয়ার তাঁর মৌন উপদেশ বুঝতে পারলে না, সে তখনও কোন্ পথ অবলম্বন করবে সেবিষয়ে সংশয়াম্বিত। এর অল্পদিন বাদে শ্রীভগবান তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, "তোমার দৃষ্টি একাগ্র কর, বাহ্য ও আন্তর দৃশ্যবস্তু থেকে তুলে নাও। এরূপে ভেদ চলে গেলে, তোমার উন্নতি হবে।" মুদালিয়ারের মনে হল তিনি স্থূল দৃষ্টির কথা বলছেন; সে উত্তর দিলে, "আমার এটা ঠিক পথ মনে হয় না। আপনার মত মহাত্মা যদি এরূপ উপদেশ দেন তবে আমায় আর কে

সঠিক নির্দেশ দেবে?" যাহোক শ্রীভগবান তাকে আশ্বাস দিলেন যে এটাই ঠিক পথ।

পরের ঘটনা মুদালিয়ার নিজেই বর্ণনা করেছে—"আমি স্বপ্নাদিষ্ট উপদেশ কিছুকাল পালন করার পর আবার স্বপ্ন দেখলাম। এবাব শ্রীভগবান আমায় আমার বাবার সঙ্গে দেখা দিলেন আর বাবাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'ইনি কে?' উত্তরটা দার্শনিকভাবে ঠিক হবে না ভেবে একটু ইতস্ততঃ করে উত্তর দিলাম 'আমাব বাবা।' মহর্ষি অর্থপূর্ণ হাসি হাসলেন আর আমি তাড়াতাড়ি বললাম 'আমাব উত্তব সাধারণভাবে, দার্শনিক ভাবে নয়' কারণ আমার তখনও স্মরণ ছিল যে আমি দেহ নই। মহর্ষি আমায় কাছে টেনে নিলেন, প্রথমে তাঁর হাত আমার মাথায় দিলেন আর তারপব আমার ডানদিকেব বুকে একটি আঙ্গুল দিয়ে স্তনাগ্রভাগটি টিপে ধবলেন। এতে কিছু বেদনা অনুভব হলেও তাঁর কৃপা ভেবে নীরবে সহ্য কবলাম। তখনও আমি জানতাম না যে কেন তিনি বাঁ দিকেব বুকে হাত না দিয়ে ডান দিকে দিলেন।"*

এরূপে মৌন দীক্ষা লাভে অসমর্থ হওয়ায়, স্বপ্নে হলেও, তাকে স্পর্শ দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

জ্ঞানলাভের জন্য সমস্ত চেষ্টা ব্যয় করার ইচ্ছায় যারা গৃহত্যাগ ক'রে নিষ্কিঞ্চন ভিক্ষু হতে চায় নাটেশাও তাদের মধ্যে একজন। অন্য সব ক্ষেত্রে যা হয়, শ্রীভগবান তাকেও নিরুৎসাহ করলেন "তুমি এখানে থাকলে যেমন সাংসারিক দুর্ভাবনা ভুলে যাও, বাড়ী গিয়ে সেখানেও তেমনি উদাসীন ও অবিচলিত থাকতে চেষ্টা কর।" মুদালিয়াবের তখনও গুরুর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাব ছিল, সে শ্রীভগবানের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও সন্ন্যাস নিল। সে দেখলে শ্রীভগবান যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি সাধন-ভজনের অসুবিধা কম না হ'য়ে বরং বেড়েই গেল। সে কয়েক বছর বাদে সংসারে

* দ্বাদশ অধ্যায়ে এর কারণ বলা হয়েছে।

ফিরে এল এবং আবার কাজ নিলে। এরপর তার ভক্তি দৃঢ় হয়। সে শ্রীভগবানের স্তুতি ক'রে তামিল কবিতা লিখেছিল। আর অবশেষে সে যা চেয়েছিল সেই মৌখিক উপদেশ অনেকের অপেক্ষা বেশীই পেয়েছিল কারণ 'উপদেশ মঞ্জরী' বই-এ গুরু ও তাঁর কৃপা সম্বন্ধে যে সুন্দর বর্ণনা আছে তার বেশীর ভাগটাই নাটেশার প্রশ্নের উত্তররূপে দেওয়া হয়েছিল।

গণপতি শাস্ত্রী

শ্রীভগবানের ভক্তদের মধ্যে গণপতি শাস্ত্রী সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত, তাকে গণপতি মুনিও বলা হত। আর সংস্কৃত ভাষায় আশু কবি হওয়ার জন্য তাকে 'কাব্যকণ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। যদি তার মধ্যে যশাকাঙ্ক্ষা থাকত তাহলে সে আধুনিক লেখক ও বিদ্বান সমাজের শিরোমণি হত আর যদি তার কামনার সম্পূর্ণ অভাব হত সে আধ্যাত্মিক জগতে মহান গুরু হতে পারত। কিন্তু সে এই দুই-এর মাঝামাঝি থেকে গেল। ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ থাকায় পার্থিব যশঃ ও সফলতার প্রতি তার অনাসক্তি ছিল, তা সত্বেও মানব জাতির উন্নতি ও সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা থাকার ফলে 'আমি কর্তা' এই ভ্রম থেকে সে মুক্তি পায়নি।

তার জন্ম-কাল ১৮৭৮ সালে (শ্রীভগবানের এক বছর আগে)। তার বাবা কাশীতে একটি গণপতি মূর্তির সামনে বসে একটি শিশুকে মূর্তির মধ্য থেকে বেরিয়ে তাঁর কাছে আসতে দেখেন, সেজন্য তিনি তাঁর ছেলের নাম গণপতি রাখেন। প্রথম পাঁচ বছর গণপতি কথা বলতে পারত না আর তার মাঝে মাঝে মৃগীর ব্যারাম হত, তাকে দেখে প্রতিভাশালী বলে মনে হত না। পরে তাকে তপ্ত লোহার দ্বারা চিকিৎসা করা হয় ও তারপর থেকে সে তার প্রতিভার পরিচয় দিতে শুরু করে। দশ বছর বয়সের মধ্যে সে সংস্কৃত ভাষায় কবিতা-রচনা, জ্যোতিষশাস্ত্রের পঞ্জিকা তৈরী এবং সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ অধিগত

করেছিল। চৌদ্দ বছর বয়সে সে পঞ্চকাব্য আব সংস্কৃত ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের মুখ্য গ্রন্থে পারদর্শী হয় এবং রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি আরও কয়েকটি পুরাণ পাঠ শেষ করে। সে ইতিমধ্যে সংস্কৃতে অনর্গল কথা বলতে ও লিখতে পারত। শ্রীভগবানের মত তারও অলৌকিক স্মবণ শক্তি ছিল, সে যা পড়ত বা শুনত মনে রাখতে পারত আর শ্রীভগবানের মত তারও অষ্টাবধানেব অর্থাৎ একই সময় বিভিন্ন বিষয় অনুধাবন করার ক্ষমতা ছিল।

প্রাচীন ঋষিদের কাহিনীর প্রভাব তার ওপর পড়ে ও তাঁদেব অনুসরণ করার তার প্রবল ইচ্ছা হয়। তাব বিবাহেব অনতিবিলম্বে আঠারো বছর বয়সে সে ভাবত-ভ্রমণ, তীর্থদর্শন, মন্ত্রজপ ও তপস্যা শুরু করে। ১৯০০ সালে বাংলাদেশেব নবদ্বীপে এক বিদ্বান সম্মেলনে তাব অদ্ভুত কবি-প্রতিভা ও ন্যায়শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যেব জন্য সে পূর্বকথিত 'কাব্যকণ্ঠ' উপাধি লাভ করে। ১৯০৩ সালে সে তিরুভন্নমালাই আসে ও পাহাড়ে ব্রাহ্মণস্বামীকে দু'বাব দর্শন করে। কিছুকালের জন্য সে তিরুভন্নমালাই থেকে দু'ঘণ্টার পথ ভেলোরে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করে। সেখানে তার বহু শিষ্য হয। তাবা মন্ত্রেব দ্বারা শক্তি লাভ ক'রে সূক্ষ্মভাবে সমস্ত ভারতবাসী তথা মানবজাতিকে উন্নত ও প্রভাবিত করার চেষ্টা করত।

শিক্ষকের জীবন তাকে বেশী দিন ধরে রাখতে পারল না। ১৯০৭ সালে সে আবার তিরুভন্নমালাই এল। ইতিমধ্যে তাব সংশয় হতে শুরু হয়েছে। প্রায় মধ্য বয়স, অদ্ভুত প্রতিভা, বিশাল শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপস্যার দ্বারাও তার সংসার বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ হল না। তার মনে হল সে একটা অচল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। কার্তিকী উৎসবের নবম দিনে হঠাৎ তার পাহাড়ের স্বামীর কথা মনে পড়ল, তিনি নিশ্চয়ই উত্তরটা জানেন, আকাঙ্ক্ষা জাগামাত্র সে কাজ শুরু করলে। সে সেই মধ্যাহ্নের গরমে পাহাড়ে উঠে বিরূপাক্ষ গুহায় এল। স্বামী গুহার বারাণ্ডায় একলা বসে ছিলেন। শাস্ত্রী পায়ে

পড়ে দু'হাতে পা জড়িয়ে ধরলে। ভাবাবেশে অভিভূত হয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললে "যা কিছু পড়ার সব পড়েছি ; বেদান্ত শাস্ত্র সব বুঝেছি ; মনের আশা মিটিয়ে জপ করেছি ; তবু আজ অবধি 'তপ' কি বুঝতে পারলাম না। অতএব আপনার চরণে শরণ নিলাম। কৃপা করে আমায় তপের স্বরূপ কি দেখান।"

স্বামী পনের মিনিট তার দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন তারপর উত্তর দিলেন, "যদি কেউ লক্ষ্য করে দেখে যে 'আমি'টা কোথা থেকে উঠছে, তাতেই মন লীন হয়ে যায় ; সেটাই 'তপ'। যখন কোন মন্ত্র জপ করা হয় তখন যদি কেউ মন্ত্রের শব্দটা কোথা থেকে উঠছে লক্ষ্য করে, তবে মন তাতে লীন হয়ে যায়, সেটাই 'তপ'।"

বলা কথা থেকে যত না হোক স্বামীর অনুকম্পাতে শাস্ত্রীর প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। সে সকল কাজ আবেগের সঙ্গে করত সেজন্য তার পাওয়া উপদেশও তার বন্ধুদের ওজোস্বিনী ভাষায় লিখে জানালে আর সংস্কৃত শ্লোকে স্বামীর প্রশস্তি রচনা করলে। সে পালানীস্বামীর কাছে শুনলে যে স্বামীর নাম 'বেঙ্কটরমণ' আর ঘোষণা করলে যে এখন থেকে এঁকে 'ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষি' বলা হবে। 'রমণ' নামটা ও 'মহর্ষি' তখন থেকেই প্রচলিত হল। লেখা ও ভাষণে তাঁকে 'মহর্ষি' বলে উল্লেখ করা বহুদিন ধরে চলে আসছে। ধীরে ধীরে তাঁর ভক্তেরা তাঁকে 'ভগবান'* বলে সম্বোধন করতে শুরু করলে। 'ভগবানের' অর্থ 'দিব্যসত্তা' বা কেবল 'ঈশ্বর'। তিনি নিজেকে সাধারণতঃ নৈর্ব্যক্তিক ভাবে সম্বোধন করতেন যাতে উত্তম পুরুষ 'আমি' শব্দটা এড়িয়ে যাওয়া যায়। উদাহরণসরূপ, বস্তুতঃ তিনি বলেন নি "আমি কখন সূর্য উদয় হত ও অস্ত যেত জানতাম না।" পঞ্চম অধ্যায়ের বলা কথার ভাবাটা ছিল "কে জানত কখন সূর্য ওঠে আর কখন অস্ত যায় ?" কখন কখন তিনি তাঁর শরীরকে 'এটা' বলতেন। কথা বলার সময়ে ঈশ্বর শব্দ

* তামিল ভাষায় ভগবান শব্দের অর্থ স্বামী আর স্বামী শব্দের অর্থ ভগবান (God)—উত্তর-ভারতের প্রচলিত অর্থের বিপরীত।

থাকলে ভগবান ব্যবহার করতেন আর প্রথম পুরুষে কথা বলতেন। দৃষ্টান্তরূপে, যখন আমার মেয়ে স্কুলে ফিরে যাচ্ছিল তাঁকে বলা হল যে, সে দূরে গেলেও তিনি যেন তাকে স্মরণ করেন, উত্তর হল "যদি কিট্টি ভগবানকে স্মরণ করে, ভগবানও কিট্টিকে স্মরণ করবেন।"

গণপতি শাস্ত্রী শ্রীভগবানকে সুব্রমণীয়াম (কার্তিক)-এর অবতার ভাবতে পছন্দ করত, এতে কিন্তু ভক্তরা তাকে অনুকরণ করতে অস্বীকার করে কারণ তাদের অনুভব ছিল যে শ্রীভগবানকে কোন বিশেষ রূপের অবতার বলা, অসীমকে সীমিত করা। শ্রীভগবানও সমর্থন করতেন না। একবার একজন দর্শনার্থী বলেছিল "লোকে যা বলে শ্রীভগবান যদি সেই সুব্রমণীয়ামের অবতার হন তবে আমাদের অনুমান করতে না দিয়ে, স্পষ্ট বলেন না কেন ?"

তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "অবতার কি ? অবতার ঈশ্বরের কোন একটা বিভাবের প্রকাশ, অপর পক্ষে জ্ঞানী স্বয়ং ঈশ্বর।"

শ্রীভগবানের সঙ্গে এবার দেখা হওয়ার পরে গণপতি শাস্ত্রী তাঁর অপার করুণা অনুভব করলে। সে একদিন তিরুবোথিউরের গণপতি মন্দিরে ধ্যানে বসেছিল। একটু পরে মনে অস্বস্তি বোধ করতে থাকে আর শ্রীভগবানের উপস্থিতি ও নির্দেশের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ শ্রীভগবান মন্দিরে প্রবেশ করলেন। গণপতি তাঁকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলে, সে উঠতে গিয়ে শ্রীভগবানের হাত তার মাথার ওপর রয়েছে অনুভব করলে, সেই স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের মধ্যে শক্তির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে বোধ করলে, সুতরাং সেও স্পর্শের দ্বারা গুরুর অনুকম্পা লাভ করেছিল।

অনেক বছর বাদে এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে শ্রীভগবান বলেছিলেন "অনেকদিন আগে একদিন শুয়েছিলাম ; জেগেই ছিলাম, তখন আমার স্পষ্ট মনে হল যে আমার শরীরটা ক্রমশঃ উঁচুতে উঠে যাচ্ছে ; আমি নীচের দৃশ্যগুলো ক্রমশঃ ছোট হয়ে যেতে দেখলাম ; এক সময় সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার চারদিকে অসীম

জ্যোতির সমুদ্র ঝলমল করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে অনুভব করলাম যে শরীরটা নীচে নামছে আর জাগতিক বস্তুগুলো আবার দেখা যাচ্ছে। সুতরাং এ ঘটনা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম আর এ থেকে অনুমান করলাম যে এই ভাবেই সিদ্ধরা অল্প সময়ের মধ্যে দূর দূর স্থানে যাতায়াত করেন এবং এই ভাবে আবির্ভূত হন ও তিরোধান করেন। যখন শরীরটা মাটিতে নামল তখন মনে হল যে আমি তিরুবোথিউরে রয়েছি ; যদিও আমি আগে সে জায়গা কখনো দেখিনি তবু আমি নিজেকে একটা বড় রাস্তায় দেখলাম ও চলতে লাগলাম। রাস্তার একটু দূরে একটা গণপতি মন্দির ছিল, আমি তার ভিতর প্রবেশ করলাম।"।

এই ঘটনাটি শ্রীভগবানের জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এটির বৈশিষ্ট্য হল যে, ভক্তের দুঃখ বা ভক্তি অনৈচ্ছিকভাবে তাঁকে সাহায্য বা প্রতিকারের জন্য ডেকে আনে, যাকে অলৌকিক ঘটনা বলা হয়। আর এও একটা বৈশিষ্ট্য যে সমস্ত শক্তি তাঁর পায়ের তলায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ক্ষমতা ছাড়া তিনি কখনও কোন সূক্ষ্ম শক্তি প্রয়োগের আগ্রহ দেখান নি। ভক্তের প্রার্থনায় এরূপ ঘটনা ঘটে গেলে বালক-সুলভ সরলতার সঙ্গে বলতেন, "মনে হয় সিদ্ধরা এরকম করেন।"

গণপতি শাস্ত্রী ঠিক এই উদাসীনতার ভাবটা লাভ করতে পারেনি। সে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, "কেবল 'আমি চিন্তার' উৎস খুঁজলেই কি আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাব কিংবা এর সঙ্গে 'মন্ত্রধ্যান'ও করতে হবে।" সব সময় তার ছিল এক চিন্তা—এক লক্ষ্য আর কামনা, দেশের পুনরুত্থান ও ধর্মের অভ্যুদয়।

শ্রীভগবান সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "প্রথমটাই যথেষ্ট।" যখন শাস্ত্রী তবুও তার লক্ষ্য ও আদর্শের কথা বলে চললে, তিনি যোগ দিলেন, "তুমি যদি সমস্ত ভার ঈশ্বরের ওপর সমর্পণ কর তাহলে ভাল হয়। তিনিই সব ভার নেবেন আর তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। তিনি তাঁর কাজ করবেন।"

১৯১৭ সালে গণপতি শাস্ত্রী ও অন্যান্য ভক্তরা শ্রীভগবানকে কতকগুলো প্রশ্ন করে, সেই প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো 'শ্রীরমণ গীতা' নামে বই-এ সংগৃহীত হয়। এই পুস্তকে তাঁর পাণ্ডিত্য ও সিদ্ধান্তমূলক জ্ঞান অন্যান্য বই-এর থেকে বেশী স্পষ্ট। গণপতি শাস্ত্রী স্বভাবসুলভ একটি প্রশ্ন করে যে, একজন যদি বিশেষ সিদ্ধি লাভের চেষ্টার সময় জ্ঞানলাভ করে তাহলে কি তার কামনাও পূর্ণ হয়ে যাবে? শ্রীভগবানের সূক্ষ্ম ও তৎপর পরিহাস আর কোথাও এত পরিস্ফুট হয়নি যা এখানে তাঁর উত্তরে হয়েছিল "যদি যোগী কোন সিদ্ধি লাভের প্রচেষ্টায় জ্ঞান লাভ করে সে ইতিমধ্যে তার কামনা পূর্ণ হলেও বিশেষ হর্ষিত হয় না।"

১৯৩৬ সালের কাছাকাছি খড়গপুরের কাছে নিমপুর গ্রামে গণপতি শাস্ত্রী তার শিষ্যদের নিয়ে বসবাস করে ও সেই সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দু'বছর তপস্যা করে। শাস্ত্রীব মৃত্যুর পর একবার শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সে জীবিত কালে আত্মোপলব্ধি করেছিল কিনা, তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "কি করে হবে? তার সঙ্কল্প অতি প্রবল ছিল।"

এফ. এইচ. হামফ্রিস্

শ্রীভগবানের এই প্রথম পাশ্চাত্য ভক্তটি ১৯১১ সালে ভারতে আসার পূর্বে অতীন্দ্রিয় সিদ্ধির সঙ্গে পরিচিত ছিল। সে মাত্র একুশ বছর বয়সে ভেলোরে পুলিস বিভাগে চাকরি নিয়ে আসে। সে নরসিংহায়া নামে একজনকে তেলেগু শেখাবার জন্য নিযুক্ত করে ও প্রথমদিনই তাকে হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর একটা ইংরাজী বই এনে দিতে বলে। একজন শ্বেতকায় ইংরাজের পক্ষে বিচিত্র প্রার্থনা—যা হোক নরসিংহায়া রাজী হয় ও পুস্তকাগার থেকে বইটা এনেও দেয়। পরের দিন হামফ্রিস্ আর একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করে, "তুমি এখানে কোন মহাত্মাকে জানো?"

নরসিংহায়া সংক্ষেপে উত্তর দিলে যে সে জানে না। কিন্তু এত সহজে তার মুক্তি হল না, কারণ পরের দিন হামফ্রিস্ বললে, "তুমি

গতকাল বলেছ না যে কোন মহাত্মাকে জানো না? দেখ, আজ সকালে ঠিক ঘুম থেকে ওঠার আগে আমি তোমার গুরুকে দেখেছি। তিনি আমার পাশে বসলেন আর আমায় কিছু বললেন, সেটা অবশ্য আমি বুঝতে পারিনি।"

নরসিংহায়ার তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না দেখে হামফ্রিস্ বলে যেতে লাগল, "ভেলোরের প্রথম যে লোককে আমি বোম্বাইতে দেখি, সে হল তুমি।" নরসিংহায়া আপত্তি করলে যে সে কখন বোম্বাই যায়নি, কিন্তু হামফ্রিস্ বুঝিয়ে বললে যে, সে বোম্বাই পৌঁছাতেই তাকে তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে যেতে হয়। যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে ভেলোরের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করে। অসুস্থ না হলে বোম্বাই আসামাত্র সেখানেই তার যাওয়ার কথা ছিল। সে সূক্ষ্ম শরীরে ভেলোরে পৌঁছায় ও নরসিংহায়াকে দেখে।

নরসিংহায়া সোজাসুজি বললে যে, সে সূক্ষ্মশরীর কি জানে না আর ভৌতিক শরীর ছাড়া অন্য কিছুই জানে না। যা হোক স্বপ্নের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য সে পরের দিন অন্য একজন পুলিস অফিসারকে পড়াতে যাওয়ার আগে হামফ্রিসের টেবিলে এক গোছা ফোটো রেখে গেল। হামফ্রিস্ সেগুলো দেখলে আর গণপতি শাস্ত্রীর ছবিটি তুলে নিলে। তার শিক্ষক ফিরে আসতেই বললে "এই যে! ইনিই তোমার গুরু।"

নরসিংহায়া স্বীকার করলে। এরপর হামফ্রিস্ আবার অসুস্থ হল আর তাকে স্বাস্থ্যলাভের জন্য ওট্‌কামণ্ড যেতে হল। কয়েক মাস বাদে সে ভেলোরে ফিরে এল। ফিরে এসে সে আবার নরসিংহায়াকে আশ্চর্য করলে, এবার তার স্বপ্নে দেখা একটি হাতে আঁকা পাহাড়ের গুহার ছবি, যার সামনে দিয়ে একটি ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে আর গুহার সামনে একজন মহাত্মা দাঁড়িয়ে আছেন। এটা কেবল বিরূপাক্ষ গুহা হওয়াই সম্ভব। এখন নরসিংহায়া তাকে শ্রীভগবানের কথা বললে। হামফ্রিস্‌কে গণপতি শাস্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, তারও শাস্ত্রীর প্রতি

খুব শ্রদ্ধা হল। সেই মাসেই ১৯১১ সালের নভেম্বরে তিনজন তিরুভন্নমালাই রওনা হল।

শ্রীভগবানের মহামৌন সম্বন্ধে হামফ্রিসের প্রথম অনুভূতি আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। যে চিঠি থেকে সেটা নেওয়া হয়েছে, তাতে সে আরও লিখেছিল যে "সব থেকে হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য হল ছোট ছোট সাত আট বছরের ছেলে মেয়েদের তাদের ইচ্ছামত পাহাড়ে উঠে মহর্ষির কাছে এসে বসা; তিনি হয়ত কোনদিন তাদের সঙ্গে একটাও কথা বলেন না কিংবা চোখ খুলেও দেখেন না। তাবা খেলা করে না, কেবল স্থির হয়ে শান্তিতে বসে থাকে।"

গণপতি শাস্ত্রীর মত হামফ্রিস্‌ও মানবজাতিব উন্নতির জন্য উৎসুক ছিল।

হামফ্রিস্—স্বামী, আমি কি সংসারকে সাহায্য করতে পারি?

ভগবান—নিজেকে সাহায্য কর, তাহলেই সংসারের সাহায্য হবে।

হামফ্রিস্—আমি সংসারকে সাহায্য করতে চাই। আমি কি এর সাহায্যকারী হব না?

ভগবান—হাঁ, নিজের উপকার কবলেই সংসারেরও হয়। তুমিই সংসারে আছ, তুমিই সংসার, তুমি সংসার ছাড়া পৃথক নও কিংবা সংসারটা তোমার থেকে ভিন্ন নয়।

হামফ্রিস্ (একটু থেমে)—স্বামী! আমি কি শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুর মত অলৌকিক ঘটনা করতে পারি?

ভগবান—যখন ঘটনা ঘটেছিল তাঁরা কেউ কি তখন অনুভব করেছিলেন যে এটা তাঁরা করছেন?

হামফ্রিস্—না, স্বামী।

হামফ্রিসের দ্বিতীয় বার দর্শনের আর বেশী বিলম্ব হয়নি।

"আমি মোটর সাইকেল করে গিয়েছিলাম আর পাহাড়ে চড়ে গুহায় গেলাম। মহাত্মা আমায় দেখে একটু মৃদু হাসলেন কিন্তু একটুও

আশ্চর্য হননি। আমরা ভিতরে গেলাম, বসার আগে তিনি আমায় একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলেন, সেটাও তিনি জানতেন। প্রথমতঃ আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলেন। যারা তাঁর কাছে আসে তারা সবাই যেন ঠিক খোলা পাতা, প্রথম দৃষ্টিতেই তিনি তাদের সব জানেন।

"তোমাব এখনও খাওয়া হয়নি ; খিদে পেয়েছে," তিনি বললেন।

"আমি স্বীকাব করলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ একজন চেলাকে (ভক্ত) ডেকে ভাত, ঘী, ফল ইত্যাদি আনতে বললেন। ভারতীয়রা চামচ ব্যবহার করে না, হাত দিয়ে খায়। যদিও আমি অভ্যাস করেছি তবু ভালভাবে খেতে পারছিলাম না। সুতরাং তিনি আমায় একটা নারিকেলের মালার তৈরী চামচ দিলেন। তিনি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন ও মাঝে মাঝে কথা বলছিলেন, তাঁর হাসির মত আর কোন সুন্দর বস্তু তুমি জগতে কল্পনা করতে পারবে না। আমায় সাদা রঙের দুধেব মত সুস্বাদু নারিকেলের জল পান করতে দেওয়া হল, তাতে তিনি নিজে একটু চিনি মিশিয়ে দিলেন।

"খাওয়ার পরও আমার ক্ষুধা মেটেনি, সেটা তিনি জানতেন, সুতরাং আরও খাবার আনার জন্য বললেন। তিনি সবই জানতেন। পুরো খাওয়া হয়ে গেলে অন্যেরা যখন আমায় ফল খাওয়ার জন্য অনুরোধ করছিল, তিনি তাদের নিষেধ করলেন।

"আমার জলপানের রীতির জন্য ক্ষমা চাইতে হল। তিনি বললেন 'কিছু ভেবো না।' হিন্দুরা এ বিষয়ে খুবই সাবধানী, তারা কখন নিজের ঠোঁট দিয়ে পানপাত্র স্পর্শ করে না, জলটা সরাসরি গলায় ঢেলে দেয়। এভাবে একটা পাত্র থেকে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে সকলে জলপান করতে পারে।

"আমি যখন খাচ্ছিলাম, তিনি অন্যদের আমার পূর্ব-

ইতিহাস বলছিলেন, সেগুলো সবই ঠিকঠিক। কিন্তু তিনি আমায় মাত্র একবার দেখেছেন আর ইতিমধ্যে হয়ত শত শত ভক্তকে দেখেছেন। মনে হল যেন চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি দূরদর্শন-সম্পন্ন হয়ে গেলেন, আমরা যেমন একটা বিশ্বকোষ খুলে পড়ে যাই ঠিক তেমনি। আমি তিন ঘণ্টা তাঁর উপদেশ শুনলাম।

"পরে গরমে এতখানি আসার জন্য আমার পিপাসা পায় কিন্তু আমি কিছুতেই সে কথা বলতাম না! তথাপি তিনি জানতে পারলেন আর একজনকে লেমনেড আনতে বললেন।

"শেযে বিদায় নেওয়ার সময় এল আর আমি আমাদের প্রথামত মাথা নীচু করে বিদায় নিয়ে জুতা পরার জন্য গুহার বাইরে এলাম। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলেন আর আবার আসতে বললেন।

"আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁর সান্নিধ্যে একজনের কি পরিমাণ পরিবর্তন হয়!"

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কেউ তাঁর সামনে খোলা বই-এর মত হয়ে যেত, তা সত্ত্বেও হামফ্রিসের 'দূরদর্শন' সম্বন্ধে ধারণা সম্ভবতঃ ভুল। যদিও শ্রীভগবান লোকেদের সাহায্য ও পথনির্দেশের জন্য তাদের অন্তর অবধি দেখতেন, তথাপি তিনি সেই শক্তি সাধারণ ভৌতিক স্তরে কখন ব্যবহার করেননি। বই-এর মত, লোকের চেহারা সম্বন্ধেও তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। হাজার হাজার দর্শনার্থী তাঁর কাছে এসেছে, তিনি একজন ভক্তকেও ভুলতেন না। এমনকি বহু বছর পরে এলেও চিনতে পারতেন। কিংবা ভক্তের ইতিবৃত্তও ভুলে যেতেন না। নরসিংহায়া নিশ্চয়ই হামফ্রিসের সম্বন্ধে বলে থাকবে। যদি কোন বিষয়ে কিছু না বলা যুক্তিযুক্ত হত, সেখানে তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বিবেচনার পরিচয় দিতেন কিন্তু সাধারণতঃ তিনি বালকের মত

সরল ও সহজ ছিলেন আর বালকের মত কারও সম্বন্ধে তার মুখের সামনেই নিঃসঙ্কোচে ও তাকে লজ্জিত না করেই বলে দিতেন। আর পান-ভোজন সম্বন্ধে তিনি যে কেবল সুবিবেচক ছিলেন তাই নয় পরন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্নও ছিলেন, অতিথির তৃপ্তি হল কিনা দেখতেন।

হামফ্রিসের কিছু অলৌকিক সিদ্ধির প্রকাশ হতে আরম্ভ হয়, কিন্তু শ্রীভগবান তাতে আসক্ত না হতে সাবধান করেন আর সে-ও এই প্রলোভন কাটিয়ে ওঠার মত প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ছিল। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের প্রভাবে তার সিদ্ধি বিষয়ে সব আগ্রহ চলে যায়।

তাছাড়া সে কেবল যে বাহ্যিক ক্রিয়াশীলতার দ্বারাই মানবজাতির সাহায্য করা যায় এই ভুল ধারণা যা পাশ্চাত্য দেশের সর্বত্র আর বর্তমান যুগে প্রাচ্যেও দেখা যাচ্ছে, তা কাটিয়ে উঠেছিল। তাকে বলা হয়েছিল যে, নিজেকে সাহায্য করলেই তার জগতকে সাহায্য করা হয়, কারও বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অর্থনৈতিকভাবে ভুল হলেও ঠিক মনে করা হয়; কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এটা বাস্তব সত্য কারণ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে একজনের সম্পদ বৃদ্ধি হলে অন্যের হ্রাস হয় না, পরন্তু বৃদ্ধিই হয়। সে তার প্রথম দর্শনকালে শ্রীভগবানকে দেখেছিল যেন "একটি নিশ্চল শব যার মধ্য থেকে ঈশ্বরের প্রকাশ তীব্রভাবে বিকীর্ণ হচ্ছে", সেরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি তার ক্ষমতানুসারে অদৃশ্য প্রভাবের প্রসারণ কেন্দ্র। একজন যতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও অহংকারশূন্য, বাইরে কর্মরত হোক বা না হোক সে অনৈচ্ছিক ও অনিবার্য ভাবে সামঞ্জস্য প্রসার করে। অপর পক্ষে একজন বিক্ষুব্ধ ও অহংমন্যতাপূর্ণ হলে সে বাইরে সেবার কাজ করলেও অশান্তিই প্রসার করে।

যদিও হামফ্রিস্ শ্রীভগবানের সঙ্গে বাস করেনি, কেবলমাত্র তাঁকে কয়েকবার দর্শন করেছিল তথাপি সে তাঁর শিক্ষা পূর্ণভাবে গ্রহণ করে ও অনুগ্রহভাজন হয়। সে তার একজন বন্ধুকে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠায় যা পরে ইণ্টারন্যাশনাল সাইকিক্ গেজেটে প্রকাশিত হয়। এতে শ্রীভগবানের শিক্ষার সার নিহিত আছে।

"গুরু সেই ব্যক্তি, যিনি কেবলমাত্র ঈশ্বর চিন্তা করেন ; তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বরের অসীম সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে, ডুবিয়ে দিয়ে, বিলুপ্ত করে, কেবলমাত্র ঈশ্বরের হাতেব যন্ত্র হয়েছেন। তাঁর যখন মুখ খোলে তখন অনায়াসে ও স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে ঈশ্বরের বাণী নিঃসৃত হয আর তিনি যখন হাত নাড়েন ঈশ্বরের শক্তি তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়ে অলৌকিক ক্রিয়া করে।

"মনের শক্তির সম্বন্ধে বেশী ভেবো না। এদের সংখ্যা অনন্ত আর সাধকের হৃদয়ে একবার এদের বিষয়ে বিশ্বাস হলেই এদের কার্যসিদ্ধি হয়ে যায়। দূরদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি অন্যান্য সিদ্ধি অকিঞ্চিৎকর কারণ এগুলো পাওয়া অপেক্ষা না পাওয়াতেই মহান জ্ঞান ও শান্তি লাভ করা সম্ভব। গুরু এগুলোর লাভকে আত্মবলিদান বলেই মনে করেন।

"যে ব্যক্তি দীর্ঘ অভ্যাসে ও প্রার্থনায় বিভিন্ন যোগসিদ্ধি লাভ করেছে সেই গুরু, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কোনও প্রকৃত গুরু এই সকল যোগসিদ্ধিব জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করেন না কাবণ এগুলো তাঁর দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজে লাগেনা।

"ব্যবহারিক জীবনে আমরা যা কিছু দেখি সেগুলো অদ্ভুত ও চমৎকার. কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়টিকে অর্থাৎ সেই একমাত্র অসীম শক্তি যে এই—

(ক) দৃশ্য হয়েছে ও

(খ) দেখার কাজের জন্য দায়ী, তাকে আমরা অনুভব করি না।

"পরিবর্তনশীল জীবন, মৃত্যু ও ঘটনা-পরম্পরার ওপর মনোযোগ দিও না। এমনাক এইসব দেখা বা পর্যবেক্ষণ করার কাজের ওপরও মন দিও না কিন্তু যে এই সব দেখে আর এ-সবের জন্য দায়ী তার ওপর মনোযোগ দাও। প্রথম

প্রথম এটা প্রায় অসম্ভব মনে হবে কিন্তু ক্রমশঃ এটার ফল অনুভব হবে। এর জন্য বছরের পর বছর নিত্য ও নিরন্তর অভ্যাস প্রয়োজন আর এভাবেই গুরু তৈরী হয়। যে দ্রষ্টা তার ওপর দৃঢ়ভাবে মনস্থির করার চেষ্টা করো। এটি তোমার অন্তরে। এর জন্য হামফ্রিসের অপেক্ষা করো না।”

শ্রীভগবান তাকে চাকরি ও ধ্যানধারণা দুই-ই করার পরামর্শ দেন। কয়েক বছর সে তাই করে, পরে সে অবসর গ্রহণ করে। সে আগে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ছিল আর সকল ধর্মের ঐক্যে বিশ্বাস করত সুতরাং সে ধর্মান্তর গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করেনি ; ইংলণ্ডে ফিরে যায় ও সেখানে একটি মঠে প্রবেশ করে।

থিয়সফিস্ট

শ্রীভগবানের সহিষ্ণুতা ও সহৃদয়তাও লক্ষ্য করার মত। তিনি যে কেবল সকল ধর্মের সত্যকে স্বীকার করতেন, যা সব আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন লোকেরাই করে, তা নয় উপরন্তু যদি কোন মতাবলম্বী বা সম্প্রদায় বা আশ্রম আধ্যাত্মিকতা প্রসারের চেষ্টা করত তাহলে তাদের পদ্ধতি তাঁর থেকে বা পুরাতন পন্থা থেকে যত ভিন্ন হোক না কেন তাদের শুভ প্রচেষ্টার প্রশংসা করতেন।

তিরুভন্নমালাই-এর সরকারী কর্মচারী রাঘবাচারিয়ার মাঝে মাঝে শ্রীভগবানকে দর্শন করতে আসত। সে থিয়সফিকাল সোসাইটির সম্বন্ধে শ্রীভগবানের মত জানতে চেয়েছিল কিন্তু সে যখনই যেত তখন সেখানে ভক্তের ভিড় থাকত ও তাদের সামনে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ বোধ করত। একদিন সে তিনটি প্রশ্ন করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তাঁর কাছে গেল। তার ভাষায় ঘটনার বর্ণনা—

“প্রশ্নগুলো এই রকম—

১। আপনি আমায় ব্যক্তিগত কথাবার্তার জন্য একান্তে কয়েক মিনিট সময় দিতে পারেন ?

২। আমি থিয়সফিকাল সোসাইটির সদস্য, তাদের সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে চাই।

৩। আমি যদি দেখার উপযুক্ত হই তবে আপনার প্রকৃত রূপ আমায় কৃপা করে দেখাবেন কি ?

"যখন আমি সেখানে গিয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম তখন সেখানে প্রায় তিরিশ জন লোক ছিল কিন্তু একে একে সবাই চলে গেল। সুতরাং আমি একলাই সেখানে রইলাম। না বলা সত্ত্বেও আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর এসে গেল। এটা আমার খুব আশ্চর্য বোধ হল।

"তারপর তিনি নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন যে আমার হাতের বইখানা গীতা কিনা আর আমি থিয়সফিকাল সোসাইটির সভ্য কিনা। আমার উত্তর দেওয়ার আগেই মন্তব্য করলেন 'ওরা বেশ ভাল কাজ করছে।' আমি তাঁর প্রশ্নের সম্মতিসূচক উত্তর দিলাম।

"আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাওয়ায় আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তৃতীয়টির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর মুখ খুললাম ও বললাম 'অর্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত রূপ দর্শন করতে চেয়েছিল আর সেই দর্শনের জন্য প্রার্থনা করেছিল, আমিও যদি যোগ্য হই তবে আপনার প্রকৃত স্বরূপ দেখতে চাই।' তিনি তখন একটি বেদীর ওপর বসেছিলেন আর তাঁর পিছনের দেওয়ালে একটি দক্ষিণামূর্তির ছবি আঁকা ছিল। তিনি যথারীতি নীরবে চেয়ে রইলেন আর আমিও তাঁর চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর আমার চোখের সামনে থেকে তাঁর শরীর ও দক্ষিণামূর্তির ছবি অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখের সামনে কেবল একটা শূন্যতা এমন কি দেওয়ালটাও নেই। তারপর আমার চোখের সামনে মহর্ষি ও দক্ষিণামূর্তির আকারে

একটা সাদা মেঘ এল। ক্রমশঃ সেই আকারের (রূপালী লাইন দেওয়া) রেখাচিত্র স্পষ্ট হল। তারপর চোখ, নাক ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল রেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই রেখাগুলো ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে মহর্ষি ও দক্ষিণামূর্তির আকৃতি রূপে অতি উজ্জ্বল ও অসহনীয় জ্যোতিতে ঝলমল করতে লাগল, ফলে আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর তাঁকে ও দক্ষিণামূর্তিকে স্বাভাবিক রূপে দেখলাম। আমি দণ্ডবৎ করে চলে এলাম। এই দর্শনের প্রভাব আমার ওপর এতই তীব্র হয়েছিল যে আমি এরপর একমাস তাঁর কাছে যেতে সাহস করিনি। একমাস পরে গিয়ে দেখলাম যে তিনি স্কন্দাশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে বললাম 'আমি একমাস আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আর এই অনুভব হয়।' এই বলে সব বর্ণনা দিলাম। তাঁকে একটা ব্যাখ্যাও করতে বললাম। একটু থেমে তিনি বললেন 'তুমি আমার রূপ দেখতে চেয়েছিলে, তুমি আমায় অদৃশ্য হতে দেখলে, আমি নিরাকার। সুতরাং এই অনুভবটাই প্রকৃত সত্য। পরের দর্শনগুলো তোমার ভগবদ্‌গীতা পড়ার ফলে তোমার ধারণা অনুযায়ী। কিন্তু গণপতি শাস্ত্রীরও এরূপ অনুভব হয়েছিল' তুমি তার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করতে পার।' আমি শাস্ত্রীর সঙ্গে আর আলোচনা করিনি। এরপর মহর্ষি বললেন 'দর্শক ও ভাবক-রূপ যে 'আমি' সে কে ও কোথায় থাকে, তার খোঁজ কর'।"

একজন অজ্ঞাত ভক্ত

একজন দর্শনার্থী বিরূপাক্ষ গুহায় এল। যদিও সে মাত্র পাঁচদিন সেখানে ছিল তথাপি সে স্পষ্টতঃই শ্রীভগবানের অপার করুণা লাভ

করেছিল। সেজন্য 'আত্মোপলব্ধি' নামে শ্রীভগবানের জীবন-চরিতেব লেখক নরসিংহস্বামী তার নাম ও ঠিকানা খুঁজে বার করার চেষ্টা করে। এই বই-এর আধারে বর্তমান বইটি লেখা হয়েছে। তার মধ্যে একটা অপূর্ব উল্লাস ও সৌম্যতা ছিল আর শ্রীভগবানের করুণার পূর্ণ দৃষ্টি তাব ওপর বর্ষিত হয়েছিল। প্রতিদিন সে একটি করে স্বতঃস্ফূর্ত, ব্যঞ্জ ামর, আনন্দঘন, ভক্তিপূর্ণ শ্রীভগবানের প্রশস্তি গীত তামিল ভাষায় রচনা করত। তার রচিত গানের মধ্যে আজও কয়েকটি গাওয়া হয়। পরে নরসিংহস্বামী তার সম্বন্ধে আরও বিশদ ভাবে খোঁজ নেওয়ার জন্য তার দেওয়া ঠিকানা 'সত্য মঙ্গলম্' সহরে যায় কিন্তু সেখানে এরূপ কোন লোকের খোঁজ পাওয়া যায় নি। 'সত্য মঙ্গলম্' এর অর্থ 'আনন্দধাম', বলা হয় যে সেই লোকটি কোন গুপ্ত 'আনন্দধাম' থেকে এসে এ যুগের সদ্‌গুরুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান কবে গিয়েছিল।

তারই একটি গানে শ্রীভগবানকে 'রমণ সদ্‌গুরু' সম্বোধন করা হয়েছে। একবার যখন এই গানটি গাওয়া হচ্ছিল শ্রীভগবানও যোগ দিলেন। যে ভক্তটি গাইছিল সে হেসে বললে "এই প্রথম আমি একজনকে দেখলাম যিনি নিজের প্রশস্তি গাইলেন।"

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন, "রমণকে এই ছ'ফুটের মধ্যে সীমিত কব কেন? রমণ বিশ্বব্যাপী।"

পাঁচটি গানের মধ্যে একটি গানে উষাব আগমন ও জ্ঞানের জাগরণ এত সুন্দর ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে এটা বিশ্বাস করা সহজ যে গীতকারের জীবনেও বস্তুতঃ উষার উদয় হয়েছিল।

ধরণীধরে উষার উদয়,
মধুর রমণ এ—সো—!
অরুণাচলেশ্বর এ—সো—!
কুঞ্জে উঠিছে কোকিলের রব,
গুরুদেব রমণ এ—সো—!
জ্ঞানময় প্রভু এ—সো—!

শঙ্খ বাজিল, তারকা মুদিল,
মনোহর রমণ এ—সো— !
দেবাধিদেব রমণ এ—সো— !

মোরগে পাখীতে করে কলধ্বনি,
হয়েছে সময় এ—সো— !
রাতি পোহাইল এ—সো— !

শিঙ্গা বাজে, বাজিছে মাদল,
হিরণ্ময় রমণ এ—সো— !
জ্ঞান জাগরণ এ—সো— !

কাকের ধ্বনি ঊষা আগমনী,
সর্পমালী স্বামী এ—সো— !
নীলকণ্ঠ প্রভু এ—সো— !

অজ্ঞান নিবারণ, পদ্ম বিকাসন *
প্রজ্ঞানঘন রমণ এ—সো— !
বেদ শিরোমণি এ—সো— !

গুণাতীত মুক্তি দাতা,
করুণাময় রমণ এ—সো— !
শান্তি স্বরূপ, প্রভু এ—সো !

জ্ঞানময় পরব্রহ্ম,
সচ্চিদানন্দ ধাম,
নৃত্যপর নটরাজ এ—সো !

প্রেমময় জ্ঞানাত্মন,
সুখ দুঃখাতীত এ—সো !
আনন্দঘন মৌন এ—সো !

———

* হৃদয় পদ্ম বিকাসন

একাদশ অধ্যায়

জীবজন্তু

হিন্দুধর্মে বলা হয় (উদাহরণ—শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত ভগবদ্গীতার ভাষ্য পঞ্চম অধ্যায় ৪০-৪৪ শ্লোক) যে, যে জীবাত্মার আত্ম-সাক্ষাৎকার ক'রে পৃথক ব্যক্তিত্বের ভ্রম থেকে মুক্তি হয়নি, সে মৃত্যুর পর পার্থিব জীবনের কর্মানুসারে বা শুভ অশুভ কর্মের জন্য স্বর্গ ও নরকে যায় আর তার সেখানের ভোগ হয়ে গেলে, দেহধারণের কারণসরূপ প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগ করার জন্য, সে পৃথিবীতে উচ্চ কিংবা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার পর সে আবার আগামী বা নূতন কর্ম সংগ্রহ করে যা তার সঞ্চিত কর্মের অর্থাৎ প্রারব্ধ ছাড়া যা জমা আছে তার সঙ্গে যোগ হয়।

সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় যে, উন্নতি আর কর্মফলের ক্ষয় কেবল মানবজীবনেই হওয়া সম্ভব ; যা হোক, শ্রীভগবান পশু-পক্ষীদেরও কর্ম ক্ষয় হওয়া সম্ভব বলে ইঙ্গিত করতেন। এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত এক আলোচনায় তিনি বলেছেন, "আমরা জানি না কোন্ জীবাত্মা এই সকল দেহে বাস করছে আর তাদের কোন্ কর্মক্ষয়ের জন্য আমাদের আশ্রয় নিয়েছে।" শঙ্করাচার্যও পশুদের মোক্ষ লাভ হয় স্বীকার করেছেন। তাছাড়া একটি পুরাণে বলা হয়েছে যে, রাজর্ষি ভরতের মৃত্যুর সময় তাঁর পালিত হরিণের চিন্তা হয় আর তাঁকে শেষ আসক্তিটুকু কাটাবার জন্য হরিণ জন্ম নিতে হয়।

দৈবক্রমে যে সব জীবজন্তু শ্রীভগবানের কাছে এসে পড়ত, তিনি তাদের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করতেন। আর জীবজন্তুরাও ঠিক মানুষের মত তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করত। 'গুরুমূর্তমে' পাখী ও কাঠবিড়াল তাঁর ধারে পাশে বাসা তৈরী করত। সে-সব দিনে ভক্তরা মনে করত যে তিনি জাগতিক বিষয়ে যেরূপ উদাসীন এদের প্রতিও সেরূপ অনাসক্ত. কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তিনি সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন

ছিলেন এবং একটি কাঠবিড়াল পরিবারকে একটি পরিত্যক্ত পাখীর বাসা অধিকার করার গল্পও করেছেন।

তিনি সাধারণ তামিল রীতি অনুযায়ী জীবজন্তুদের 'এটা' বলতেন না, সর্বদা ছেলে কি মেয়েটি বলে সম্বোধন করতেন। "ছোকরাদের খাবার দেওয়া হয়েছে কি ?" এটা তাঁর আশ্রমের কুকুরদের উদ্দেশে বলা। "লক্ষ্মীকে এখুনি তার ভাত দিয়ে দাও"—এখানে অভিপ্রায় লক্ষ্মী গরু। আশ্রমের নিয়ম ছিল প্রথমে কুকুরদের খাবার দেওয়া হবে তারপর যদি কোন ভিখারী আসে তাকে, তারপর ভক্তদের। আমি জানতাম যে, কোন বস্তু সমান ভাবে সবাইকে বিতরণ না করলে শ্রীভগবান গ্রহণ করেন না, তাই একদিন তাঁকে অসময়ে আম খেতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কারণটা পরে জানলাম—আমের মরশুম সবে শুরু হয়েছে তাই তিনি বরোদার মহারানীর পাঠানো সাদা ময়ুর যারা এখন তাঁর আশ্রিত হয়েছে তাদের দেওয়ার আগে আমটা পাকা কিনা চেখে দেখছেন। আরও অন্য ময়ুর ছিল। তিনি ময়ুরদের ডাকের অনুকরণ করে তাদের ডাকতেন আর তারা তাঁর কাছে এসে চিনে-বাদাম, ভাত, আম ইত্যাদি খেত। দেহত্যাগের একদিন আগে যখন ডাক্তারদের মতে তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর তখন একটি ময়ুরকে কাছেই কোন গাছে ডাকতে শুনে জিজ্ঞাসা করলেন তারা খেতে পেয়েছে কিনা।

কাঠবিড়ালগুলো জানালা দিয়ে লাফিয়ে তাঁর সোফার ওপর পড়ত, তিনিও সর্বদা তাদের জন্য একটা ছোট টিনের কৌটায় চিনেবাদাম রাখতেন। কখন কখন নবাগত কাঠবিড়ালকে কৌটাটা ধরে দিয়ে তাকে যথেচ্ছ চিনেবাদাম নিতে দিতেন, কখন একটি বাদাম নিয়ে হাতে ধরতেন আর ছোট্ট প্রাণীটি সেটা তাঁর হাত থেকে নিত। একদিন যখন বয়স ও বাতের জন্য লাঠি নিয়ে চলা আরম্ভ করেছেন, তিনি পাহাড় থেকে আশ্রমে আসার পথে কয়েকটা সিঁড়ি নামছেন; একটা কাঠবিড়াল পায়ের কাছ দিয়ে দৌড়ে গেল, তাকে একটা কুকুর তাড়া করেছে।

তিনি কুকুরের নাম ধরে ডাকলেন আর লাঠিটা তাদের মাঝখানে ফেলে দিলেন। এই করতে গিয়ে পিছলে পড়ে তাঁর কণ্ঠার হাড় ভেঙ্গে যায়, কিন্তু কুকুরটা চমকে ওঠে আর কাঠবিড়ালও বেঁচে যায়।

জীবজন্তুরাও তাঁর কৃপা অনুভব করত। সাধারণতঃ কোন বন্য জীবজন্তুকে মানুষে দেখা শোনা করলে তারা দলে ফিরে গেলে তার সাথীরা তাকে বার করে দেয় কিন্তু তারা যদি তাঁর কাছ থেকে যেত তবে তারা সেটা করত না বরং তাকে আদরই করত। তারা অনুভব করত যে তাঁর ভয় ও ক্রোধের সম্পূর্ণ অভাব। তিনি একবার পাহাড়ে বসে আছেন, একটা সাপ তাঁর পায়ে উঠল। তিনি নড়লেন না বা কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেন না। একজন ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে পায়ের ওপর সাপ চলে যেতে তাঁর কি অনুভব হল, তিনি হেসে জবাব দিলেন, "ঠাণ্ডা আর নরম।"

তিনি যেখানে থাকতেন সাপ মারতে দিতেন না "আমরা তাদের জায়গায় এসেছি তাদের কষ্ট দেওয়া বা বিরক্ত করার অধিকার আমাদের নেই। তারা আমাদের জ্বালাতন করে না।" আর সত্যই তারা বিরক্ত করত না। একবার তাঁর মা একটা কালকেউটেকে আসতে দেখে ভয় পেয়ে যান। শ্রীভগবান তার দিকে এগিয়ে গেলেন, আর সেও রাস্তা বদলে চলে গেল। সেটা দু'টি পাথরের মধ্যে চলে গেল; তিনি তার পিছনে পিছনে গেলেন, পথটা একটা পাথরে গিয়ে শেষ হল, সে আর পালাতে না পেরে ফিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে তাঁর দিকে দেখতে লাগল। তিনিও তার দিকে দেখতে লাগলেন। এইভাবে কয়েক মিনিট কাটল তারপর সাপটা ভয়ের কোনো কারণ নেই দেখে কুণ্ডলী খুলে ধীরে ধীরে তাঁর পায়ের কাছ দিয়ে চলে গেল।

একবার যখন তিনি স্কন্দাশ্রমে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে বসেছিলেন একটা নেউল দৌড়ে এসে তাঁর কোলে কিছুক্ষণ বসল। তিনি বললেন "কে জানে কেন এল? এটা কোন সাধারণ নেউল নয়।" আর একটি অদ্ভুত নেউলের কথা অধ্যাপক বেঙ্কটরামিয়া তাঁর

দিনলিপিতে দিয়েছেন। শ্রীগ্রাণ্ট ডাফের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলেছিলেন—

"অরুদ্রদর্শন-উৎসবের সময়। আমি তখন পাহাড়ে স্কন্দাশ্রমে বাস করি। ভক্তের দল সহর থেকে পাহাড়ে উঠছে, একটা সাধারণের থেকে অনেক বড়, সাধারণ ছাই রঙ না হয়ে সোনালী রঙ-এর নেউল, তার ল্যাজেও কোন কালো ছাপ ছিল না, নির্ভয়ে ভিড়ের মধ্যে চলেছে। লোকে ভাবলে এটা নিশ্চয় পোষা আর পালকও ভিড়ের মধ্যেই আছে। সে সোজা পালানীস্বামীর কাছে গেল। পালানীস্বামী তখন বিরূপাক্ষ গুহার পাশে ঝর্ণায় স্নান করছিল। পালানীস্বামী তাকে আদর করে পিঠে হাত বোলালে। সেও পালানীস্বামীর পিছনে পিছনে গুহায় ঢুকলে, গুহার প্রতিটি কোণ ভাল করে দেখলে তারপর স্কন্দাশ্রমগামী যাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিলে। সবাই তার আকর্ষকরূপ ও নির্ভীক চালচলন দেখে অবাক হয়ে গেল। সে আমার কাছে এল আর আমার কোলে উঠে বসল, একটু সময় বিশ্রাম নিলে। তারপর ঘাড় তুলে চারিদিক দেখে কোল থেকে নেমে গেল। সমস্ত জায়গাটা ভাল করে দেখলে আর পাছে অসাবধানী যাত্রী বা ময়ূরেরা তার ক্ষতি করে ভেবে আমিও পিছু পিছু গেলাম। দু'টি ময়ূর খুব কৌতূহলী হয়ে দেখলে কিন্তু সে শান্ত ভাবে এদিক ওদিক ঘুরলে, আর তারপর আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পাথরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

এক সময় শ্রীভগবান সূর্যোদয়ের আগে ভোর বেলা দু'জন ভক্তের সঙ্গে আশ্রমের রান্নার জন্য শাক-সবজী কুটছিলেন। তার মধ্যে একজন, লক্ষ্মণশর্মা, তার কুকুরটিকে সঙ্গে এনেছিল—সুন্দর সাদা ধবধবে কুকুর। কুকুরটি আনন্দে লাফালাফি ও ছুটোছুটি করছিল, খেতে দেওয়া হলেও খেল না। শ্রীভগবান বললেন "দেখ, এর কি আনন্দ, কোন উচ্চকোটির আত্মা কুকুর দেহ ধারণ করেছে।"

অধ্যাপক বেঙ্কটরামিয়া তার 'দিনলিপি'তে আশ্রমের কুকুরদের অদ্ভুত ভক্তির কথা লিখেছে—

"সেসময় (অর্থাৎ ১৯২৪ সালে) আশ্রমে চারটি কুকুর ছিল। শ্রীভগবান বললেন যে ওরা তাঁর প্রসাদ ছাড়া খায় না। পণ্ডিত এটা পরীক্ষা করার জন্য তাদের সামনে কিছু খাবার দিলে কিন্তু তারা সেগুলো ছুঁলো না। একটুবাদে শ্রীভগবান তার থেকে একটু তুলে মুখে দিলেন আর তৎক্ষণাৎ তারা সেই খাবারের ওপর ছুটে এসে সব খেয়ে ফেললে।"

আশ্রমের প্রায় সব কুকুরের পূর্বপুরুষ 'কমলা' নামে একটি কুকুরী, সে বাচ্চা বয়সে স্কন্দাশ্রমে এসেছিল। ভক্তেরা তাকে প্রথমে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল কারণ তাদের ভয় ছিল পাছে বছর বছর বাচ্চা হয়ে আশ্রম ভ'রে যায় কিন্তু সে কিছুতেই গেল না। এরূপে সত্যই কুকুরদের একটা পরিবার গড়ে উঠল, তা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা হত। কমলার প্রথমবার প্রসবের সময় তাকে স্নান করানো হয়, কপালে হলুদ, কুমকুম লাগানো হয় আর তাকে আশ্রমে একটা পরিষ্কার স্থান দেওয়া হয়, সেখানে সে দশদিন ছিল। দশদিনের দিন বেশ খাওয়া-দাওয়া করে তার অশৌচান্ত হয়। সে খুব বুদ্ধিমতী ও কাজের ছিল। শ্রীভগবান প্রায়ই তাকে কোন নবাগতকে পাহাড় প্রদক্ষিণ করিয়ে আনতে বলতেন "কমলা! একে ঘুরিয়ে নিয়ে এস।" আর কমলাও তাকে পাহাড়ের চারিদিকে প্রতিটি দেবমূর্তি, পুষ্করিণী ও মন্দির দেখিয়ে আনত।

আশ্রমে আর একটি অদ্ভুত কুকুর ছিল চিন্না করুপন্ন (ছোট কালু), সে কিন্তু কমলার বংশধর নয়। শ্রীভগবান নিজেই তার সম্বন্ধে বলেছেন, "চিন্না করুপন্ন কুচকুচে কালো ছিল তাই তার এই নাম হয়েছিল। সে বেশ উচ্চনীতি সম্পন্ন ছিল। আমরা যখন বিরূপাক্ষ গুহায় ছিলাম, একটা কালো মত কিছু মাঝে মাঝে দূরে দেখা যেত। কখন কখন ঝোপের মধ্যে তার মাথা দেখা যেত। মনে হত তার বৈরাগ্য বেশ

প্রবল। সে কারও সঙ্গে মিশত না আর বস্তুতঃ অন্যের সঙ্গ এড়িয়ে যেত। আমরাও তার স্বতন্ত্রতা ও বৈরাগ্যকে সম্মান করে তার খাবার তার জায়গায় রেখে চলে আসতাম। একদিন যখন আমরা পাহাড়ে উঠছি করুপন্ন হঠাৎ লাফিয়ে পথের ওপর পড়ল আর আমার ওপর লাফালাফি করতে লাগল। তার আনন্দের আতিশয্যে কি লেজ নাড়া! সে যে কি করে দলের মধ্যে আমাকে বেছে নিলে আর তার ভালবাসা দেখালে সেটাও একটা আশ্চর্য। তারপর থেকে সে আমাদের সঙ্গে আশ্রমে থাকত। কি বুদ্ধিমান, সেবাপরায়ণ আর কি উচ্চ মনোভাব সম্পন্ন! তার আগেকার উদাসীনতা ত্যাগ করে খুব স্নেহপরায়ণ হয়ে গেল। তার ছিল সর্বভূতে মৈত্রী। সে প্রত্যেক দর্শনার্থী ও আবাসিকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করত, তাদের কোলে উঠে পড়ত, গা ঘেঁষে বসত। সাধারণতঃ সকলেই তার ব্যবহার পছন্দ করত। কেউ কেউ তাকে দূরে রাখার চেষ্টা করত কিন্তু সে কি ছাড়বার পাত্র! যা হোক তাকে দূরে যেতে বললে সে একেবারে সন্ন্যাসীর মত প্রতিজ্ঞা করে দূরে বসে থাকত। একবার একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ আমাদের গুহার কাছে বেলগাছের তলায় মন্ত্র পাঠ করছিল, সে তার কাছে গেল। ব্রাহ্মণেরা কুকুরকে অপবিত্র মনে করে, তাদের ছোঁয় না বা কাছে আসতে দেয় না। করুপন্ন সাধারণ রীতি অনুসারে আর সমত্বের ভাবে তার কাছে যেতে ছাড়ল না। ব্রাহ্মণের আচারের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে একজন আশ্রমিক লাঠি তুলে আস্তে করে তাকে মারলে। করুপন্ন চীৎকার করতে করতে পালিয়ে গেল, সে আর কখন আশ্রমে আসেনি। সে এতই সংবেদনশীল ছিল যে, একবার যেখানে দুর্ব্যবহার পেত সেখানে আর কখনও যেত না।

"যে লোকটি এই ভুল করে সে কুকুরের সংবেদনশীলতা ও নীতিজ্ঞানকে স্পষ্টতঃই তুচ্ছ করত। অথচ এর আগেও তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। সেটা এরকম, একবার পালানীস্বামী করুপন্নকে খুব বকে ও তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। সেদিন বেশ ঠাণ্ডা আর

বর্ষার রাত, তা সত্ত্বেও চিন্না করুপন্ন ঘর ছেড়ে চলে গেল ও কিছু দূরে একটা কয়লার থলির ওপর রাত কাটালে, কেবল সকালে তাকে ফিরিয়ে আনা হল। আরও অন্য একটি কুকুরের আচরণ থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। কয়েক বছর আগে আমাদের সঙ্গে বিরূপাক্ষ গুহায় যে ছোট কুকুরটি ছিল তাকে পালানীস্বামী বকে, সে সোজা শঙ্খতীর্থ পুষ্করিণীতে চলে যায় আর কিছু পরে তার মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখা যায়। পালানীস্বামী ও অন্যদের বলা হল যে কুকুর বা আশ্রমের অন্য জীবজন্তুরা বুদ্ধিমান, তাদেরও নীতি আছে, তাদের সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করা ঠিক নয়। আমরা জানি না কোন্ জীবাত্মা সেই দেহে বাস করে আর তাদের কোন্ কর্মক্ষয় করার জন্য আমাদের সাহচর্য কামনা করে।"

আশ্রমে আরও অন্য কুকুর ছিল যারা বুদ্ধি ও উচ্চনীতির পরিচয় দিয়েছিল। স্কন্দাশ্রমে থাকাকালে যখনই কোন কুকুরের শেষ সময় উপস্থিত হত, শ্রীভগবান তার পাশে বসে থাকতেন ও তার দেহটা ভালভাবে সমাধি দেওয়া হত, একটা পাথরের স্মৃতিফলকও রাখা হত। পরবর্তীকালে যখন আশ্রমের বাড়ী ঘর হল আর বিশেষ করে যখন শ্রীভগবানের শারীরিক শক্তির হ্রাস হল, লোকেরা ইচ্ছামত কাজ করতে লাগল তখন জীবজন্তু ভক্তেরা আর তত কাছে আসতে পেত না।

শেষের কয়েক বছর আগে অবধি বাঁদরেরা শ্রীভগবানের সোফার কাছে জানলার ধারে আসত আর গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখত। কখন কখন দেখা যেত যে ঠিক মানুষ মায়ের মত বাঁদর মা-ও তার ছোট্ট বাচ্চাকে বুকে আঁকড়ে নিয়ে ভগবানকে দেখাতে এসেছে। একটা বাঝাপড়া হয়েছিল যে, সেবকেরা তাদের তাড়াবার আগে অন্ততঃ একটা কলা দিয়ে তাড়াবে।

যতদিন না শ্রীভগবান অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন ততদিন তিনি সকাল সাতটার পর আর বিকাল পাঁচটার সময় একবার করে পাহাড়ে

যেতেন। একদিন সন্ধ্যায় বেড়াতে না গিয়ে স্কন্দাশ্রমে চলে যান। যখন তিনি সময়মত ফিরলেন না, কয়েকজন ভক্ত পাহাড়ে উঠে গেল, অন্যেরা দলে দলে জড়ো হয়ে তিনি কোথায় গেলেন আর এর অর্থ কি আলোচনা করতে লাগল, বাকি কয়েকজন হলঘরে বসে প্রতীক্ষা করতে লাগল। একজোড়া বাঁদর হলঘরের দরজায় এল, নির্ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল আর চিন্তিত মনে খালি সোফা দেখতে লাগল।

তারপর মানুষেরাও শ্রীভগবানের পার্থিব দর্শন হতে বঞ্চিত হওয়ার কয়েক বছর আগে বাঁদরদেরও দিন চলে গেল। হলের বাইরে তালপাতার ছাউনি বাড়ানো হল আর তাতে তাদের আসাও কঠিন হল। যা হোক বেশীর ভাগ বাঁদরদের ধরে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয় বা নগরপালিকা-দ্বারা ধৃত হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আমেরিকা পাঠানো হয়।

১৯০০ সালে প্রথম যখন শ্রীভগবান পাহাড়ে বাস করতে শুরু করেন, আর ১৯২২ সালে যখন তিনি পাহাড়ের তলদেশে আশ্রমে এলেন, এই সময়ের মধ্যে তাঁর বাঁদরদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয়। জ্ঞানীর সর্বভূতে মৈত্রী ও মমতায় এবং তাঁর স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এদের নিরীক্ষণ করতেন। তিনি তাদের চীৎকারের অর্থ, তাদের আচার-ব্যবহার ও শাসন-পদ্ধতিও বুঝতে শিখেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন যে প্রত্যেক দলের একজন রাজা ও তাদের নিজস্ব এলাকা আছে। যদি অন্য দল অনধিকার প্রবেশ করে তাহলে যুদ্ধ হয়। কিন্তু প্রত্যেকবার যুদ্ধ বা সন্ধি হওয়ার আগে একদল থেকে অন্যদলে একজন প্রতিনিধি পাঠানো হয়। তিনি দর্শনার্থীদের বলতেন যে তাঁকে বাঁদরেরা তাদের একজন মনে করে ও মধ্যস্থতার জন্য তাঁর কাছে আসে।

"বাঁদরেরা সাধারণতঃ পালিত বাঁদরকে তাড়িয়ে দেয় কিন্তু আমার সম্বন্ধে এরা তার ব্যতিক্রম করেছিল। তাছাড়া ভুল বোঝাবুঝি ও ঝগড়া হলে তারা আমার কাছে আসত আর আমি তাদের আলাদা

করে শান্ত করতাম, ঝগড়াও বন্ধ হত। একবার একটা ছোট বাঁদরকে তাদের দলের একটা বড় বাঁদর কামড়ে দেয় আর তাকে অসহায় অবস্থায় আশ্রমের কাছে ফেলে চলে যায়। ছোট বাচ্চাটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিরূপাক্ষ গুহার আশ্রমে এল, তাই আমরা তাকে নন্দী (খোঁড়া) বলতাম। যখন পাঁচদিন বাদে তাদের দল আবার এল, তারা দেখলে যে আমি ওকে দেখাশোনা করছি তা সত্ত্বেও তারা তাকে দলে নিলে। সেই থেকে তারা সবাই উদ্বৃত্ত খাবার জিনিসের জন্য আশ্রমের বাইরে আসত কিন্তু নন্দী একেবারে আমার কোলে এসে বসত। সে খুব পরিষ্কার করে খেত। যখন পাতায় করে তাকে খেতে দেওয়া হত সে একটিও ভাত পাতার বাইরে ফেলত না। যদি দৈবাৎ কখন একটি ভাত বাইরে পড়ে যেত তবে আগে সেটি কুড়িয়ে খেয়ে তবে পাতার অন্য ভাতে হাত দিত।

"সেও খুব সংবেদনশীল ছিল। একবার কোন কারণে সে কিছু ভাত ছড়ায় আর আমি তাকে বকি 'কি হল! ভাত নষ্ট করছ কেন?' সে তৎক্ষণাৎ আমার চোখে আঘাত করে, আমার চোখে লাগে। শাস্তিসরূপ তাকে কয়েকদিন আর আমার কাছে আসতে বা কোলে উঠতে দেওয়া হয় নি কিন্তু ছোকরা অনুনয় বিনয় ক'রে ক্ষমা চেয়ে আপন প্রিয় স্থানটি ফিরে পেল। এটা তার দ্বিতীয় অপরাধ, প্রথমবারে আমি তার গরম দুধের বাটি ঠোঁটের কাছে এনে ফুঁ দিয়ে তারই জন্য ঠাণ্ডা করছিলাম, সে বিরক্ত হয়ে আমার চোখে মারে কিন্তু সেটা এমন কিছু মারাত্মক হয়নি, আর সেও তৎক্ষণাৎ কোলে উঠে কিচমিচ করতে থাকে যেন বলতে চায় 'ভুলে যাও, ক্ষমা কর' তাই তাকে ক্ষমা করা হয়েছিল।"

পরে নন্দী দলের রাজা হয়। শ্রীভগবান অন্য এক বাঁদর রাজার কথাও বলেছিলেন যে তার দলের দু'জন উদণ্ড বাঁদরকে দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার বাহাদুরী করেছিল। তাতে দলে বিদ্রোহ হয় আর সে দল ছেড়ে বনে চলে যায়, সেখানে সে দু'সপ্তাহ থাকে। ফিরে এসে

সে তার বিদ্রোহকারী ও সমালোচকদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে, তার দু'সপ্তাহ তপস্যার ফলে সে এতই শক্তিশালী হয় যে কেউ তার সঙ্গে লড়াই করতে সাহস করলে না।

একদিন ভোরবেলা খবর পাওয়া গেল যে আশ্রমের কাছে একটি বাঁদর মারা যাচ্ছে। শ্রীভগবান তাকে দেখতে গেলেন আর এটি সেই বাঁদর রাজা। তাকে আশ্রমে আনা হল, সে শ্রীভগবানের গায়ে ঠেস দিয়ে শুয়ে রইল। দু'জন বহিষ্কৃত বাঁদর কাছেই একটা গাছে বসে সব দেখছিল। শ্রীভগবান পাশ ফেরার জন্য নড়লেন আর মরণোন্মুখ বাঁদর তার স্বাভাবিক বৃত্তিতে তাঁর পায়ে কামড়ে দিলে। তিনি তাঁর পা দেখিয়ে একবার বলেছিলেন "বাঁদর রাজার কৃপার চারটি চিহ্ন আমার আছে।" তারপর বাঁদর রাজা শেষ হুঙ্কার দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে। সেই প্রতীক্ষারত বাঁদর দু'টি শোকে আর্তনাদ করে লাফালাফি করতে লাগল। তার দেহটা সন্ন্যাসীর সম্মান দিয়ে সমাধিস্থ করা হল। দেহটা প্রথমে দুধ, তারপর জল দিয়ে স্নান করিয়ে বিভূতি লেপে মুখটা খোলা রেখে একটা নূতন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। কর্পূর আরতি করে আশ্রমের কাছে সমাধি দিয়ে তার ওপর পাথরের স্মারক বসানো হল।

বাঁদরের কৃতজ্ঞতার একটা গল্প বলা হত। একবার শ্রীভগবান একদল ভক্তের সঙ্গে গিরি প্রদক্ষিণ করছিলেন, যখন তাঁরা পাচিয়াম্মান কোয়েলে এলেন তখন সবাই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর। তৎক্ষণাৎ একদল বাঁদর পথের ধারে একটা ডুমুর গাছে উঠে সব ডাল পালা নাড়া দিয়ে রাস্তাময় পাকা ডুমুর ছড়িয়ে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল, নিজের একটাও খেলে না। ঠিক সেই সময় একদল স্ত্রীলোক মাটির কলসী করে খাবার জলও নিয়ে এল।

শ্রীভগবানের পশুপাখী ভক্তদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিল লক্ষ্মী গরু। গুড়িয়াথমের নিকট কুমারমঙ্গল নিবাসী অরুণাচল পিল্লাই ১৯২৬ সালে তাকে বাছুর অবস্থায় তার মার সঙ্গে আশ্রমে এনে শ্রীভগবানকে

নিবেদন করে। তিনি দান নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন কারণ আশ্রমে সে-সময় গরু রাখার কোন জায়গা ছিল না। যাহোক অরুণাচল পিল্লাই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে একেবারে অস্বীকার করে। একজন ভক্ত রামনাথ দীক্ষিতার তাদের দেখাশোনা করতে রাজী হল সুতরাং তারা থেকে গেল। দীক্ষিতার তাদের মাস তিনেক দেখাশোনা করলে তারপর তাদের সহরে এক গোয়ালার কাছে রেখে দেওয়া হয়। সেও তাদের একবছর রাখলে আর একদিন দর্শন করতে আসার সময় তাদের নিয়ে এল। মনে হল শ্রীভগবানের প্রতি বাছুরটির অদম্য আকর্ষণ, সে আশ্রমের রাস্তা চিনে রাখলে কারণ পরের দিন প্রায় দু'মাইল রাস্তা একলাই চলে এল। সেই থেকে সে রোজ সকালে আশ্রমে আসত আর সন্ধ্যায় ফিরে যেত। পরে যখন আশ্রমে বাস করতে এল তখন সে অন্য কোন দিকে মন না দিয়ে সোজা শ্রীভগবানের কাছে যেত আর তিনিও সর্বদা তার জন্য কলা বা অন্য স্বাদিষ্ট কিছু রাখতেন। অনেকদিন ধরে সে প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার সময়ে হলঘরে আসত আর তাঁর সঙ্গে খাওয়ার ঘরে যেত। তার সময়-জ্ঞান এমনই প্রখর ছিল যে, তিনি যদি কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে নির্ধারিত সময়ের পরেও বসে থাকতেন তবে সে এলে ঘড়ির দিকে চাইলে দেখতেন ঠিক সময় হয়েছে।

তার কয়েকটি বাছুর হয়েছিল তার মধ্যে তিনটি শ্রীভগবানের জয়ন্তীতে (জন্মদিনে) হয়। যখন আশ্রমের পাথরের পাকা গোশালা তৈরী হল তখন ঠিক হল যে লক্ষ্মী প্রথম প্রবেশ ক'রে তার দ্বারোদ্ঘাটন করবে। কিন্তু যখন সময় হল তখন তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, সে শ্রীভগবানের পাশে গিয়ে বসে আছে আর তিনি না উঠলে সেও নড়বে না সুতরাং তিনি প্রথমে প্রবেশ করলেন আর লক্ষ্মী তাঁর পিছনে। কেবল যে তারই শ্রীভগবানের প্রতি অসাধারণ অনুরাগ ছিল তা নয়, শ্রীভগবানও তার প্রতি যে কৃপা ও করুণা দেখিয়েছেন তাও একটা ব্যতিক্রম। পরবর্তীকালে আশ্রমে আরও কয়েকটি গরু ও ষাঁড় আসে কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ এরূপ অনুরক্ত ছিল না আর কেউ শ্রীভগবানের

এত অনুকম্পাও লাভ করেনি। লক্ষ্মীর উত্তর পুরুষ এখনও আছে।

১৯৪৮ সালে ১৭ই জুন লক্ষ্মী অসুস্থ হল আর ১৮ই সকালে তার শেষ সময় উপস্থিত মনে হল। সকাল ১০টার সময় শ্রীভগবান তার কাছে গিয়ে বললেন "মা, এই তো এসে গেছি!" এই বলে পাশে বসলেন, তার মাথা কোলের মধ্যে নিলেন, তার চোখের দিকে চাইলেন, আর একহাত তার মাথায় দিলেন যেন দীক্ষা দিচ্ছেন আর অন্য হাত বুকে। তাঁর গাল লক্ষ্মীর গালে ঠেকিয়ে আদর করলেন। তার হৃদয় পবিত্র, বাসনাশূন্য ও একমাত্র ভগবানে অনুরক্ত জেনে, সন্তুষ্ট মনে তার কাছে বিদায় নিয়ে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য খাওয়ার ঘরে চলে গেলেন। লক্ষ্মীর শেষ অবধি জ্ঞান ছিল আর চোখও শান্ত ছিল। সাড়ে এগারটার সময় শান্তভাবে ইহলীলা শেষ হল। তাকে আশ্রমের হাতার মধ্যে একটি হরিণ, একটি কাক ও একটি কুকুরের সমাধির পাশে পূর্ণ অন্ত্যেষ্টি সংস্কারের সঙ্গে সমাধি দেওয়া হল। তার সমাধির ওপর একটা চৌকোনা পাথর বসান হল ও তার উপর তার মূর্তি খোদাই করানো হল। সেই পাথরে শ্রীভগবানের লেখা, 'সে মুক্তিলাভ করেছে' খোদাই করা হল। দেবরাজ মুদালিয়ার ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিল এটা কি সাধারণ প্রচলিত কথা যেমন কোন লোক মারা গেলে লোকে বলে যে, তিনি সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গেছেন কিংবা বস্তুতঃই সে মুক্তিলাভ করেছে, শ্রীভগবান বলেছিলেন যে সে বাস্তবিকই মুক্তিলাভ করেছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীরমণাশ্রম

১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে ভক্তেরা যখন শ্রীভগবানকে অনুসরণ করে পাহাড়ের তলায় মার সমাধির কাছে নেমে এল তখন আশ্রম বলতে একটি পাতার কুটির। পরবর্তীকালে ভক্তের সংখ্যা বাড়ল, দান আসতে লাগল, রীতিমত আশ্রম গড়ে উঠল—একটা হলঘর যেখানে শ্রীভগবান বসতেন, অফিসঘর, বই-এর ঘর, খাওয়ার ঘর ও রান্নাঘর, গোশালা, ডাকঘর, ডাক্তারখানা, পুরুষ অতিথিদের জন্য একটা বড় হলঘব যেখানে ধর্মশালার মত দু'চার দিন থাকা যায়, দু'চারটি ছোট ঘর যাতে বেশী দিন থাকা যায়—সবই একতলা বাড়ী আর বাইরেটা চুনকাম করা ধবধবে সাদা।

আশ্রমের ঠিক পশ্চিমে একটা বড় চতুষ্কোণ পুষ্করিণী যার চারিদিকে চারটি বাঁধানো ঘাট, দক্ষিণ দিকে তিরুভন্নমালাই হয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বাঙ্গালোর যাওয়ার বাসের রাস্তা। এই রাস্তা আর একটু পশ্চিমে এগিয়ে গিয়ে দু'ভাগে ভাগ হয়ে পাহাড়কে ঘিরেছে। রাস্তায় উত্তর মুখে দাঁড়ালে একটি ছোট পুলের পব একটা কালো রং-এর কাঠের ওপর স্বর্ণাক্ষরে 'শ্রীরমণাশ্রম' লেখা আছে দেখা যায়। কোন ফটক নেই (এখন হয়েছে), কেবল প্রবেশ পথ। নারিকেল গাছের পাতায় আড়াল করা আশ্রম, আর তার পিছনেই উঠে গেছে সুমহান সেই পাহাড়।

কেবল যে আশ্রম তৈরী হয়েছে তা নয়, রাস্তার অপর দিকে মৌরভীর মহারাজা দর্শনার্থী রাজাদের জন্য একটি অতিথিশালা তৈরী করে দিয়েছেন। গৃহস্থ ভক্তদের ছোট ছোট কুটির ও বাড়ী গড়ে উঠেছে। আশ্রমের পশ্চিমে পেলাকোট্টুতে পাহাড়ের গুহায় বা কুটিরে সাধুদের তৈরী কয়েকটি থাকার জায়গা। এই সাধুদের অনেকেই যুবক, কেউ কেউ বেশ অবস্থাপন্ন পরিবার থেকে এসেছে,

এরা সংসার ও বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করে সর্বোত্তম অনুসন্ধানের জন্য জীবন সমর্পণ ক'রে সন্ন্যাস নিয়েছে।

আশ্রমে যারা দর্শনার্থে আসে বা সেখানে বসবাস করে তারা কিন্তু সবাই হিন্দু নয়। এখানে ইউরোপীয়, আমেরিকান, পার্শী, ইহুদী, মুসলমান, আবার হিন্দুও বিভিন্ন বর্ণের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রয়েছে।

আশ্রমের বৃহৎ খাওয়ার ঘর ও তার সংলগ্ন রান্নাঘর একটা আলাদা বাড়ী। খাওয়ার ঘরটি একেবারে খালি, কোনরকম আসবাব নেই। আগে পাতা দেওয়া হত, পরের দিকে দু'সারি করে আড়াআড়িভাবে কলাপাতা সাজানো হয়, আর ভক্তেরা আসন-পিঁড়ি হয়ে লাল পাথরের মেঝেতে বসে খায়। ঘরের মাঝখানের তিনভাগ একটা পর্দা দিয়ে আড়াল করা। একদিকে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণেরা যারা অন্যদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে না আর অন্য দিকে অন্য সবাই, বিদেশীরা ও যে ব্রাহ্মণেরা সবার সঙ্গে বসতে পছন্দ করে তারা বসে। ভগবান বিধি-নিষেধ মানতে বলতেন না বা নিষেধও করতেন না। তিনি দেওয়ালের দিকে মাঝখানে বসতেন যাতে দু'দিকেই দেখা যায়।

খাওয়ার ঘর ছাড়া জাতিভেদ আর কোথাও নেই। হলঘরে ব্রাহ্মণ, বিদেশী, নিম্নশ্রেণীর সবাই পাশাপাশি বসত। ভগবানের উপস্থিতি এতই ব্যাপক, শক্তিশালী ও তীব্র যে ছোটখাট উপায় ও ভেদভাব তুচ্ছ হয়ে যেত। সকাল ও সন্ধ্যায় বেদ পাঠ হত। যদিও গোঁড়া হিন্দুরা বলে যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরাই বেদ শোনার অধিকারী তাহলেও সবাই বসে শুনত। একবার একজন উত্তর ভারতীয় এ বিষয়ে প্রশ্ন করে, ভগবান তাকে, যে বিষয়ে তার সম্বন্ধ নেই তা না ভেবে নিজের সাধনার বিষয়ে মনোযোগ দিতে বলেন।

বিদেশী দর্শনার্থীদের ধর্ম পরিবর্তনের জন্য কোন জোর করা হয় না। তার প্রয়োজন নেই কারণ অদ্বৈত সাধারণতঃ সকল ধর্মেরই সারতত্ত্ব। 'তাও'বাদ, বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মে স্পষ্টতঃই এটা স্বীকার করা হয়। ^ শ্চমী ধর্মে এটা কিছু প্রচ্ছন্ন। যাহোক ইসলামের সুফী সন্তরা

অদ্বৈতকেই 'সাহাদের' প্রকৃত অর্থ বলে মানে—"ঈশ্বরের অতিরিক্ত কোন দেবতা নেই", "আত্মাছাড়া কোন জীবাত্মা নেই", "অস্তিত্ব ছাড়া কোন সত্তা নেই।" ভগবান প্রায়ই 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' থেকে উদ্ধৃত করে মোসেসকে দেওয়া ঈশ্বরের নাম "আমি আছি যা আমি আছি" অর্থাৎ 'আমি', আত্মা বা সত্তাই ঈশ্বরের একমাত্র উপযুক্ত নাম বলতেন। তিনি "শান্ত হও ও নিজেকে ঈশ্বর বলে জানো" উদ্ধৃত করে ব্যাখা করতেন যে এটাই কেবল করতে হবে—মনকে শান্ত রাখো আর 'আমি'কে ঈশ্বর বলে জানো, ব্যস। খ্রীস্টীয় ধর্মে কেবলমাত্র মিস্টার একহার্টের মত কয়েকজন উচ্চ কোটির মরমিয়া সাধকই অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেছে আর ঘোষণা করেছে "ঈশ্বরের সত্তাই আমার সত্তা"।

হলঘরে প্রতিদিন বেদ পাঠ হত কিন্তু ভগবান স্পষ্টই বলেছিলেন যে তার অর্থ বোঝার প্রয়োজন নেই। এর শব্দ ঝঙ্কারেই মন স্থির হয় আর ধ্যানের সাহায্য হয় ; এটাই যথেষ্ট। কোন শব্দার্থ চিন্তার থেকে এটাই বেশী দরকার। আধ্যাত্মিক শিক্ষা কোন সিদ্ধান্ত জানা নয় পরন্তু এটা একটা সাধনা, একটা পথ—একটা আন্তর রসসিদ্ধি।

আশ্রমেও যারা ধ্যান করা থেকে কাজের জীবন পছন্দ করত তারা অফিস, বাগান, পুস্তক ভাণ্ডার, রান্নাঘর ইত্যাদি কোন না কোন বিভাগে সেবা ক'রে ভগবানের সান্নিধ্যে ও তাঁর কাজ ক'রে কাটাতো। এর মধ্যে সবচেয়ে ভাগ্যবতী ছিল ব্রাহ্মণ বিধবারা যারা রান্নাঘরে কাজ করত। যখন বয়স ও স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে সেই শেষের কয়েক বছর ছাড়া ভগবান নিজেও তাদের সঙ্গে কাজ করতেন। তিনি রাত তিনটা বা চারটার সময় উঠে দু-এক ঘণ্টা পাতা তৈরী (কলা পাতা ব্যবহারের আগে) ও আনাজ কোটার কাজ করতেন। প্রতিদিন তিনি রান্নার তদারক করতেন আর প্রায়ই তাতে হাত লাগাতেন। কিছু নষ্ট হওয়ার উপায় ছিল না। একবার একজন ভক্ত পাহাড় থেকে এক ঝুড়ি 'পেসান ফল' নিয়ে আসে, তিনি তার খোসাগুলো অবধি ফুটিয়ে সেই জল 'রসমে' দেওয়ালেন। যারা তাঁর সঙ্গে রান্নাঘরে কাজ করত তারা

কর্মমার্গ অনুসরণ করত আর তিনি তাদের সেই পথ অনুযায়ী বিশদ উপদেশ দিতেন। তাদেব কাছে সবসময়ে সম্পূর্ণ ও বিনা বাক্যব্যয়ে বাধ্যতা আশা করতেন। তিনি তাদের সর্বদা লক্ষ্য করতেন, অন্যায় করলে বকতেন আর চেষ্টাকে অনুমোদন করতেন। তারা পরমানন্দে থেকেও যাতে তাঁর বিরাগভাজন না হতে হয় সেজন্য সর্বদাই ত্রুটি-বিচ্যুতির ভয়ে সচেতন থাকত।

রান্নাটা তাদেব কাছে একটা শিল্প হয়ে যায় আর ভগবান তাতেও পরম দক্ষ ছিলেন। এটাও একটা সাধনার পথ আর ভগবান প্রায়ই তাদের করা প্রত্যেক কাজের প্রতীকতাটি ধরিয়ে দিতেন। প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁত ভাবে করতে হত। তিনি নিজে সব দেখতেন আর পরি-বেশনের আগে চেখে দেখতেন। লোকে ভাবতে পারে যে তিনি ভোজন বিলাসী ছিলেন কিন্তু এত খুঁতখুঁতে হওয়া সত্ত্বেও তিনি খাওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কখনও যদি তিনি দেখতেন যে তাঁর খাওয়ার প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, তিনি মিষ্টি, টক, আচার সব মিশিয়ে খেতেন আর বলতেন "তোমরা পার্থক্য দেখ কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে সব এক।" আর কখন যদি তাঁকে অন্যদের থেকে কোন ভাল জিনিস বা বেশী দেওয়ার চেষ্টা হত তবে যে দিত সে তাঁর বিরাগভাজন হত।

খাবার নষ্ট না করার একটা পদ্ধতি ছিল বাসী-জিনিস গরম করা, তাতে কিছু নূতন স্বাদ করা বা তাকে কোন ভাবে বদলে দেওয়া। এটা গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মতের বিপরীত, সেজন্য এটা বন্ধ করার জন্য সহকারীরা ভগবানের থেকে আরও আগে আসতে আরম্ভ করলে। ভগবান তারও আগে উঠে রান্নাঘরে এলেন। এই মূর্খেরা জানত না যে ভগবানের স্পর্শই চরম শুদ্ধি, তারা আবার সেই খাদ্য-দ্রব্যকে শুদ্ধ করত। এটাও একটা কারণ যার জন্য ভগবান রান্নাঘরে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলেন। আরও একটা ঘটনা ঘটে, তিনি আদেশ দেন যে, আনাজের খোসা না ফেলে যেন গরু-বাছুরকে দিয়ে দেওয়া হয়, তার আদেশ সত্ত্বেও সেগুলো ফেলা হয়েছিল। হতে পারে

তিনি হয়ত এমনিতেই রান্নার কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতেন কারণ বয়সও হচ্ছিল, দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন, শেষের দিকে ভক্ত ও দর্শনার্থীর সংখ্যা এত বেড়ে ছিল যে তাঁর রান্নাঘরে সময় কাটানোর অর্থ এদের অবহেলা করা।

এই বাড়ীঘর পরিচালনা ও টাকা পয়সার ব্যবস্থার জন্য একজন পরিচালক প্রয়োজন। কারণ শ্রীভগবান এর কোনটাই করবেন না। সংগঠনের কয়েকটি ব্যর্থ চেষ্টার পর শ্রীভগবানকে তাঁর ছোট ভাই নিরঞ্জনানন্দস্বামীকে সর্বাধিকারী করতে বলা হয় আর তিনি তাতে স্বীকৃতি দেন। এই ব্যবস্থা ভগবানের জীবিত কালে বলবৎ ছিল। অনেক ত্রুটি ও অনেক অভিযোগ হওয়া সত্ত্বেও তারপর থেকে আশ্রম স্বচ্ছল, পরিচ্ছন্ন, নিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়। আশ্রম জীবনের নিয়ম-কানুন তৈরী হয়। কয়েকজন ভক্তের পক্ষে এগুলো বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। যা হোক কেউ প্রতিবাদ করতে বা বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত হলেও শ্রীভগবানের মনোভাব তাদের সংযত করে রাখত। কারণ তিনি প্রত্যেকটি নিয়ম মেনে চলতেন আর হয়ত সেই বিশেষ বিষয়ে নাও হতে পারে কিন্তু সাধারণতঃ কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করতেন, যে আদেশ পালন করা উচিত। যেমন অন্য সব বিষয়ে, এখানেও এর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে।

তিনি এমন একটি পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেটা কেবল একান্তে পালন করার জন্য নয় পরন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে তমসাচ্ছন্ন কলিযুগের পরিস্থিতিতেও পালনীয় ; আর তিনি যদি তাঁর অনুগামীদের প্রতিকূল পরিবেশে আত্মতত্ত্ব স্মরণ করার কথা বলে থাকেন তাহলে তিনি নিজেই আশ্রমের সমস্ত নিয়ম মেনে নিয়ে তাদের সামনে উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়া তিনি লোকেদের যে কাজের জন্য তারা তাঁর কাছে এসেছে সেটা ভুলে গিয়ে পরিচালনার সমালোচনায় ব্যস্ত হওয়াকে সমর্থন করতেন না। তিনি বলতেন "লোকেরা মুক্তির খোঁজে আশ্রমের পথ ধরে আসে আর আশ্রমের

রাজনীতিতে জড়িয়ে প'ড়ে যার জন্য এসেছিল তা ভুলে যায়।" যদি এই সব ব্যাপারই তাদের অভিপ্রায় তবে তার জন্য তিরুভন্নমালাই আসার প্রয়োজন নেই।

মাঝে মাঝে বিক্ষোভ ও অসন্তোষ হত আর এ কথাও বলা যায় না যে, সেগুলো অন্ততঃ সেই বিশেষ ক্ষেত্রে অমূলক ছিল, কিন্তু শ্রীভগবান তাতে মন দিতেন না। একবার মাদ্রাজ থেকে ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ভক্তের একদল একটি নিজস্ব বাসে করে বর্তমান পরিচালনার বদলে নূতন ব্যবস্থাপনার আবেদন নিয়ে আসে। তারা সদলে হলঘরে ঢুকল ও শ্রীভগবানের সামনে বসল। তাঁকে এদের আসার উদ্দেশ্য বলা হয়নি কিন্তু তিনি এদের ভাবভঙ্গী দেখলেন। তিনি গম্ভীর উদাসীন ভাবে নীরবে পাথবের মত বসে রইলেন। তারা তাঁর সামনে অস্বস্তি বোধ কবতে লাগল, এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কবলে, উস্‌খুস করতে লাগল, কেউ কথা বলতে সাহস করলে না। অবশেষে তারা হলঘর ছেড়ে চলে গেল আর যেমন এসেছিল তেমনি মাদ্রাজে ফিরে গেল। তারপর শ্রীভগবানকে তাদের আসার কারণ বলা হলে তিনি বললেন "তারা এখানে কি করতে এসেছিল। তারা নিজেদের শোধরাতে আসে, না আশ্রম সংস্কার করতে আসে।"

আরও একটা শিক্ষা লক্ষ্য করার মত—যদি কোন নিয়ম কেবল বিরক্তিকর না হয়ে অন্যায় হত তাহলে তিনি সেটা কিছুতেই সমর্থন করতেন না, যেমন তিনি বিরূপাক্ষ গুহায় প্রণামী আদায় করা সমর্থন করেন নি। এসত্ত্বেও তাঁর ব্যবহার প্রায়ই প্রতিবাদ না হয়ে সেই অন্যায়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হত। একবার এমন হয়েছিল যে, খাওয়ার ঘরে সকলকে খাবার দেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু সকলকে কফি দেওয়া সম্ভব হল না সুতরাং যে সাধারণ লোকেরা দূ'রে বসেছিল তাদের জল পান করতে দেওয়া হল। শ্রীভগবান লক্ষ্য করলেন—তিনি সব সময় সবকিছু লক্ষ্য করতেন—আর বললেন 'আমাকেও জল দাও'। এরপর তিনি কেবল জল পান করতেন আর

কখন কফি খেতেন না। আগেও অনেকবার এমন হয়েছে যে তিনি কফি পান করা ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু পাচক ও সেবকেরা এটা তাদের বকুনি (হয়ত ঠিক) মনে করে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে আবার রাজী করায়।

এক সময় তিনি খাওয়ার পর পান খেতেন। একদিন তাঁর সেবক পান তৈরী করতে ভুলে গেল। ধরা পড়লে, তাড়াতাড়ি তৈরী করে আনা হল কিন্তু তিনি এটা একটা নির্দেশ বলে ধরে নিলেন। "একটা অনাবশ্যক অভ্যাস। আমি পান খাব কেন?"

অন্ততঃ সেবকদের ক্ষমা করেছেন বলে তাঁকে একবার নিতে অনুরোধ করা হল কিন্তু তিনি বললেন "এটা যদি বদ অভ্যাস হয় তবে একবারই বা করব কেন?" তিনি আর কোনদিন পান খান নি।

একবার যখন বেশ বয়স হয়েছে আর বাতের জন্য হাঁটু ফুলে শক্ত হয়েছে, একদল ইউরোপীয় এল, তাদেব মধ্যে একজন মহিলা পা মুড়ে বসতে অভ্যস্ত না হওয়ায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে ছিল। একজন সেবক, যারা অভ্যস্ত নয় তাদের পা মুড়ে বসা যে কত কষ্টকর না বুঝে, তাকে সেভাবে বসতে বারণ করে। বেচারী মহিলা লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পা গুটিয়ে নিলে। শ্রীভগবান তৎক্ষণাৎ সোজা হয়ে পা মুড়ে বসলেন। পায়ে ব্যথা সত্ত্বেও সেই ভাবেই বসে রইলেন, ভক্তেরা তাঁকে এটা না করতে বললে, তিনি বললেন, "যদি এটাই নিয়ম হয় তবে অন্যদের মত আমারও মানা উচিত। পা ছড়ানো যদি অসম্মানসূচক হয় তাহলে আমি হলঘরের প্রত্যেক লোককে অসম্মান করছি।" সেবকটি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাকে ডেকে আনা হল, সে মহিলাটিকে তার সুবিধা মত বসতে বললে। তাতেও শ্রীভগবানকে আরাম করে বসানো খুব শক্ত হয়েছিল।

প্রথমদিকে কখন কখন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। পাশ্চাত্য ভক্তদের মিশনারী সমালোচকদের উত্তর দিতে হত। একজন অতি আগ্রহী মিশনারী হলঘরে ঢুকে একেবারে ভগবানকেই সমালোচনা করতে আরম্ভ করলে। শ্রীভগবান উত্তর দিলেন না কিন্তু মেজর চাড-

উইকের বাজখাঁই গলা পিছন থেকে সমালোচকের খ্রীস্টধর্মের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করলে আর সে এতই অপ্রতিভ হয়ে গেল যে পালাতে পারলে বাঁচে। এমনকি পরবর্তীকালেও ক্যাথলিক পাদরীরা প্রথমে আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আসত তারপর এমনভাবে তাদের সন্দেহ প্রকাশ করত যে একজনের এই ভেবে আশ্চর্য লাগত যে সত্যই কি তাদের মন উদার কিংবা এরা ধর্মান্তর করা ও অপব্যাখা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে।

যদি কোন প্রশ্ন আন্তরিকতার সঙ্গে করা না হত তবে ভগবান মৌন ও স্থির হয়ে বসে থাকতেন। প্রথমদিকে একবার এক ভণ্ড যারা সাধুর বেশে ঘুরে বেড়ায় আর সরল লোকেদের ঠকিয়ে নিজেদের সুবিধা করে, আশ্রমে এসে সোজাসুজি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি জ্ঞানী কিনা। এটাই সর্বজন স্বীকৃত রীতি যে কেউ বলে না— "আমি জ্ঞানী", যেহেতু আত্মজ্ঞানের অর্থ, যে এটা বলতে পারে সেই অহংকারের বিলয়। সেই ধূর্তের মতলব ছিল, ভগবানকে পরীক্ষা করা। তিনি 'হাঁ' বলেন কিনা কিংবা 'না' বলে উত্তর দিলে পাল্টা প্রশ্ন হত "তবে আপনি ভক্তদের শিক্ষা দেন কি করে?" ভগবান কিন্তু নীরবে বসে রইলেন আর তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন।

একজন মুসলমানও তর্ক করতে এসেছিল কিন্তু তার নিশ্চয়ই আন্তরিকতা ছিল কারণ ভগবান ধৈর্য ধরে উত্তর দিয়েছিলেন।

"ঈশ্বরের কি রূপ আছে?" সে বললে।

"কে বলে ঈশ্বরের রূপ আছে?" শ্রীভগবান পাল্টে প্রশ্ন করলেন। প্রশ্নকর্তা চালিয়ে যেতে লাগল "যদি ঈশ্বর নিরাকার হন তবে তাঁর মূর্তি তৈরি করে উপাসনা করা কি ভুল নয়?"

সে উত্তরটার অর্থ ধরে নিলে যে "কেউ বলে না যে ঈশ্বরের রূপ আছে।" অর্থটা কিন্তু ঠিক যা বলা হয়েছে তাই, সেটা এবার ব্যাখা করা হল—"ঈশ্বরের কথা থাক, আগে বল তোমার কি রূপ আছে?"

"নিশ্চয়ই আমার রূপ আছে যা আপনি দেখছেন, কিন্তু আমি ঈশ্বর নই।"

"তবে তুমি কি রক্তমাংসের তৈরী একটা সুন্দর কাপড়-পরা শরীর ?"

"হা, সেটা ঠিক, আমি এই শরীরের মধ্যে আমার অস্তিত্ব জানি।"

"তুমি নিজেকে শরীর বলছ কারণ তুমি তোমার শরীর সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু তুমি কি এই শরীর ? তুমি তোমার গাঢ় ঘুমে যখন এর সম্বন্ধে সচেতন থাক না তখন কি তুমি শরীর ?"

"হাঁ, আমি নিশ্চয়ই গাঢ় ঘুমেও এই শরীর রূপেই থাকি কারণ ঘুমাতে যাওয়ার আগেও থাকি আর যখন জেগে উঠি তখন নিজেকে ঘুমাতে যাওয়ার সময় যা ছিলাম তাই দেখি।"

"আর যখন মৃত্যু হয় ?"

প্রশ্নকারী একটু থামলে ও এক মিনিট ভাবলে "হাঁ, তখন আমাকে মৃত বলা হয় আর শরীরটাকে কবর দেওয়া হয়।"

"কিন্তু তুমি যে বললে, তুমি শরীর। সেটাকে যখন কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সেটা প্রতিবাদ করে বলে না কেন 'না ! না ! আমায় নিয়ে যেও না ! এই সম্পত্তি আমি জড়ো করেছি, এই কাপড়-চোপড় আমি প'রে আছি, এই ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়েছি, এসব আমার, আমি এদের সঙ্গে থাকতে চাই' !"

তখন দর্শনার্থী স্বীকার করলে যে সে ভুল করে শরীরকে আমি বলে বুঝেছে আর বললে "আমি শরীরের মধ্যে প্রাণ, কিন্তু শরীরটা নই।"

তখন শ্রীভগবান তাকে বুঝিয়ে বললেন "এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি গম্ভীর ভাবে নিজেকে শরীর আর নিজের একটা রূপ আছে ভাবছিলে। এটাই মূল অজ্ঞান আর সব অনিষ্টের গোড়া। যতক্ষণ না একজন অজ্ঞান ত্যাগ ক'রে নিজের নিরাকার সত্তাকে জানবে, ততক্ষণ ঈশ্বর সম্বন্ধে তর্ক করা ও তিনি সাকার কিংবা নিরাকার আর তিনি নিরাকার হলে তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা করা উচিত কিনা এ সব কথা কেবল বৃথা পাণ্ডিত্য জাহির করা। যতক্ষণ না একজন নিরাকার আত্মাকে জানে ততক্ষণ সে নিরাকার ঈশ্বরের ঠিকমত উপাসনাও করতে পারে না।"

উত্তর কখন সংক্ষিপ্ত ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক হত, কখন পূর্ণ ও ব্যাখ্যাত্মক হত কিন্তু সর্বদাই প্রশ্নকারীর প্রকৃতি অনুযায়ী ও আশ্চর্যজনক ভাবে উপযুক্ত হত। একজন নাঙ্গা সাধু একবার এসে এক সপ্তাহ ছিল, বসার সময় সে তার ডান হাত তুলে রাখত। সে নিজে হলঘরে আসেনি কিন্তু প্রশ্ন ক'রে পাঠিয়েছিল "আমার ভবিষ্যৎ কি ?"

"তাকে বল তার বর্তমান যেমন, ভবিষ্যৎও তেমনি হবে।" কেবল যে ভবিষ্যৎ জানার কৌতূহলকেই নিন্দা করা হল তা নয়, তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হল যে তার বর্তমান ভাল বা মন্দ কাজ তার ভবিষ্যৎ তৈরী করছে।

একজন দর্শনার্থী বিভিন্ন গুরুর প্রদর্শিত ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও পাশ্চাত্য দর্শনের কথা উল্লেখ করে তার পাণ্ডিত্য দেখিয়ে শেষে বললে "একজন একরকম অন্যে অন্যরকম বলে ; কার কথা ঠিক ? কোনটা অনুসরণ করব ?"

শ্রীভগবান মৌন রইলেন কিন্তু দর্শনার্থী বারবার বলতে লাগল "অনুগ্রহ করে বলুন কোন্ পথে যাব ?"

তবু তাকে কোন উত্তর দেওয়া হল না, প্রায় একঘণ্টা বাদে যখন ভগবান হলের বাইরে যাওয়ার জন্য উঠলেন তখন তার দিকে ফিরে বললেন, "যে পথে এসেছ সেই পথে যাও।"

দর্শনার্থী ভক্তদের অনুযোগ করলে যে এই উত্তরে কি ফল। তারা তাকে সেই কথার গভীর তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলে যে, একমাত্র পথ হল উৎসে ফিরে যাওয়া, যেখান থেকে একজন এসেছে সেখানে যাওয়া। এটা একই সঙ্গে সঠিক ও তার দম্ভের উপযুক্ত উত্তর ছিল।

সুন্দরেস আইয়ার একজন ভক্ত, তার কথা আগে বলা হয়েছে, শুনলে যে তাকে অন্য সহরে বদলি করা হবে। সে অতি দুঃখের সঙ্গে অনুযোগ করলে, "চল্লিশ বছর ভগবানের সঙ্গে আছি আর এখন আমায় দূরে পাঠানো হচ্ছে। আমি ভগবানের সঙ্গহারা হয়ে কি ক'রে থাকব ?"

"কতদিন ভগবানের সঙ্গে আছ?" তাকে জিজ্ঞাসা করা হল।

"চল্লিশ বছর।"

তখন ভক্তদের দিকে ফিরে শ্রীভগবান বললেন, "এখানে একজন চল্লিশ বছর ধ'রে আমার উপদেশ শুনছে আর এখন সে বলে কিনা সে ভগবানের কাছ থেকে অন্য কোথাও যাচ্ছে!" এ ভাবে তিনি তাঁর সর্ব্বব্যাপী উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যা হোক তার স্থানান্তরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

বছরের পর বছর সেই ছোট ঘরটি ভক্তদের ও যারা শারীরিক ভাবে উপস্থিত হতে পারত না সেই জগতসুদ্ধ সব লোকের কেন্দ্র হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হত কিছুই হচ্ছে না, বস্তুতঃ সুমহান কাজ হয়ে যাচ্ছিল।

পরবর্তী বছরে দৈনন্দিন জীবনে কিছু পরিবর্তন হয়, তাঁর শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হওয়ার জন্য আরও নিয়ম-নিষেধ তৈরী হয়। যতদিন না শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিল ততদিন তাঁর কাছে যাওয়ার কোন নির্ধারিত সময় ছিল না। দিনরাত যে-কোন সময় তাঁর দর্শন পাওয়া যেত। এমন কি শুতে যাওয়ার সময়ও ঘরের দরজা বন্ধ করতে দিতেন না—পাছে কারও প্রয়োজন হলে বঞ্চিত হয়। প্রায়ই তিনি ভক্তদের সঙ্গে অনেক রাত অবধি কথা বলতেন। কেউ কেউ সুন্দরেস আই-য়ারের মত গৃহস্থ ছিল, যাদের পরের দিন কাজে যেতে হত; তারাও দেখত যে এরূপে তাঁর সঙ্গে রাত কাটালে পরের দিন ঘুমের ব্যাঘাতের জন্য কোন ক্লান্তি হত না।

আশ্রমের দৈনন্দিন জীবন সুব্যবস্থিত ও সময়নিষ্ঠ কারণ এটি শ্রীভগবানের আদর্শ ছিল, তিনি নিজে করেছেন আর উপদেশ দিয়েছেন। সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর ঠিক ঠিক জায়গায়। বাড়ীগুলোর চুনকাম রোদে ঝলমল করত, মেঝেগুলো এত পরিষ্কার রাখা হত যে সাদা পোশাকপরা ভক্তরা কাপড় ময়লা হওয়ার ভয় না ক'রে নিঃসঙ্কোচে বসতে পারত। শ্রীভগবানের সোফায় হাতের কাজ-

করা চাদর রোজ বদলান হত, সব সময় পরিষ্কার ও সুন্দর করে বিছানো থাকত।

১৯২৬ সালেই ভগবান গিরি প্রদক্ষিণ করা ছেড়ে দিয়েছেন। ভিড় এত বেশী হ'তে আরম্ভ করে যে সামলান যেত না, তিনি গেলে কেউ আশ্রমে থাকতে চাইত না আর সবাই তাঁর সঙ্গে যেতে চাইত। তাছাড়া তিনি বেরিয়ে গেলে সেই সময় লোকে দর্শনের জন্য, তাঁর সান্নিধ্যের জন্য এসে তাঁকে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে পারে। অনেকবারই তিনি এরূপ ইঙ্গিত করেছেন যে, বলতে গেলে দর্শন দেওয়াই তাঁর জীবনের কাজ, যারা আসবে তাদের যেন কোন বাধা না দেওয়া হয়। তিনি বলতেন স্কন্দাশ্রমে ফিরে না গিয়ে পাহাড়ের তলায় থাকার এটাও একটা কারণ ; সেখানে সহজে যাওয়া যায় না। তিনি যে কেবল গিরি প্রদক্ষিণ ছেড়ে দিয়েছিলেন তা নয় সকাল ও সন্ধ্যায় সামান্য বেড়ানো ছাড়া কোন কারণেই কখন অনুপস্থিত হতেন না। এমনকি তাঁর রান্নাঘরের কাজ ছেড়ে দেওয়াও বোধহয় মুখ্যতঃ ভক্তদের কাছে সুগম হওয়ার জন্য। কারণ মাত্র কয়েকজন ব্রাহ্মণই এই কাজে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারত। যখন তাঁকে ভারতের তীর্থ ভ্রমণে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়, তখন তিনি না যাওয়ার একটা কারণ দেখান যে, ভক্তেরা আশ্রমে এসে তাঁকে দেখতে পাবে না। শেষ অসুখের শেষ সময় অবধি তাঁর একমাত্র চিন্তা যেন সকল দর্শনার্থী দর্শন পায়।

কয়েক বছর ধরে ভক্তেরা যা অনুভব করেছিল, যে উপদেশ ও ব্যাখ্যা শুনেছিল সেগুলো সংগৃহীত হলে কয়েকটি বই হয়ে যায়। শ্রীভগবানের জীবনী ও বাণীর একটা সাধারণ চিত্র তুলে ধরাই এই বই-এর উদ্দেশ্য, বিস্তৃত বর্ণনা করা নয়।

———

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীভগবানের দৈনন্দিন জীবন

দিব্য মানবের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বা মহিমার বিবরণীর চেয়ে কেবল দিনচর্চার মাধ্যমে তাঁদের স্বরূপ উদ্ভাসন করা সম্ভবতঃ আরও কঠিন। অতএব ভগবান ও ভক্তদের দিনলিপির একটা বর্ণনা দিলে এক্ষেত্রে সুবিধা হবে। এটা তাঁর শেষ কয়েক বছর থেকে নেওয়া যেটা লেখক তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারে। এতে বর্ণিত ঘটনাগুলো অন্য ঘটনার থেকে কিছু মাত্র বিশিষ্ট নয় যেমন উল্লিখিত ভক্তরাও যাদের নাম বলা হল না তাদের থেকে কিছু শ্রেষ্ঠ নয়।

সেটা ১৯৪৭ সাল। তিরুভন্নমালাই-এ তাঁর পঞ্চাশ বছর বাস কবা হয়ে গেছে। বয়স হওয়ায় ও শারীরিক দুর্বলতার জন্য বাধানিষেধ প্রবর্তন করা হয়েছে। এখন আর শ্রীভগবানকে সদাসর্বদা নিজেদের ইচ্ছামত পাওয়া যায় না। তিনি যে সোফায় বসে দিনে দর্শন দেন তাতেই রাত্রে ঘুমান কিন্তু এখন দরজা বন্ধ করা হয়। পূর্ববর্তী কালে দিনেরাতে তিনি সমান ভাবে সহজলভ্য ছিলেন। ভোর পাঁচটায় দবজা খোলে আব প্রত্যূষের ভক্তরা নীরবে প্রবেশ ক'বে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, ব্যবহার জনিত চকচকে মসৃণ কাল পাথবের মেঝেতে বসে, অনেকেই হয়ত নিজেদের আসন এনেছে। শ্রীভগবান যিনি এত বিনয়ী, যিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ লোকের সঙ্গেও সমান ব্যবহাব করেন, তিনি এই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম অনুমোদন কবেন কি করে? যদিও মানবীয় দৃষ্টি অনুসারে তিনি সকল প্রকার বিশেষ অধিকারের বিরোধী তথাপি পার্থিব দেহধারী গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন যে আধ্যাত্মিক উন্নতি বা সাধনার সহায়ক তা স্বীকার করেন। সমর্পণের বাহ্যক্রিয়াই কেবল যথেষ্ট নয়। তিনি একবার স্পষ্টই বলেছিলেন "লোকে আমার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে কিন্তু আমি জানি কার সমর্পণ আন্তরিক।"

আশ্রমিক ব্রাহ্মণদের একটি ছোট দল সোফার মাথার কাছে বসে বেদপারায়ণ করে ; দু'একটি ব্রাহ্মণ যারা আড়াই মাইল দূর সহর থেকে এসেছে তারাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সোফার পায়ের কাছে ধূপ ধরান হয়েছে, তার মৃদু সুগন্ধ সমস্ত বাতাস সুরভিত করেছে। শীতের সময় একটা জ্বলন্ত কাঠ-কয়লার আঙ্‌ঠী সোফার পাশে থাকে, সেটা আমাদের দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে যাওয়া জীবনী-শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সময় সময় তিনি তাঁর ক্ষীণ হাত ও চাঁপার কলির মত অপরূপ সুন্দর আঙ্গুলগুলো তার তাপে তাতান আর সেই গরম হাত হাতে পায়ে বুলিয়ে একটু গরম করেন। সবাই স্থির হয়ে বসে থাকে, বেশীর ভাগই চোখ বন্ধ করে ধ্যান করে।

ছ'টা বাজার কয়েক মিনিট পরে পারায়ণ শেষ হয়। সবাই দাঁড়িয়ে ওঠে আর শ্রীভগবান বেশ কষ্ট ক'রে সোফা থেকে ওঠেন, লাঠির জন্য হাত বাড়ান। সেবক সেটা হাতে ধরিয়ে দেয়, তিনি ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যান। কেবল যে দুর্বলতার জন্য বা পড়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি নিম্নদৃষ্টি করে চলেন তা নয় ; সবাই অনুভব করে যে এটা তাঁর স্বাভাবিক নম্রতা। তিনি পাহাড়ের দিকে উত্তরের দরজা দিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে, একটু বেঁকে লাঠির ওপর ভর দিয়ে, চুনকাম করা খাওয়ার ঘর ও অফিস ঘরের মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে চ'লে, অতিথিশালা ঘুরে আশ্রমের পূর্বপ্রান্তে গোশালার পাশে স্নান ঘরে যান। দু'জন হৃষ্টপুষ্ট বেঁটে খাটো শ্যামবর্ণ পায়ের গোড়ালি অবধি ধুতি পরা সেবক অনুসরণ করছে আর দীর্ঘকায় সুঠাম সোনার বরণ কেবলমাত্র কৌপীনধারী তিনি চলেছেন। কখন কোন ভক্ত কাছে এলে কিংবা কোন বালককে দেখে হাসবার জন্য দৃষ্টি তোলেন।

তাঁর হাসি বর্ণনার অতীত। একজন যাকে কঠিন হৃদয় ব্যবসায়ী মনে হয় সেও সেই হাসিতে হৃদয় অনুরণিত ক'রে তিরুভন্নমালাই থেকে বিদায় নেয়। একজন সরলপ্রাণা মহিলা বলেছিল, "আমি দর্শনশাস্ত্র বুঝি না কিন্তু তিনি যখন আমায় দেখে হাসেন তখন আমি নিজেকে ঠিক

যেমন শিশু নিজেকে তার মায়ের কোলে মনে করে সেরূপ সুরক্ষিত মনে করি।" যখন আমি তাঁকে দেখিনি তখন আমার পাঁচ বছরের মেয়ের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলাম "তুমি ভগবানকে দেখে ভালবাসবে। তিনি যখন হাসেন, তখন সকলেই খুব আনন্দ অনুভব করে।"

জলযোগ ৭টায়। জলযোগের পর শ্রীভগবান একটু বেড়াতে যান আর তারপর হলঘরে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে ঘরটি ঝাড়ু দেওয়া হয়েছে ও সোফায় পরিষ্কার চাদর পাতা হয়েছে, কোন কোনটি আবার খুব নক্সাকরা ভক্তদের উপহার। সবকিছু পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি ক'রে পাতা, কারণ সেবকরা তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা জানে আর তিনি বলুন বা না বলুন সবই তাঁর নজরে পড়ে।

আটটার মধ্যে শ্রীভগবান হলঘরে ফিরে আসেন আর ভক্তেরা আসতে আরম্ভ করে। ৯টার মধ্যে হলঘর ভরে যায়। তুমি যদি একজন নবাগত হও তাহলে হয়ত অনুভব করবে যে হলঘরটি কত আপনার আর তুমি ভগবানের কত কাছে কারণ সমস্ত ঘরটা মাত্র ৪০ ফুট লম্বা আর ২৫ ফুট চওড়া। এটা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, আর লম্বা দিকে দু'টি দরজা আছে। যেদিকে পাহাড় সেই উত্তর দিকের দরজাটা খুললে একটা বৃক্ষাচ্ছাদিত চৌকো আঙ্গিনা, তার পুব দিকে খাওয়ার ঘর আর পশ্চিমে বাগান ও ঔষধালয়। দক্ষিণের দরজাটা মন্দিরের দিকে. মন্দির পেরিয়ে রাস্তা, যে পথে ভক্তেরা আসে। সোফাটি উত্তর-পূর্ব কোণে তার পাশে একটা ঘোরান বই-এর সেল্‌ফ্ আছে তাতে যে বইগুলো প্রায়ই প্রয়োজন হয় সেগুলো রাখা রয়েছে, সেল্‌ফের ওপর একটা ঘড়ি। আর একটা ঘড়ি সোফার পাশে দেওয়ালে টাঙ্গানো, দু'টিই একেবারে কাঁটায় কাঁটায় মেলানো।

যদি উদ্ধৃতির জন্য কোন বই প্রয়োজন হয়, শ্রীভগবান ঠিক জানেন যে সেটি কোন্ তাকের কোথায় আছে আর প্রায়ই কোন্ পৃষ্ঠায় আছে তাও তাঁর জানা। কাচের বড় বই-এর আলমারি দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে।

বেশীর ভাগ ভক্ত ঘরের মাঝখানে শ্রীভগবানের দিকে মুখ ক'রে পূর্ব মুখে বসে। স্ত্রীলোকেরা তাঁর সাম্‌নাসামনি উত্তর দিকের দেওয়ালের কাছে, আর পুরুষেরা তাঁর বাঁ দিকে। কেবল কয়েকজন ভক্ত সোফার কাছে দক্ষিণ দেওয়ালের দিকে পিঠ ক'রে, অন্যদের থেকে খুব কাছে বসে। কয়েকবছর আগে মহিলাদের এই সুবিধা ছিল, এবং তারপর কোন বিশেষ কারণে তার বদল হয়। হিন্দুদের ঐতিহ্য অনুসারে স্ত্রী-পুরুষ আলাদা বসে, শ্রীভগবানও তা অনুমোদন করতেন কারণ তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে আধ্যাত্মিক শক্তি বিক্ষুব্ধ হওয়া সম্ভব। হলঘর ছাড়া স্ত্রী-পুরুষ স্বচ্ছন্দ ভাবে মেলামেশা করে।

আবার ধূপ জ্বলছে। কয়েক জন আগে থেকেই চোখ বন্ধ করে ধ্যানে মগ্ন, কিন্তু অন্যেরা আরাম করে বসে শ্রীভগবানকেই দেখছে। একজন দর্শনার্থী স্বরচিত শ্রীভগবানের প্রশস্তি গান করছে। একজন হয়ত কোথাও গিয়েছিল, ফিরে এসে তাঁর কাছে ফল নিবেদন ক'রে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল। সেবক কিছুটা তাকে ভগবানের প্রসাদ বলে ফিরিয়ে দিলে; হলে আসা ছোট ছেলে-মেয়েদের কিছু দেওয়া হল, জানলায় দাঁড়ান কিংবা দরজায় উঁকি দেওয়া বাঁদরকে, ময়ূরদের আর যদি এসে পড়ে তবে লক্ষ্মী গরুকেও দেওয়া হল। বাকীটা পরে খাওয়ার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় আর সমানভাবে ভক্তদের পরিবেশন করা হয়।

শ্রীভগবান নিজে কিছুই নেন না। তাঁর চাহনিতে অনবদ্য কৃপালুতা। এটা যে কেবল ভক্তদের তাৎকালিক ব্যথা-বেদনার জন্য তা নয়, যেন সমগ্র সংসার-ভারের জন্য তথা মানবজীবনের জন্য। আর এই কোমলতা সত্ত্বেও, যে কোনদিন আপোস করেনি কিন্তু জয় করে এসেছে এরূপ একটি দৃঢ়তাও তাঁর মুখে আছে। এই কঠোর ভাবটা তাঁর হাল্কা সাদা চুলে ঢেকে যায় কিন্তু সন্ন্যাসীর নিয়ম অনুযায়ী প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে তিনি মাথা ও দাড়ি কামান। অনেক ভক্তই তাঁর এই কামানোতে খেদ করে—কারণ এই শুভ্র কেশে তাঁর কোমলতা ও

কৃপালুতা আরও বেশী ফুটে ওঠে—কিন্তু কেউ তাঁকে এ-কথা বলতে সাহস করে না।

তাঁর মুখশ্রী জলের মত, সর্বদাই পরিবর্তনশীল, তবু একই রূপ। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, এই কোমলতা আর এই পাষাণ সদৃশ দৃঢ়তা, এই হাসি আর এই করুণার ভাব কত দ্রুত তাঁর মুখে খেলে যেত। প্রত্যেকটি ভাব এতই পরিস্ফুট হত যে মনে হত এটি একজন মানুষের মুখ নয় পরন্তু সমস্ত মানবজাতির মুখচ্ছবি। খুঁটিয়ে দেখলে তাঁকে সুন্দর বলা যায় না কারণ মুখের গড়ন সুঠাম নয় কিন্তু সর্বাপেক্ষা সুন্দর মুখও তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যেত। তাঁর মুখমণ্ডলে এমনই একটা সততা আছে যে তার ছাপ স্মৃতিতে গভীর ভাবে পড়ে আর অন্যগুলো মিলিয়ে গেলেও সেটা থেকে যায়। যারা তাঁকে অল্পক্ষণের জন্য দেখেছে কিংবা তাঁর ছবি দেখেছে তারাও, যাদের খুব ভাল ভাবে জানে তাদের থেকে তাঁকে স্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারে। মনে হয় যে প্রেম, যে অনুকম্পা, যে জ্ঞান, যে বিবেচনা, যে বালক-সুলভ সরলতা সেই ছবি থেকে ফুটে ওঠে, সেটা নিশ্চয়ই যে-কোন জপের থেকে ধ্যানের বেশী প্রেরণাদায়ক।

সোফার সামনে দেড় ফুট উঁচু একটা রেলিং যা সরানো যায়। এটা নিয়ে প্রথমে মতানৈক্য হয়েছিল। আশ্রম কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করলে, সাধারণতঃ শ্রীভগবান স্পর্শ করা পছন্দ করেন না আর কেউ চেষ্টা করলে পিছিয়ে যান, এছাড়া একজন বিপথচালিত ভক্ত, যে একটি নারিকেল ভেঙ্গে তার জল দিয়ে তাঁকে অভিষেক করতে গিয়েছিল, তার কথা মনে ক'রে তারা ভাবলে, এইটুকু ব্যবধান করা ভাল। অপরপক্ষে অনেক ভক্ত মনে করলে এতে তাদের ও শ্রীভগবানের মধ্যে আড়াল করা হল। তিনি এটা সমর্থন করেন কিনা এ নিয়ে তাঁর সামনেই আলোচনা চলতে লাগল কিন্তু কেউ তাঁকে একটা মতামত দেওয়ার কথা বলতে সাহস করলে না। ভগবানও অবিচলিত ভাবে বসে রইলেন॥

কয়েকজন ভক্ত তাদের আসন থেকে না উঠেই ভগবানের সঙ্গে তাদের নিজস্ব বিষয়, বা তাদের বন্ধুবান্ধবদের বা অনুপস্থিত ভক্তদের সম্বন্ধে কথা বলে কিংবা সিদ্ধান্তগত কোন প্রশ্ন করে। প্রত্যেকেই নিজেকে একটা বড় পরিবারভুক্ত মনে করে। হয়ত কারও একটা ব্যক্তিগত কথা আছে; সে উঠে শ্রীভগবানের সোফার কাছে গিয়ে নীচু গলায় বললে কিংবা একটা কাগজে লিখে তাঁর হাতে দিলে। হয়ত তার একটা উত্তর চাই কিংবা তার বিশ্বাস যে, কেবল শ্রীভগবানকে জানালেই কাজ হবে।

একজন মা তার ছোট শিশুটি দেখাতে নিয়ে এল আর তিনি তাকে দেখে মায়েব অপেক্ষা অধিক স্নেহে হাসলেন। একটি ছোট মেয়ে তার পুতুল নিযে এসে তাকে সোফার সামনে প্রণাম করালে আর তারপব শ্রীভগবানকে দেখালে, তিনি সেটি হাতে নিয়ে দেখলেন। একটি ছোট বাঁদর দরজার ফাঁকে ঢুকে একটা কলা নিয়ে পালাতে চায়, একজন সেবক তাকে তাড়া করলে, সে এক দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল, আর শ্রীভগবান ফিস-ফিস করে বললেন, "তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! ঐ এল বলে।" একজন অদ্ভুত চেহারা গেরুয়া ও জটাধারী সাধু সোফার কাছে একহাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। একজন স্যুটপরা সমৃদ্ধ সহুরে ভদ্রলোক বেশ সুন্দর ভাবে প্রণাম ক'রে সামনে বসে পড়ল; তার সঙ্গী নিজের ভক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে হয়ত প্রণামই করলে না।

একদল পণ্ডিত সোফার কাছে বসে একটা সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করছে, মাঝে মাঝে কোন স্থান স্পষ্টীকরণের জন্য উঠে তাঁর কাছে যাচ্ছে। একটি তিন বছরের ছেলেও কারও চেয়ে কম যায় না, সে তার গল্পের বই নিয়ে হাজির আর শ্রীভগবানও সেটি সমান স্নেহ ও আগ্রহের সঙ্গে দেখলেন; বইটা ছিঁড়ে গেছে তাই সেবককে বাঁধিয়ে দিতে বললেন আর পরের দিন সুন্দর বাঁধান বইটি ফেরত দিলেন।

সেবকও অত্যন্ত পরিশ্রমী। তাকে হতেই হবে কারণ শ্রীভগবান

অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন ও কর্মদক্ষ, কোন এলোমেলো কাজ নেন না। সেবকেরা অনুভব করে যে তারা শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহভাজন, পণ্ডিতেরাও তাই মনে করে, তিন বছরের শিশুও তাই। তাঁর গভীর সংবেদনশীলতার জন্য বিভিন্ন চরিত্র ও মানসিকতা সম্পন্ন সকলেই মনে করে যে তারা ভগবানের বিশেষ ব্যক্তিগত অনুগ্রহ লাভ করেছে।

ক্রমশঃ একজনের শ্রীভগবানের পথ নির্দেশনার সূক্ষ্মতা ও দক্ষতা বা মানবীয় নিপুণতা অনুভূত হয় কারণ কৃপা অলক্ষ্য। সবাই তার কাছে বই-এর খোলা পাতা। তিনি হয়ত ধ্যানের পরিপক্বতা বোঝার জন্য কোন একজন ভক্তের দিকে গভীর দৃষ্টিতে কটাক্ষে দেখলেন, মাঝে মাঝে কারও দিকে হয়ত পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন আর তাঁর কৃপা সাক্ষাৎভাবে বর্ষিত হয়। কিন্তু এ সবই যতদূর সম্ভব সবার অগোচরেই হয়—মনোযোগ এড়াবার জন্য কটাক্ষটি অপাঙ্গে, একটি পূর্ণদৃষ্টি হয়ত খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে যখন সে স্বয়ং চোখ বন্ধ করে বসে আছে আর জানেও না ; এর কারণ সম্ভবতঃ দু'টি, একটি অন্য ভক্তদের ঈর্ষা এড়ানো আর যে তাঁর কৃপা পেল তার অহমিকা না বাড়ানো।

নবাগতদের প্রতি প্রায়ই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়—এতে ভক্তেরা একরকম অভ্যস্ত হয়ে গেছে। হয়ত প্রত্যেকবার হলঘরে ঢুকলে হেসে স্বাগত করা, ধ্যানের সময় তাকে লক্ষ্য করা, অনুকূল মন্তব্যের দ্বারা উৎসাহ দেওয়া হয়। এটা হয়ত কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ বা মাস চলল যতক্ষণ না তার হৃদয়ে ধ্যানের ধারাটি স্পষ্ট হয় বা সে ভগবানের স্নেহবন্ধনে বাঁধা পড়ে। কিন্তু এমনই মানুষের স্বভাব যে এই মনোযোগে হয়ত তার অহংকার বেশ পুষ্ট হল, সে ভাবতে আরম্ভ করে যে সে অন্য ভক্তদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর এটা কেবল ভগবানই জানেন। তারপর যতক্ষণ না তার গভীর ধীশক্তি তার অন্তরে গভীর প্রতিবেদন উৎপন্ন করে, তাকে কিছুদিন উপেক্ষা করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সর্বদাই এরূপ হয় না, কখন কখন শ্রীভগবানের অনুগ্রহের কল্পিত আত্মম্ভরিতা থেকেই যায়।

প্রায় সাড়ে আটটার সময় শ্রীভগবানের কাছে খবরের কাগজগুলো আনা হয় আর কোন প্রশ্নোত্তর না চললে তিনি কতকগুলো খুলে দেখেন, হয়ত কোন বিশেষ খবরের উপর একটি মন্তব্য করলেন—কিন্তু এটা কখন রাজনীতি সংক্রান্তভাবে হয় না। কতকগুলো খবরের কাগজ আশ্রমের, কতকগুলো কোন কোন ভক্তের ব্যক্তিগত আনানো, হয় তাঁর সেবার জন্য কিংবা ভগবানের ছোঁয়া কাগজ পড়ার ইচ্ছায় সেগুলো প্রথমে শ্রীভগবানের কাছে দেওয়া হয়। যেটা ব্যক্তিগত কাগজ সেটা দেখলেই বোঝা যায় কারণ তিনি সেটি বেশ যত্নের সঙ্গে মোড়ক থেকে খোলেন আর পড়া হলে আবার সেই মোড়কে ভরে রাখেন যাতে কাগজটি যেমন এসেছিল, সে ঠিক সেই ভাবেই পায়।

দশটা বাজতে দশ মিনিট থেকে দশটা বেজে দশ মিনিট অবধি শ্রীভগবান পাহাড়ে যেতেন, কিন্তু শেষ কয়েক বছর তাঁর শরীর অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় আশ্রমের চৌহদ্দীর মধ্যেই বেড়ান। গভীর ধ্যানে মগ্ন না থাকলে তিনি ঘরের বাইরে গেলে সবাই উঠে দাঁড়ায়। এই অবসরে ভক্তেরা স্ত্রী-পুরুষে ছোট ছোট দলে কথাবার্তা বলে, কেবল হলঘরে বসার সময় তারা পৃথক বসে। কেউ খবরের কাগজ পড়ে, কেউ বেঁটে খাটো, চটপটে, যে সবার সম্বন্ধে সবকিছু জানে সেই ডাকবাবু 'রাজা'র কাছ থেকে আপন আপন চিঠিপত্র নেয়।

শ্রীভগবান ফিরে এলেন, যারা বসেছিল, তারা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে তিনি বসে থাকতে ইঙ্গিত করেন। "যদি তোমরা আমি এলে উঠে দাঁড়াও তবে যে-কেউ এলেই উঠে দাঁড়াতে হবে।" এটা কেবল যে পরম্পরাগত লোকতন্ত্রের অনুরোধে তা নয়, তার থেকে কিছু বেশী ; যিনি মূর্তিমান ঈশ্বর তিনি সবাইকেই ঈশ্বর দেখেন। একবার গ্রীষ্মকালে একটা ইলেকট্রিক পাখা তাঁর কাছে জানলার ধাপে রাখা হয়েছিল। তিনি সেবকদের সেটি বন্ধ করতে বলেন, সেবক অসম্মত হলে তিনি নিজেই প্লাগটা খুলে বন্ধ করে দিলেন। ভক্তদের গরম

হচ্ছে ; তাঁর একলার জন্য পাখা কেন ? পরে একটা ছাত-পাখা লাগান হল আর সবাই সমান ভাবে সুবিধা পেল।

এখন শ্রীভগবানের কাছে ডাক এনে রাখা হল। একটা চিঠিতে কেবল 'মহর্ষি, ভারত' ঠিকানা লেখা। একটি মোড়কে আমেরিকা থেকে পাঠানো আশ্রমের বাগানে লাগানোর জন্য ফুলের বীজ। বিশ্বের সকল দেশ থেকে ভক্তদের চিঠি। শ্রীভগবান প্রত্যেকটি চিঠি মনোযোগ দিয়ে পড়েন, এমন কি ঠিকানা শীলমোহরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেন। যদি কোন পত্রপ্রেরক ভক্তের বন্ধু-বান্ধব হলঘরে থাকে তবে তাদের বলেন। তিনি নিজে কোন চিঠির উত্তর দেন না। এ থেকে জ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁদের কোন সম্বন্ধ হয় না, স্বাক্ষর করার জন্য কোন নামও নেই। উত্তরগুলো আশ্রম অফিসে লেখা হয় আব কোন অসঙ্গতি আছে কিনা দেখবার জন্য অপরাহ্নে তাঁর কাছে আনা হয়। যদি কিছু বিশেষ বা ব্যক্তিগত উত্তব দেওয়ার থাকে তিনি তার নির্দেশ দেন, পরন্তু তাঁর উপদেশ এত স্পষ্ট যে, যে-কোন ভক্ত সেগুলো অনায়াসে মুখস্থ বলতে পারে—বাক্যের মধ্যে তিনিই কেবল অনুগ্রহটুকু দিতে পারেন।

চিঠির উত্তর দেওয়া হয়ে গেলে সবাই স্থির হয়ে বসে থাকে, এই নীরবতায় কোন মানসিক উদ্বেগ নেই, সেটি শান্তিতে ভরপূর! হয়ত কেউ বিদায় নিতে এল, আশ্রম ত্যাগ করে যেতে হচ্ছে বলে কোন অশ্রুভারাক্রান্ত-নয়না মহিলা এসে দাঁড়াল আর ভগবানের দীপ্তদৃষ্টি তাকে স্নেহে ও উৎসাহে ভরিয়ে দিলে। সে দৃষ্টির কি বর্ণনা হয়! সেই চোখের দিকে চাইলে মনে হয় যে সংসারের সমস্ত দুঃখ, অতীতের সকল সংঘর্ষ, মনের সব সমস্যা দূর হয়ে গিয়ে একজন যেন শান্তির পরম আশ্রয়ে এসে গেল। কথার কোন প্রয়োজন নেই ; তাঁর করুণায় হৃদয় বিচলিত হয়ে ওঠে আর এভাবে বাহ্য গুরু একজনকে আন্তর গুরুর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

এগারটার সময় আশ্রমের খাওয়ার ঘণ্টা বাজে। শ্রীভগবান ঘর

ছেড়ে না যাওয়া অবধি সবাই উঠে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা যদি সাধারণ দিন হয় তবে ভক্তেরা যে যার বাড়ী চলে যায় কিন্তু যদি কোন বিশেষ উপলক্ষ্য বা কোন ভক্তের 'মানসিক' রূপে দেওয়া ভিক্ষার দিন হয় তবে সকলেরই নিমন্ত্রণ হয়।

সেবকেরা ও ব্রাহ্মণ মহিলারা সারির মধ্যে দিয়ে ভাত, ডাল, তরকারি, আচার পাতার ওপর পরিবেশন করে যায়। সবাই শ্রীভগবানের আরম্ভ করার জন্য অপেক্ষা করে আর তিনিও সবার পরিবেশন না হওয়া অবধি অপেক্ষা করেন। সবাই একমনে ভোজন শুরু করে, পাশ্চাত্য দেশের মত আলাপ আলোচনা চলে না। একজন আমেরিকান মহিলা ভারতীয় রীতিতে অসুবিধা অনুভব ক'রে নিজে একটি চামচ এনেছে। একজন পরিবেশনকারী তাকে খানিকটা তরকারি দিয়ে বললে যে শ্রীভগবানের নির্দেশ মত ঝাল না দিয়ে বিশেষ ভাবে তার জন্য তৈরি করা হয়েছে। আর সবাই হাত দিয়ে খেতে আরম্ভ করলে। সেবকেরা পঙ্‌ক্তির মাঝ দিয়ে দ্বিতীয় বার পরিবেশন করলে, তারপর জল, মোর (ঘোল), ফল, মিষ্টি দিয়ে গেল। শ্রীভগবান একজন সেবককে রাগতঃ ভাবে ডাকলেন। যখন জীবনাদর্শে কোন অসাবধানতা হয় তিনি রাগ দেখাতে পারেন। সেবক সবার পাতে এক সিকি আম দিয়ে তাঁর পাতে আধখানা আম দিয়ে গেছে। তিনি সেটা তুলে দিয়ে যেটা সব থেকে ছোট টুকরা পেলেন তাই নিলেন।

এক এক করে সবার খাওয়া হয়ে গেল আর যার যেমন হয়ে গেল সে উঠে পড়ল, বাড়ী যাওয়ার আগে বাইরের কলে হাত ধুয়ে নিলে।

অপরাহ্ন ছ'টা অবধি শ্রীভগবান বিশ্রাম নেন আর হলঘরটি ভক্তদের জন্য বন্ধ থাকে। আশ্রম কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে যে শ্রীভগবানের শারীরিক দুর্বলতার জন্য এই দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম প্রয়োজন কিন্তু এটা কি করে করা যায়? তাঁকে যদি এমন কোন সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয় যাতে ভক্তদের অসুবিধা হয় সম্ভবতঃ

তিনি অস্বীকার করবেন। এরূপ ঝুঁকি নেওয়ার থেকে ব্যক্তিগত ভাবে ভক্তদের অনুরোধ ক'রে এই সময় হলঘরে ঢোকা নিবৃত্ত করলে। কয়েকদিন বেশ চলল, তারপর একজন নবাগত না জেনে খাওয়ার পর হলঘরে ঢুকে গেল। একজন সেবক তাকে বেরিয়ে আসার জন্য বললে, কিন্তু শ্রীভগবান তাকে ডেকে কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। পরের দিন ভোজনের পর শ্রীভগবানকে হলঘরের বাইরে সিঁড়িতে বসে থাকতে দেখা গেল, যখন সেবক কারণ জানতে চাইল উত্তর হল "মনে হচ্ছে দু'টা অবধি এ ঘরে কারও প্রবেশ নিষেধ।" অনেক কষ্টে তাঁকে বিশ্রামের জন্য রাজী করান হল।

বিকালে হয়ত হলঘরে নূতন মুখ দেখা যায় কারণ খুব কম ভক্তই সারাদিন বসে থাকে। এমন কি যারা আশ্রমের কাছে থাকে তাদেরও ঘরের কাজ বা অন্য কাজ থাকে আর অনেকেরই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজে যেতে হয়।

শ্রীভগবান প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ব্যতীত কোন শিক্ষণীয় বিষয় বলেন না কিংবা কদাচিৎ কখন বলেন। আর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ও ধর্মাধ্যক্ষের ভঙ্গীতে বলেন না পরন্তু কথাবার্তার ছলে প্রায় হাস্য-পরিহাসের সঙ্গে বলেন। কিংবা প্রশ্নকারীকেও তিনি বলেছেন বলে মেনে নিতে হয় না, সে যতক্ষণ না সঠিক ভাবে বুঝতে পারছে ততক্ষণ বিচার চালিয়ে যেতে পারে। একজন থিয়সফিষ্ট জিজ্ঞাসা করলে যে শ্রীভগবান অদৃশ্য গুরুবর্গকে খোঁজা অনুমোদন করেন কিনা, তিনি তৎক্ষণাৎ পরিহাসচ্ছলে বললেন, "অদৃশ্য হলে তাদের দেখবে কি করে?" "চেতনায়" থিয়সফিষ্ট উত্তর দিলে, তারপর প্রকৃত উত্তর "চেতনায় আর 'অন্য' বলে কেউ নেই।"

অন্য কোন আশ্রমের একজন "আমার একথা বলা কি ঠিক হবে যে আপনি জগতকে বাস্তব বলেন না, আমরা কিন্তু বলি।"

শ্রীভগবান পরিহাস দিয়ে তর্ক এড়িয়ে গেলেন "অপরপক্ষে, যেহেতু আমরা বলি যে সত্তা এক, আমরা জগতকে পূর্ণ বাস্তব

বলি, আর সবচেয়ে বড় কথা, আমরা ঈশ্বরকে পূর্ণসৎ বলি কিন্তু ত্রিতত্ত্ব ব'লে তোমরা জগতকে এক তৃতীয়াংশ সত্য বল আর ঈশ্বরকেও এক তৃতীয়াংশ সত্য মনে কর।"

সবাই হেসে উঠল তা সত্ত্বেও কয়েকজন ভক্ত দর্শনার্থীর সঙ্গে তর্ক বিচারে প্রবৃত্ত হল, তখন শ্রীভগবান মন্তব্য করলেন "তর্ক বিচারে বিশেষ কোন ফল নেই।"

সিদ্ধান্তবাদী ও তার্কিক দার্শনিকরা এরূপ বাদ-প্রতিবাদ ভালবাসে ও লোকেদের একটা ভুল বুঝতে সাহায্য করে যে তারা একজনের সঙ্গে অন্যের মতবাদের তুলনামূলক বিচার করছে, এটা কিন্তু ঠিক নয়। সিদ্ধান্ত শিক্ষা নয়, শিক্ষা একটা মানসিকতা যেখান থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার ব্যবহারিক ক্রিয়া সঞ্চালিত হয়, সেজন্য বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তও বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পথের আধার হতে পারে পরন্তু তাদের সবার লক্ষ্য এক—যেখানে কোন চিন্তা যায় না আর শব্দ দিয়ে যা বর্ণনাও করা যায় না। একজন আধ্যাত্মিক গুরু বাদানুবাদকে প্রশ্রয় দেন না বা সর্বদা উপেক্ষাও করেন না। বুদ্ধ সিদ্ধান্তগত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করতেন আর কোরানে বৃথা বাদানুবাদ থেকে সাবধান হ'তে বলে। পরবর্তীকালে যখন আধ্যাত্মিক শক্তি মন্দীভূত হল তখনই ব্যাখ্যাতাগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। একেই প্রকৃত শিক্ষা ব'লে তারা প্রভূত ক্ষতি করে।

ভগবানের পুরাতন ভক্তেরা খুব কমই প্রশ্ন করে, কেউ কেউ কখনই করে না। প্রায়ই নবাগতরা প্রশ্ন করে ও উত্তর পায়। উত্তরগুলো শিক্ষা নয়, কেবল শিক্ষা বিষয়ে পথ-প্রদর্শক।

যদি ইংরাজীতে প্রশ্ন করা হয় তিনি একজন দোভাষীর সাহায্যে উত্তর দেন। যদিও তিনি অনর্গল ইংরাজী বলতে পারেন না কিন্তু সব বোঝেন আর সামান্য ভুল হলে দোভাষীকে সংশোধন করেন।

যদিও সিদ্ধান্তগতভাবে অপরিবর্তনীয়, তাহলেও শ্রীভগবানের উত্তর প্রত্যেক প্রশ্নকারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ভিন্ন। একজন খ্রীস্টীয়

মিশনারী জিজ্ঞাসা করেছিল, "ঈশ্বর কি সগুণ।" অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা না করে শ্রীভগবান তার জন্য উত্তরটা সহজ করার প্রয়াসে বললেন, "হাঁ, তিনি সর্বদাই উত্তম পুরুষ 'আমি' তোমার সম্মুখে নিত্য বিরাজমান। তুমি যদি সাংসারিক বিষয়কে প্রাধান্য দাও তবে মনে হবে ঈশ্বর দূরে চলে গেছেন। আর যদি সব ছেড়ে তাঁকেই খোঁজো, তিনি একমাত্র 'আমি' বা আত্মা-রূপে থাকবেন।"

মিশনারীর কি মনে পড়বে যে এই নামটিই ঈশ্বর মোজেসের মাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন, তাই ভাবি! শ্রীভগবান কখন কখন ঈশ্বরের নামের মধ্যে 'আমি আছি'কে শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করে মন্তব্য করেছেন।

পৌনে পাঁচটা বাজল। শ্রীভগবান খিলধরা হাঁটু ও পা মালিশ করলেন, লাঠির জন্য হাত বাড়ালেন। কোন কোন সময় দু'তিনবার চেষ্টা করে সোফা থেকে উঠতে হয়, তবু সাহায্য নেবেন না। তাঁর অনুপস্থিতির কুড়ি মিনিটে ঘরটি ঝাড়ু দেওয়া হল আর সোফার চাদরটি পরিপাটি করা হল।

তাঁর ফিরে আসার দশ কি পনের মিনিটের মধ্যে বেদ-পারায়ণ শুরু হয়, তারপর তাঁর লিখিত 'উপদেশসার' তিরিশটি শ্লোক পাঠ হয়। পারায়ণ প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট চলে। প্রায়ই এটি চলাকালে তিনি স্থির হয়ে বসে থাকেন, তাঁর মুখমণ্ডল শাশ্বত, অবিকম্পিত, সুমহান যেন পাথরে খোদাই করা মূর্তি। শেষ হয়ে গেলে সবাই শান্ত হয়ে সাড়ে ছ'টা অবধি বসে থাকে। এই সময় মহিলাদের আশ্রম ত্যাগ করার সময়। কোন কোন পুরুষ ভক্ত হয়ত আরও একঘণ্টা থাকে, বেশীর ভাগই নীরবে ধ্যান করে। কখন কখন কথাবার্তা হয় বা তামিল ভক্তিগীত গান হয়, তারপর সান্ধ্য ভোজন ও ভক্তদের বিদায়।

ভোজনের পর সান্ধ্য সম্মেলন বিশেষ ভাবে লোভনীয় কারণ এতে প্রাতঃকালীন পারায়ণের গাম্ভীর্যের সঙ্গে পরবর্তী সময়ের সহজ আলাপ-চারি সম্মিলিত হয়। শ্রীভগবান বাহ্যতঃ হাস্য পরিহাস করলেও

অনুভব করতে পারলে সেই গাম্ভীর্য যে সব সময় বিদ্যমান থাকে বোঝা যায়।

একজন সেবক একটা মলম নিয়ে পা মালিশ করতে এল, কিন্তু তিনি সেটা তার হাত থেকে নিয়ে নিলেন। ওরা তাঁর জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়। কিন্তু তিনি তাঁর নিষেধকেও পরিহাসে তলিয়ে দিলেন, "তোমরা এতক্ষণ দর্শন ও ভাষণ দ্বারা কৃপা পেয়েছ এখন আবার স্পর্শের দ্বারাও পেতে চাও? এখন স্পর্শের দ্বারা আমায় একটু অনুগ্রহ পেতে দাও।"

যতই হোক, কাগজে যা চিত্রণ করা যায় সেটা তাঁর রসবোধের অতি তুচ্ছ প্রতিচ্ছবি। তাঁর কথাগুলো যতই প্রখর ও সরস হোক না কেন, বাচনভঙ্গীর তুলনায় কিছু নয়। তিনি যখন গল্প বলতেন তখন একেবারে অভিনেতা হয়ে যেতেন আর প্রতিটি চরিত্র এমন করে বলতেন যেন সেটা নিজেরই কাহিনী। যারা ভাষা বুঝত না তারাও তাঁর চরিত্র-চিত্রণ দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। তাঁর বাস্তব জীবনটাও একটা চরিত্র অভিনয়, তাই না বাস্তব জীবনে হাল্কা হাস্য পরিহাস থেকে গভীর সহানুভূতিতে এত দ্রুত পরিবর্তন হতে পারত।

এমন কি তাঁর প্রারম্ভিক জীবনে, যখন তাঁকে সব বিষয়ে উদাসীন মনে হত, তখনও তাঁর মধ্যে রসবোধ ছিল আর সেই মজার কথাগুলো তিনি অনেক পরে বলেছিলেন। একবারের কথা যখন তাঁর মা ও অন্যান্য লোকেরা তাঁকে পবড়কুন্নরুতে দর্শন করে, পাছে তিনি পালিয়ে যান তাই তারা দরজাটা বাইরে থেকে ছিটকানি দিয়ে বন্ধ করে সহরে খেতে গিয়েছিল। তিনি কিন্তু জানতেন যে দরজা বন্ধ থাকলেও কবজা থেকে তুলে নিয়ে খোলা যায় সুতরাং ভিড় এড়াবার জন্য ও গোলমাল থেকে বাঁচবার জন্য তারা চলে গেলে তিনি সেই ভাবে বেরিয়ে যান। তারা ফিরে এসে দেখে যে দরজা বন্ধ ও ছিটকানি লাগান রয়েছে কিন্তু ঘরটি খালি। পরে যখন কেউ কোথাও নেই তখন তিনি আবার সেই ভাবেই ফিরে আসেন। তারা তাঁর সামনে বসেই পরস্পর বলাবলি

করতে লাগল যে তিনি সিদ্ধির শক্তিতে বন্ধ দরজা ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে যান ও আবার ফিরে আসেন, কিন্তু তাঁর মুখের একটি রেখারও পরিবর্তন হল না, পরবর্তী কালে যখন তিনি গল্পটি বললেন তখন সমস্ত হলঘরটি হাসিতে ফেটে পড়ল।

বাৎসরিক উৎসবগুলোর সম্বন্ধে দু'চার কথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বেশীর ভাগ ভক্তই তিরুভন্নমালাই-এ স্থায়িভাবে বাস করতে পারে না, মাঝে মাঝে আসে ; সুতরাং সাধারণ ছুটির সময়, বিশেষ করে কার্তিকী উৎসব, দীপাবলী, মহাপূজা (মার সমাধি দিবস) আর জয়ন্তী (শ্রীভগবানের জন্মতিথি) এই চারটি উপলক্ষ্যে সর্বদাই ভিড় হয়। তার মধ্যে জয়ন্তীই প্রধান। এই সময় সব থেকে বেশী লোক যোগদান করে। প্রথমে শ্রীভগবান এই জন্মদিবস পালনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেন—

জন্মদিন পালন করার ইচ্ছা মনে
জন্ম তোমার কবে হল, সে কোন্ ক্ষণে ?
জন্ম বলি তারে, যবে তত্ত্বে প্রবেশ করে,
অনন্ত সত্তার মাঝে, জনম মরণ পারে ॥

জন্মদিনে বিলাপ করো, এসেছ সংসারে।
উৎসব আনন্দে পালন করা এরে
যেন মৃতদেহ সাজান, নানা অলংকারে।
খুঁজে, ডোবো আত্মতত্ত্বে, জ্ঞান বলি তারে ॥

পরন্তু ভক্তদের পক্ষে শ্রীভগবানের জন্মতিথি একটা আনন্দের দিন আর তাঁকে সেটি পালন করার স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল কিন্তু তিনি তখন বা যে-কোন উপলক্ষ্যে তাঁকে পূজা করার বিরুদ্ধে ছিলেন। সেদিন লোকে লোকারণ্য, আর সব ভক্ত তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে বসে ভোজন করত। এমনকি বিরাট খাওয়ার ঘরেও ধরত না। বাইরে চতুষ্কোণ উঠানে বাঁশের খুঁটির ওপর তালপাতার ছাউনি দিয়ে একটা মণ্ডপ তৈরী

হত। সে সময় দরিদ্রনারায়ণ ভোজন হত, কখন কখন পুলিস বা স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ক'রে তু-তিনবারে ভোজন করাতে হত।

এরূপ উৎসবের দিনে শ্রীভগবান রাজার মত একান্তে বসতেন অথচ প্রত্যেকটি পরিচিত ভক্ত এলে অতি অমায়িক ভাবে স্বাগত করতেন। একবার এক কার্তিকী উৎসব উপলক্ষ্যে সমস্ত আশ্রম লোকে ভরে গেল সুতরাং ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রীভগবানের সামনে একটা লোহার রেলিং রাখা হয়েছিল, একটি ছোট ছেলে রেলিং-এ উঠে, টপকে তাঁর কাছে গিয়ে তার নূতন খেলনাটি তাঁকে দেখালে। তিনি সেবকদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, "দেখ, তোমাদের দেওয়া রেলিং কত কাজের!"

১৯৪৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীভগবানের তিরুভন্নমালাই আসার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিরাট উৎসব হয়। সে সময় বহু দূরদেশ থেকে ভক্তরা একত্রিত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা-পূর্ণ স্বুবর্ণ জয়ন্তী স্মারিকা প্রকাশিত হয়।

শেষের কয়েক বছর এমনকি সাধারণ দিনেও পুরাতন হলঘরটি যথেষ্ট হত না, সুতরাং বাইরে তালপাতার ছাউনির তলায় বসাই চলতে লাগল। ১৯৩৯ সালে মার সমাধির ওপর মন্দির তৈরী শুরু হয় আর সেটা ১৯৪৯ সালে শেষ হয়, তার সঙ্গে শ্রীভগবান ও ভক্তদের বসার জন্য একটা নূতন হলঘরও হয়। এটি শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে বংশ-পরম্পরাগত মন্দির নির্মাতাদের দ্বারা নির্মিত একই মন্দিরের তু'টি ভাগ।

মন্দির-ভবনটি পুরাতন হলঘর ও অফিসের দক্ষিণে এবং হলঘর, অফিস ও রাস্তার মাঝখানে। পুরাতন হলঘরের দক্ষিণে, মন্দির-ভবনের পশ্চিম অংশ মন্দির ভাগ আর পূর্ব অংশ একটা বড় চৌকোণা আলো হাওয়াযুক্ত হলঘর, যেখানে শ্রীভগবান তাঁর ভক্তসহ বসবেন।

কুম্ভাভিষেক বা শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সহ মন্দির ও নূতন হলঘরের

উদ্ঘাটন উৎসব অতি চিত্তাকর্ষক হয়েছিল আর বহু ভক্ত তাতে যোগ দিয়েছিল। এটা বহু বছরের চেষ্টা, শ্রম ও আয়োজনের ফল। শ্রীভগবান কিন্তু নূতন হলঘরে যেতে বেশী ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি সাদাসিধা জীবন পছন্দ করতেন আর তাঁকে নিয়ে ধুমধাম করা চাইতেন না। অনেক ভক্তও অনিচ্ছুক ছিল—পুরাতন হলঘরটি তাঁর উপস্থিতিতে গমগম করত, তার তুলনায় নূতন ঘরটিকে উত্তাপহীন নিষ্প্রাণ মনে হত। যখন তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর শরীরটি কালব্যাধির কবলে।

———

চতুর্দশ অধ্যায়

উপদেশ

খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে শ্রীভগবানের উপদেশ অর্থাৎ তাঁর নির্দেশনা ও পথপ্রদর্শন কত গুহ্য ছিল। সবার কাছেই তিনি সহজলভ্য ছিলেন। যদিও প্রশ্নগুলো সাধারণভাবে করা হত ও উত্তরও সবার সামনে দেওয়া হত তা সত্ত্বেও প্রত্যেক ভক্তকে দেওয়া নির্দেশ পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ ও তার চরিত্রের অনুরূপ হত। একবার স্বামী যোগানন্দ, যার আমেরিকায় শিষ্যমণ্ডলী আছে, জিজ্ঞাসা করে যে লোকেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য কি শিক্ষা দেওয়া উচিত, তিনি উত্তর দিলেন, "সেটা ব্যক্তিগত মানসিকতা ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার ওপর নির্ভর করে।" আগে বলা চারজন ভক্ত, এচাম্মাল, মা, শিবপ্রকাশ পিল্লাই ও নাটেশা মুদালিয়ারের কথা স্মরণ করলেই বোঝা যাবে যে প্রত্যেকের জন্য তাঁর নির্দেশ কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন হত।

শ্রীভগবান অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন, তিনি নিজেই একথা বলেছেন, যদিও যারা তাঁর কৃপা পেয়েছে তাদের কোন প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না—তবুও তাঁর কাজ এত গুপ্ত ছিল যে সাধারণ দর্শনার্থী আর যারা দেখতে পেত না তারা মনে করত তিনি কিছুমাত্র উপদেশ দেন না বা মুমুক্ষুদের প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন। এরকম অনেকেই ছিল, যেমন সেই ব্রাহ্মণ যে নাটেশা মুদালিয়ারকে তাঁকে দর্শন করতে বাধা দিয়েছিল।

এই প্রশ্নের সর্বাধিক গুরুত্ব এই যে (শ্রীভগবানের মত বিরল উদাহরণ ব্যতীত) আত্মোপলব্ধি গুরুকৃপা ছাড়া লাভ হয় না। অন্যান্য গুরুবর্গের মতই এ বিষয়ে শ্রীভগবান দৃঢ় নিশ্চয় ছিলেন। সুতরাং সাধকের মাত্র এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে না যে তাঁর শিক্ষা শ্রেষ্ঠ আর তাঁর সান্নিধ্য অনুপ্রেরণাদায়ী, উপরন্তু তাকে এটাও জানতে হবে যে, তিনি দীক্ষা ও উপদেশদাতা গুরুও বটে।

গুরু শব্দটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটা অর্থ হতে পারে যে, যদিও সে নিজে কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেনি তা সত্ত্বেও তাকে (পাদরীদের দীক্ষা দেওয়ার মত) দীক্ষা ও উপদেশ দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সে প্রায়ই উত্তরাধিকারী সূত্রে গুরু হয় আর আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের পক্ষে গৃহ-চিকিৎসকের মত। দ্বিতীয়তঃ গুরু সেই হতে পারে যে এর অতিবিক্ত কিছু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছে আর তার শিষ্যবর্গকে আরও শক্তিশালী উপদেশ (যদিও বাস্তব ক্রিয়া-কলাপ একই) দিয়ে, সে নিজে যতদূর পৌঁছেছে ততদূর এগিয়ে দিতে পারে। কিন্তু শব্দটির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম অর্থ, তিনিই প্রকৃত গুরু যিনি আত্মার অর্থাৎ বিশ্বাত্মার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন। তিনিই সদ্‌গুরু।

শ্রীভগবান এই শেষের অর্থেই শব্দটি ব্যবহার করতেন অতএব তিনি বলতেন "ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা এক।" গুরুর বর্ণনা ক'রে (উপদেশ মঞ্জরী) তিনি বলেছিলেন—

> "তিনিই গুরু যিনি সর্বদা আত্মার গভীরে স্থিত। তিনি নিজের ও অন্যের মধ্যে পার্থক্য দেখেন না আর সকল কল্পিত ভেদ-দৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—অর্থাৎ তিনি নিজে জ্ঞানী বা মুক্ত আর চারিপাশের অন্যেরা অজ্ঞানাচ্ছন্ন বা বদ্ধ মনে করেন না। তাঁর দৃঢ়তা বা আত্মস্থিতি কখনই বিচলিত হয় না আর তিনি কিছুতেই চঞ্চল হন না।"

এরূপ গুরুর প্রতি আত্মসমর্পণ, বাইরের কোন ব্যক্তির প্রতি আত্মসমর্পণ নয় পরন্তু আত্মার বাহ্যিক অভিব্যক্তির প্রতি আত্মসমর্পণ, যার দ্বারা সে আপন অন্তরে আত্মাকে অনুসন্ধান করতে পারে। "গুরু অন্তরে, তিনি যে বাইরে এই অজ্ঞানটা দূর করাই ধ্যানের অভিপ্রায়। তিনি যদি একজন অপরিচিত ব্যক্তি হন, যার জন্য তুমি অপেক্ষা করছ, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অন্তর্ধানও করবেন। এরূপ অস্থায়ী সত্তার অনুভবে কি লাভ হবে? কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজেকে পৃথক বা শরীর

মনে কর ততক্ষণ বাহ্য গুরুর প্রয়োজন আছে আর তাঁকে একজন দেহধারী মনে হবে। যখন শরীরের সঙ্গে ভুল নির্ধারণ মিটে যাবে তখন গুরুকে আত্মা ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।”

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, পূর্ণের সঙ্গে একাত্ম অনুভব ক'রে যিনি এই সর্বোচ্চ অর্থে গুরু, তিনি নিজেকে গুরু বলেন না কারণ তাঁর এরূপ পরিচয় দেওয়ার জন্য কোন পৃথক অহংকার থাকে না। আর এও বলেন না যে তাঁর শিষ্য আছে, কারণ দ্বৈত ভাবের অতীত হওয়ায় তাঁর কোন সম্বন্ধ হয় না।

যদিও জ্ঞানী পূর্ণের সঙ্গে একাত্ম তথাপি তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বাহ্যিকভাবে তাঁর অভিব্যক্তির মাধ্যমরূপে বিদ্যমান থাকে, যার ফলে একজন জ্ঞানীর মানবীয় বৈশিষ্ট্য অন্য একজন জ্ঞানীর থেকে ভিন্ন হতে পারে। শ্রীভগবানের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যেমন তিরুভন্নমালাই-এ তিনি তাঁর প্রারম্ভিক জীবনে উপদ্রবের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাঁকে মৌনী (মৌনব্রতধারী) বলে প্রচার করাকে মেনে নিয়েছিলেন সেরূপ তিনি তাঁর পরিচয়ের স্বীকৃতি বা সম্বন্ধ স্বীকারের সিদ্ধান্তগত অসঙ্গতির সুবিধা নিয়েছিলেন, যাতে যারা তাঁর প্রকৃত ভক্ত নয় তাদের অনর্থক উপদেশ প্রার্থনা করা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এই প্রতিরক্ষা এত ফলদায়ী হয়েছিল যে তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে, কারণ প্রকৃত ভক্তেরা এতে ভ্রমে পড়েনি আর সেটা হওয়াও অভিপ্রেত ছিল না।

শ্রীভগবানের বিবৃতিগুলো মনোযোগ দিয়ে বিবেচনা করা যাক। তিনি কখন কখন বলতেন যে তাঁর কোন শিষ্য নেই, আর কখন স্পষ্টভাবে বলেননি যে তিনি গুরু ছিলেন ; তা সত্ত্বেও তিনি ‘গুরু’ শব্দটি জ্ঞানী অর্থে প্রয়োগ করতেন আর এরূপ ভাবে করতেন যাতে কোন সন্দেহই থাকত না যে তিনি একজন গুরু। তিনি একাধিকবার ‘রমণ সদ্‌গুরু’ গানটি গাইবার সময় তাতে যোগ দিয়েছিলেন।

তাছাড়া যখন কোন ভক্ত বাস্তবিক বিপদে প'ড়ে সমাধানের জন্য

আগ্রহ প্রকাশ করত তিনি তাকে যে ভাবে আশ্বস্ত করতেন তাতে আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত না। একজন ইংরাজ ভক্ত মেজর চাডউইক ১৯৪০ সালে তাকে দেওয়া আশ্বাস বাণীব প্রতিলেখ রাখে—

চাডউইক—ভগবান বলেন তাঁর কোন শিষ্য নেই ?

ভগবান—হাঁ।

চাডউইক—তিনি এও বলেন যে মুক্তিলাভের জন্য গুরুর প্রয়োজন হয় !

ভগবান—হাঁ।

চাডউইক—তাহলে আমি কি করব ? তবে কি আমার এখানে বসে থাকায় কেবল সময় নষ্ট হল ? তবে কি আমায় দীক্ষার জন্য অন্য গুরু খুঁজতে হবে ; কেননা ভগবান বলেছেন, তিনি গুরু নন।

ভগবান—কে তোমাকে অতদূর থেকে এখানে আনলে আর এতদিন এখানে রাখলে ? যদি তোমার অন্য কোথাও গুরু খোঁজার প্রয়োজন হত তবে তুমি অনেক আগেই চলে যেতে।

গুরু বা জ্ঞানী নিজের ও অন্যের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন না। তাঁর কাছে সবাই জ্ঞানী, সবাই তার সঙ্গে এক সুতরাং একজন জ্ঞানী কি ক'রে বলবে যে অমুক অমুক লোক তার শিষ্য ? কিন্তু একজন যে মুক্তি পায়নি, সে বহু দেখে, সুতরাং তার কাছে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ বাস্তব সত্য আর তার সত্য উপলব্ধির জন্য গুরু-কৃপা প্রয়োজন। তার জন্য তিন প্রকার দীক্ষা—স্পর্শ, দৃষ্টি ও মৌন। (শ্রীভগবান এখানে ইঙ্গিত করলেন যে তাঁর দীক্ষা মৌন দীক্ষা ; একথা তিনি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে অনেককেই বলেছেন)।

চাডউইক—তাহলে ভগবানের শিষ্য আছে !

ভগবান—যেমন বললাম, ভগবানের পক্ষ থেকে শিষ্য নেই কিন্তু শিষ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুকৃপা সাগরের মত। সে যদি একটা বাটি আনে, তার এক বাটি লাভ হবে। সাগরের কৃপণতা সম্বন্ধে অভিযোগ করা বৃথা; যার পাত্র যত বড় সে ততখানি লাভ করে। এটা সম্পূর্ণ তার ওপর নির্ভর করে।

চাডউইক—ভগবান যদি স্বীকার না করেন তাহলে তিনি আমার গুরু কিনা—এটা কেবল বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে।

ভগবান—(সোজা হয়ে উঠে বসে দোভাষীর দিকে চেয়ে বেশ জোর দিয়ে) জিজ্ঞাসা কর তো, আমায় কি একটা দলিল লিখে দিতে বলে ?

খুব কম লোকই এরূপ আশ্বাস পাওয়ার জন্য মেজর চাডউইকের মত নাছোড়বান্দা ছিল। দ্বৈত ভাবের কোন উক্তি করা হবে না। সুতরাং তা ব্যতিরেকে শ্রীভগবান যে-কোন বুদ্ধিমান ও শুভেচ্ছা সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে বেশ স্পষ্টই নিজেকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন। আর অনেকেই মৌখিক স্বীকৃতি না পেলেও, এ তথ্য জানত।

এস. এস. কোহেনের লেখা অনুসারে, একজন বাঙ্গালী শিল্পপতি এ. বোস একবার শ্রীভগবানের কাছে একটা স্পষ্ট কথা নিতে চেয়েছিল। সে বলেছিল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সাধনার সফলতার জন্য গুরুর প্রয়োজন।" তারপব পরীক্ষাচ্ছলে হেসে যোগ করলে "ভগবান কি আমাদের জন্য ভাবেন ?"

কিন্তু শ্রীভগবান কথাটা তাকে ফিরিয়ে দিলেন "তোমার প্রয়োজন সাধনা করা; কৃপা সর্বদাই রয়েছে।" একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, "তোমার গলা অবধি জল তবুও তুমি তৃষ্ণার্ত বলে আর্তনাদ করছ।"

এমনকি সাধনারও প্রকৃত অভিপ্রায় হল কৃপালাভের উপযুক্ত হওয়া; শ্রীভগবান কখন কখন এটা একটা উদাহরণ দিয়ে বলতেন যে যদিও সূর্য আকাশে উঠেই আছে তবু তাকে দেখার জন্য তোমাকে

সেদিকে ফিরে চেয়ে দেখার প্রয়াসটুকু করতে হবে। অধ্যাপক বেঙ্কটরামিয়া তার দিনলিপিতে লিখেছে যে ভগবান একজন ইংরাজ দর্শনার্থিনী শ্রীমতী পিগটকে বলেছিলেন, "শিক্ষা, বক্তৃতা, ধ্যান ইত্যাদি অপেক্ষা গুরুকৃপাতেই আত্মোপলব্ধি হয়। ওগুলো গৌণ আর এটাই হল মূল ও মুখ্য কারণ।"

ভগবানের শিক্ষা অন্যের মুখে শুনে একজন মন্তব্য করে যে শ্রীভগবান গুরুর প্রয়োজনীয়তা মানেন না আর সেজন্যই কোন স্পষ্ট দীক্ষার দরকার মনে করেন না, কিন্তু তিনি এ মন্তব্যটি সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন। এস. এস. কোহেন এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়ের একটি কথোপকথন লিপিবদ্ধ করে।

দিলীপ—কেউ বলে যে মহর্ষি গুরুর প্রয়োজন স্বীকার করেন না আবার অন্যেরা অন্য কথা বলে। মহর্ষি কি বলেন?

ভগবান—আমি এ কথা কখনও বলিনি যে গুরুর প্রয়োজন নেই।

দিলীপ—শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই বলেন যে আপনার কোন গুরু ছিল না।

ভগবান—সেটা অবশ্য তুমি কাকে গুরু বল তার ওপর নির্ভর করে। তাঁর সবসময় মনুষ্য দেহধারী হওয়ার প্রয়োজন নেই। দত্তাত্রেয়ের চব্বিশ জন—পঞ্চভূত ইত্যাদি গুরু ছিল, তার অর্থ সংসারের যে-কোন রূপই তাঁর গুরু ছিল। গুরুর প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। উপনিষদ বলে যে গুরু ব্যতীত কেউ মানুষকে মনোজ ও ইন্দ্রিয়জ অনুভবের অরণ্য হতে উদ্ধার করতে পারে না। অতএব একজন গুরু থাকতেই হবে।

দিলীপ—আমার বক্তব্য মানবগুরু। মহর্ষির এরূপ কোন গুরু ছিল না।

ভগবান—আমারও হয়ত কোন না কোন সময়ে একজন

ছিল। আমি কি অরুণাচলের প্রশস্তি গান করিনি? গুরু কি? গুরুই ঈশ্বর বা আত্মা। একজন মানুষ ঈশ্বরের কাছে প্রথমে কামনা পূরণের জন্য প্রার্থনা করে, তারপর এমন একটা সময় আসে যখন আর কামনা পূরণের জন্য নয় কেবল ঈশ্বরের জন্য তাঁকে স্মরণ করে। তখন ঈশ্বর তার প্রার্থনানুসারে তাকে পথ দেখাবার জন্য মানবীয় কিংবা অমানবীয় কোন না কোন রূপে এসে দেখা দেন।

একবার যখন একজন দর্শনার্থী শ্রীভগবানের কোন গুরু ছিল না ব'লে গুরুর বিষয়ে আপত্তি করে তাতে তিনি বলেন যে মানব গুরু যে হতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই তবে এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

বোধহয় ভি· বেঙ্কটরমণের সঙ্গে কথোপকথনের সময়ই তিনি নিজেকে গুরু বলে স্বীকার করার সবচেয়ে কাছাকাছি এসেছিলেন। তিনি একবার তাকে বলেছিলেন "দু'টি কাজ করতে হবে, প্রথমে বাইরে গুরুলাভ তারপর অন্তরে গুরুলাভ। তোমার প্রথমটা আগেই হয়ে গেছে।"

কিংবা বোধ হয় আমি যে স্বীকৃতি পেয়েছিলাম সেটা আরও স্পষ্ট। আশ্রমে কয়েক সপ্তাহ বাস করার পর আমি বোধ করলাম যে তিনি একজন প্রকৃত গুরু, যিনি দীক্ষা ও উপদেশ দেন। আমি ইউরোপে আমার বন্ধু-বান্ধবদের এটা জানাবার জন্য চিঠি লিখলাম। আর ডাকে দেওয়ার আগে শ্রীভগবানকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম এটা পাঠানো উচিত হবে কিনা। তিনি অনুমোদন করলেন ও চিঠিটা পড়ে আমাব হাতে দেওয়ার সময় বললেন, "হাঁ, পাঠিয়ে দাও।"

গুরু হওয়ার অর্থ দীক্ষা ও উপদেশ দেওয়া। এ দু'টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কারণ প্রাথমিক দীক্ষাদান ছাড়া উপদেশ হয় না আর পবে উপদেশ না দিলে দীক্ষার কোন অর্থ হয় না। কখন কখন প্রশ্নটা এরূপ হত যে তিনি দীক্ষা ও উপদেশ দেন কিনা।

শ্রীভগবান দীক্ষা দেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি সর্বদা সোজা উত্তর দেওয়া এড়িয়ে যেতেন। যদি উত্তরটা 'না' হত তাহলে তিনি নিশ্চয়ই 'না' বলে দিতেন, কিন্তু তিনি যদি 'হাঁ' বলতেন তাহলে দীক্ষার জন্য অবাঞ্ছিত অনুরোধের হাত থেকে রক্ষা পেতেন না। আর তাহলে কোন প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা তাদের নিজেদের বিচারশক্তি ও তার অভাবের ওপর না থেকে আপাতদৃষ্টিতে শ্রীভগবানেব কাউকে দীক্ষা দেওয়া ও না দেওয়া—তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা মনে হত। তাঁর উত্তরের সুপ্রচলিত রূপটি মেজর চাডউইককে দেওয়া উত্তরে পাওয়া যায় "দীক্ষা তিনভাবে হয়—স্পর্শ, দৃষ্টি ও মৌন।" নৈর্ব্যক্তিক ও সিদ্ধান্তগত ভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই শ্রীভগবানের একটা সাধারণ রীতি আর তাতেই প্রশ্নবিশেষের উত্তরও পাওয়া যেত। এটা সর্বজন-বিদিত যে হিন্দুমতে এই তিন প্রকার দীক্ষাকে পাখী, যারা ডিমে তা দিয়ে ফোটায় ; মাছ, যারা কেবল দৃষ্টি রাখে আর কচ্ছপ, যারা কেবল চিন্তা করে তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। দৃষ্টি দীক্ষা বা মৌন দীক্ষা এ যুগে খুবই দুর্লভ ; এটা অরুণাচলের, দক্ষিণামূর্তির মৌন দীক্ষা আর এরূপ দীক্ষাই আত্মানুসন্ধানের প্রত্যক্ষ পথের উপযুক্ত যা শ্রীভগবান উপদেশ করতেন। অতএব এই এড়িয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ভাবে ও একটা সুবিধাজনক আড়াল রূপে উভয়তঃই কার্যকরী ছিল।

দৃষ্টি দীক্ষা একটা অত্যন্ত বাস্তব বস্তু। শ্রীভগবান একজন ভক্তের দিকে ফিরলেন, তার দিকে স্থির, দীপ্ত ও একাগ্র নয়নে চাইলেন : চোখের সেই জ্যোতি, সেই শক্তি একজনের চিন্তাজাল ভেদ করে তার অন্তস্তলে চলে যেত। কখন কারো ভিতর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ শক্তি খেলে যেত, কখন একটা অসীম শান্তি বা একটা জ্যোতির বিচ্ছুরণ মনে হত। একজন ভক্ত এটা বর্ণনা করেছে "হঠাৎ ভগবান আমার দিকে তাঁর দীপ্ত ও স্বচ্ছ নয়ন ফেরালেন। এর আগে আমি তাঁর দৃষ্টি সহ্য করতে পারতাম না। এখন আমি সেই অসহনীয় অপরূপ দৃষ্টি দেখতে লাগলাম, কতক্ষণ দেখেছি জানি না। সেই দৃষ্টি আমায়

যেন একটা অনুরণনে ধরে থাকল, আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম।” সবক্ষেত্রেই এরপর একটা নিশ্চিত বিশ্বাস হত যে শ্রীভগবান তাকে আশ্রয় দিয়েছেন আর এখন থেকে তিনিই তার রক্ষক ও পথ-প্রদর্শক। যারা জানত তারা বুঝতে পারত কখন এরূপ দীক্ষা ঘটে গেল, কিন্তু এটা সাধারণতঃ অজ্ঞাতেই হত। এটা বেদপারায়ণের সময় হত যখন খুব কম লোকই লক্ষ্য করত। কিংবা একজন ভক্ত হঠাৎ অতি প্রত্যূষে যখন খুব কম লোক আছে বা কেউ তাঁর কাছে নেই তখন তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য প্রেরণা অনুভব করত। মৌন দীক্ষাও সমান বাস্তব ছিল। যারা তিরুভন্নমালাই-এ শারীরিক ভাবে উপস্থিত হতে পারত না অথচ ভগবানের প্রতি উন্মুখ-হৃদয়ে থাকত, এটা তাদের মধ্যে প্রবেশ করত। কখন কখন এটা স্বপ্নেও প্রদত্ত হত, যেমন নাটেশা মুদালিয়ারের হয়েছিল।

একবার কোন ভক্তকে আশ্রয় আর মৌন দীক্ষা দেওয়ার পর, তার পথ প্রদর্শন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীভগবান অপেক্ষা কোন গুরুই এত সুনিশ্চিত ছিলেন না। তিনি শিবপ্রকাশ পিল্লাইকে ব্যাখ্যা করার সময়, যেটি পরে ‘আমি কে?’ নামে পুস্তিকারূপে প্রকাশিত হয়, এরূপ আশ্বাস দিয়েছিলেন “যে ব্যক্তি গুরুকৃপা একবার লাভ করেছে সে নিশ্চয় রক্ষা পায় আর কখনই পরিত্যক্ত হয় না, যেমন যে শিকার একবার বাঘের মুখে পড়ে সে আর কখনই পালাতে পারে না।”

একজন হল্যাণ্ড দেশীয় ভক্ত, এল হার্টিজ, অতি অল্প সময়ের জন্য আশ্রমে থাকতে সমর্থ হয়েছিল আর যাতে পরে তার মনোবল দুর্বল না হয় সেজন্য একটি আশ্বাস-বাণী প্রার্থনা করেছিল। তাকে বলা হয়েছিল “তুমি ভগবানকে ত্যাগ করলেও ভগবান তোমায় কখনই ত্যাগ করবেন না।”

দু’জন ভক্ত, একজন চেক দেশীয় কূটনীতিবিদ্ ও একজন মুসলমান অধ্যাপক, আশ্বাস-বাণীর অসাধারণ শক্তি ও ঋজুতায় অভিভূত হয়ে

জিজ্ঞাসা করেছিল যে ওটা কি কেবল হার্টজের পক্ষে না সকল ভক্তের জন্য, আর তাতে বলা হয়েছিল "সবার জন্য।"

আর একবার একজন ভক্ত নিজের কোন উন্নতি না বুঝতে পেরে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে বলে, "আমার ভয় হয় যে এ ভাবে চললে আমি বোধহয় নরকে যাব।" এতে শ্রীভগবান উত্তর দেন, "তুমি যদি যাও, ভগবানও তোমার পিছু পিছু গিয়ে তোমায় ফিরিয়ে আনবেন।"

এমনকি ভক্তের জীবনের পরিবেশও গুরু এমন ভাবে সাজিয়ে দেন যে সেটা সাধনার অনুকূল হয়। একজন ভক্তকে বলা হয়েছিল যে "গুরু উভয়তঃ অন্তরে ও বাইরে সুতরাং তিনি বাইরের পরিস্থিতি পরিবর্তন করে তোমাকে অন্তরে আকর্ষণ করেন আর সেই সঙ্গে অন্তরকেও কেন্দ্রাভিমুখী হওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন।"

যদি কোন লোক আন্তরিক ভাবে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবান না হয়ে জিজ্ঞাসা করত যে তিনি উপদেশ দেন কিনা, তিনি হয় হেঁয়ালি করে উত্তর দিতেন নয়ত কোন উত্তরই দিতেন না, আর উভয় ক্ষেত্রেই সেটা নেতিসূচক উত্তর ধরে নেওয়া যায়। বস্তুতঃ তাঁর উপদেশ তাঁর দীক্ষার মতই মৌন। মৌনের দ্বারা মনকে যেদিকে প্রয়াস করতে হবে সেদিকে ফেরানো। ভক্তের অন্ততঃ এটুকু অনুভব হবে আশা করা হত। খুব কম ক্ষেত্রেই মৌখিক আশ্বাসের প্রয়োজন হত।

আগে উল্লিখিত ভি· বেঙ্কটরমণের কাহিনীতে এটি স্পষ্ট হবে। যৌবনে সে শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিল তবু তার একজন রক্তমাংসের জীবিত গুরুর জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হয়। সুতরাং সে তাঁরই কাছে আকুল আগ্রহে প্রার্থনা করে "হে প্রভু, আমায় একজন জীবন্ত গুরু দাও, সে যেন তোমার মত আদর্শ গুরু হয়।" অল্প কিছুদিন পরেই সে শ্রীরমণের কথা শোনে, তখন সবে কয়েক বছর পাহাড়ের তলদেশে আশ্রম হয়েছে। সে কিছু ফুল নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে গেল, ঘটনাটি এমন ঘটল (যখন হওয়ার সর্বদা এরূপই হয়) যে, যখন সে হলঘরে পৌছাল তখন সেখানে কেউ ছিল না। শ্রীভগবান সোফায়

হেলান দিয়ে বসেছিলেন আর তাঁর পিছনের দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ছবিটি যার কাছে বেঙ্কটরমণ প্রার্থনা করেছে। শ্রীভগবান মালাটা ছিঁড়ে দু'ভাগ করে একটি সেই ছবিতে ও অন্যটি মন্দিরে শিবলিঙ্গকে দেওয়ার জন্য সেবককে বললেন। বেঙ্কটরমণের মনের ভার নেমে গেল, সে স্বস্তি পেল। সে তার গন্তব্য স্থলে পৌঁছে গেছে, মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। সে তার আসার কারণ বললে। শ্রীভগবান জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি দক্ষিণামূর্তির কথা জানো ?"

"আমি জানি তিনি মৌন উপদেশ দেন", তার উত্তর। আর শ্রীভগবান বললেন, "সেরূপ উপদেশই তুমি এখানে পাবে।"

বস্তুতঃ এই মৌন উপদেশও বিভিন্ন হত। শ্রীভগবান যা বলেছেন ও লিখেছেন সেটা বেশীর ভাগই বিচার মার্গ সম্বন্ধে, অতএব লোকেদের ধারণা হয়েছিল যে তিনি কেবল জ্ঞানমার্গই নির্দেশ করেন, যেটা অনেকেই এ যুগে কঠিন মনে করে। বাস্তবিক পক্ষে তিনি ছিলেন সার্বজনীন। যেমন জ্ঞানমার্গে সেরূপ ভক্তিমার্গেও প্রত্যেকের মানসিকতার উপযুক্ত নির্দেশ দিতেন। প্রেম ও ভক্তি তাঁর কাছে মুক্তির পথে অতল গহ্বরের সেতু-সরূপ। তাঁর অনেক ভক্তকেই এটি ছাড়া অন্য নির্দেশ দেন নি।

সেই বেঙ্কটরমণ কিছুদিন বাদে কোন সাধন না পেয়ে বিচলিত হল ও অভিযোগ করলে।

"তোমায় এখানে কিসে নিয়ে এল ?" ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন।

"স্বামী ! আপনার চিন্তা।"

"তাহলে সেটাও তোমার সাধনা। সেটাই যথেষ্ট।" আব সত্যই ভগবানের স্মরণ বা মনন সর্বত্র তার নিত্যসঙ্গী হয়ে একরূপ অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেল।

ভক্তিমার্গ ও সমর্পণ প্রকৃতপক্ষে এক। এতে সমস্ত ভারটা গুরুর ওপর সমর্পণ করা হয়। এটাও ভগবান নির্দেশ করতেন। একজন ভক্তকে বলেছিলেন, "আমার কাছে সমর্পণ কর, আমি মনকে শান্ত

করে দেবো।" আর একজনকে বলেছিলেন, "কেবল শান্ত হয়ে থাকো, বাকীটা ভগবান করবেন।" আর দেবরাজ মুদালিয়ারকে বলেছিলেন, "তোমার কাজ কেবল সমর্পণ করা, বাকীটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।" তিনি প্রায়ই বলতেন, "দু'টি পথ, হয় তুমি নিজেকে জিজ্ঞাসা কর 'আমি কে?' নয়ত গুরুকে আত্মসমর্পণ কর।"

তথাপি সমর্পণ করা, মনকে স্থির রাখা আর সম্পূর্ণ ভাবে গুরুকৃপা অনুভব করা সহজ নয়। এর জন্য চাই নিরন্তর অভ্যাস, নিয়ত স্মরণ, আর কেবল গুরুকৃপাতেই এটা সম্ভব হয়। অনেকেই এই প্রচেষ্টায় ভক্তিমার্গের অন্যান্য ক্রিয়া-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিল আর শ্রীভগবান সেগুলো অনুমোদন করেছিলেন ও করার অধিকারও দিয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজে খুব কমই সে-সকল নির্দেশ দিতেন।

সৎসঙ্গের প্রভাব অদৃশ্য হলেও অত্যন্ত প্রবল। আক্ষরিক অর্থে এর অর্থ হল 'সৎ'-এর সঙ্গ, কিন্তু সাধনার উপায় রূপে এর অর্থ করা হয় "যে সৎ বা সত্তার উপলব্ধি করেছে তার সঙ্গ।" শ্রীভগবান এর উচ্চ প্রশংসা করতেন। 'সদ্‌বিদ্যা চত্বারিংশতে'র অনুবন্ধের প্রথম পাঁচটি শ্লোক সৎসঙ্গের মাহাত্ম্যের ওপর লিখিত। এটির অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এচাম্মালের পালিতা মেয়েটি একটা মিষ্টান্নের মোড়কের কাগজে এর একটিকে সংস্কৃত শ্লোক রূপে পায়, সে সেটা শুনে এতই মুগ্ধ হয় যে, সেটা মুখস্থ করে ও শ্রীভগবানের কাছে আবৃত্তি করে। তিনিও এর মহত্ত্ব দেখে তামিলে অনুবাদ করেন। তিনি সে-সময় চত্বারিংশতের অনুবন্ধ লিখছিলেন, যার কতকগুলো পদ স্বরচিত, কতকগুলো অনুবাদ। এই শ্লোকটি ও আরও চারটি সংস্কৃত হতে নেওয়া শ্লোক এর অন্তর্ভুক্ত হয়। তৃতীয়টিতে গুরুসঙ্গকে সর্বোত্তম পন্থা বলা হয়েছে।

সৎসঙ্গ হলে লাভ শম দম নিয়মের
কিবা প্রয়োজন।

তালপত্র বিজনী কিবা করে কাজ
প্রবাহিলে মলয় পবন ॥

ভগবানের সঙ্গ একটা সূক্ষ্ম রূপান্তরের ক্রিয়া করত, যদিও তাব ফল হয়ত অনেক বছর বাদে দৃষ্টিগোচর হত। তিনি সময় সময ভক্তদের এর মূল্য সম্বন্ধে স্পষ্টই বলতেন। তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত, তাঁর বিদ্যালয়ের বন্ধু রঙ্গ আইয়ারকে তিনি একবার বলেছিলেন, "তুমি যদি জ্ঞানীর কাছে থাক তবে তৈরী কাপড় পাবে", এর আশয় হল যে, অন্য উপায় অবলম্বন করলে তোমাকে সূতা দেওয়া হবে আর কাপড়টি তোমাকেই বুনতে হবে।

সুন্দরেস আইয়ার বারো বছর বয়সেই ভগবানের ভক্ত হয়েছিল। তার উনিশ বছর বয়সে সে নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল, তার মনে হতে লাগল, আরও সচেতন ভাবে কিছু একটা চেষ্টা করা উচিত। সে গৃহস্থ ছিল, সহরে বাস করত কিন্তু প্রায় প্রতিদিন শ্রীভগবানকে দর্শন করতে যেত। অতঃপর সে ঠিক করলে যে যতদিন পর্যন্ত সে অনাসক্তি ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা লাভ ক'রে সৎসঙ্গের উপযুক্ত না হচ্ছে ততদিন কঠোর দণ্ড-সরূপ তাঁর কাছে আর যাবে না। সে প্রায় একশ' দিন দূরে রইল তারপর তার মনে উদয় হল "তাই তো, ভগবানের কাছে না গিয়েই বা আমার কি লাভ হচ্ছে?" আবার সে রওনা দিলে। স্কন্দাশ্রমে ঢোকার মুখেই ভগবানের সঙ্গে দেখা হল আর তিনি তাকে "আমার কাছে না এসেই বা কি লাভ হচ্ছে" বলে স্বাগত করলেন। তখন তিনি তাকে সৎসঙ্গের গুরুত্ব ও প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষা দিলেন, যদিও শিষ্য হয়ত সে প্রভাব বুঝতে পারে না কিংবা নিজের কোন উন্নতি দেখতে পায় না। তিনি একে মায়ের ঘুমন্ত ছেলেকে খাওয়ানোর সঙ্গে তুলনা করলেন, ছেলে ভাবে সে গতরাত্রে কিছুই খায়নি কিন্তু মা জানেন যে সে খেয়েছে আর বস্তুতঃ খাদ্যই তাকে শক্তি দিয়েছে।

এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় জ্ঞানীর বাতাবরণের মধ্যে থাকলে

স্বয়ংক্রিয় ভাবে উপকার পাওয়ার থেকেও বেশী হয় ; অভিপ্রায় হল তিনি সচেতনভাবে তাকে প্রভাবিত করেন। যারা অনুভব করেছে তাদের কোন প্রমাণ লাগে না কিন্তু একটি উপলক্ষ্যে ভগবান নিজেই এটি স্পষ্ট ভাবে স্বীকার করেছেন। সুন্দরেস আইয়ার একবার ভগবানের প্রশস্তিসূচক একটি তামিল গীত রচনা করে, তাতে সে লিখেছিল যে ভক্তের রক্ষার জন্য তাঁর নয়ন হতে করুণাধারা প্রবাহিত হয়, ভগবান তাকে সংশোধন করে বললেন, "না, প্রবাহিত নয়, অভিক্ষিপ্ত, কারণ উপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তির প্রতি কৃপাকে চালিত করা একটা সচেতন ক্রিয়া।"

গুরুর পূর্ণ কৃপাভাজন হওয়ার জন্য শিষ্যকেও চেষ্টা করতে হয়, এর জন্য শ্রীভগবান অবিরত যে উপায়ের ওপর জোর দিতেন সেটা হল বিচার, 'আমি কে ?' প্রশ্ন করা। এই যুগের প্রয়োজনানুসারে এই সাধনাই তিনি আমাদের জন্য এনেছিলেন। এতে কোন রহস্য বা গোপনীয় কিছু নেই। এর মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত ছিলেন। "যা তুমি নিজে, সেই নিজের নির্বিশেষ ও পূর্ণ সত্তাকে উপলব্ধির জন্য একমাত্র অব্যর্থ ও প্রত্যক্ষ সাধন হল আত্মানুসন্ধান···। আত্মানুসন্ধান ছাড়া অন্য সাধনার দ্বারা অহংকার বা মন নাশের চেষ্টা হল চোরের পুলিস হয়ে চোর বা নিজেকে ধরার চেষ্টা। অহংকার বা মনের যে কোন বাস্তব সত্তা নেই কেবল আত্মানুসন্ধানই এই সত্যকে প্রকাশ করে এবং একজনকে শুদ্ধ নির্বিশেষ সত্তা বা পূর্ণত্ব উপলব্ধি করার সামর্থ্য দান করতে পারে। আত্মাকে উপলব্ধি করলে আর কিছু জানার থাকেনা কারণ এটাই পূর্ণানন্দ, এটাই সব" (শ্রীরমণবাণী ২য় ভাগ)।

"আত্মানুসন্ধানের উদ্দেশ্য হল সমস্ত মনকে তার উৎসে কেন্দ্রীভূত করা, সুতরাং এটা একটা 'আমি'র অন্য 'আমিকে' অন্বেষণ নয়" (ঐ)।

সমস্ত মনকে তার উৎসে কেন্দ্রিত করা হল তাকে ঘুরিয়ে নিজের অন্তরাভিমুখী করা। এটা মনোবিজ্ঞানের আত্মসমীক্ষা নয়। এটা মনোবিশ্লেষণের চেষ্টা নয় পরন্তু মনকে তার আধার আত্মাতে লয় ক'রে

দেওয়া বা মনের অতীতে আত্মারূপে জাগ্রত করা। মন আত্মার মুখোসের মত কাজ করে। নির্দেশ ছিল, ধ্যানে বসে জিজ্ঞাসা করা "আমি কে?" আর সেই সময় মনকে হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত করা; এই হৃদয় বাঁ-দিকের রক্তমাংসের হৃদয় নয় পরন্তু বুকের ডান দিকে আধ্যাত্মিক হৃদয়। প্রশ্নকর্তার প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রীভগবান প্রথমে বাহ্যিক বা মানসিক ক্রিয়া, হৃদয়ে মনোসংযোগ বা 'আমি কে?' অনুসন্ধানের ওপর জোর দিতেন।

বুকের ডানদিকে আধ্যাত্মিক হৃদয় কিন্তু যোগশাস্ত্রের ষট্‌চক্রের একটি নয়। এটি অহংকার ও আত্মার কেন্দ্র বা উৎস আর তাদের মিলনস্থান। যখন হৃদয়কে এই স্থানে বলার বিষয়ে শাস্ত্রীয় বা অন্য প্রমাণের জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, শ্রীভগবান বলেছিলেন যে তিনি নিজে এটি অনুভব করেছেন ও পরে একটি মালয়ালাম আয়ুর্বেদ* পুস্তকে এর স্বীকৃতি পেয়েছেন। যারা তাঁর নির্দেশ পালন করেছে তাদেরও এই অনুভব হয়েছে। এটা বিচারমার্গের এতই মৌলিক বিষয় যে এখানে "শ্রীরমণবাণী" থেকে একটি কথোপকথন উদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত, সেখানে শ্রীভগবান এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন—

ভক্ত—শ্রীভগবান শরীরের একটি বিশেষ স্থানকে অর্থাৎ বুকের মধ্য ভাগ থেকে দু' আঙুল ডান দিককে হৃদয় বলে নির্দেশ করেছেন।

ভগবান—হাঁ, জ্ঞানীদের অভিজ্ঞতা অনুসারে এটাই আধ্যাত্মিক অনুভূতির কেন্দ্র। এই আধ্যাত্মিক হৃদ্‌কেন্দ্র হৃদয় নামে পরিচিত রক্ত সঞ্চালক মাংস পেশী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আধ্যাত্মিক হৃদ্‌কেন্দ্র শরীরের অঙ্গ নয়। এই 'হৃদয়' সম্বন্ধে তুমি এইটুকুই বলতে পার যে তুমি জাগ্রত, স্বপ্নাচ্ছন্ন, নিদ্রাগত বা কর্মরত কিংবা সমাধি-মগ্ন যে-কোন অবস্থায় থাক

*তুলনীয় "জ্ঞানীর হৃদয় ডানদিকে, কিন্তু মূর্খের হৃদয় বাঁদিকে" এক্লেসিয়াসটেস ১০।২ বাইবেল।

না কেন সেটাই তোমার সত্তার সার, 'তত্ত্বমসি', যার সঙ্গে তুমি একাত্ম।

ভক্ত—তাহলে সেটা কি করে শরীরের কোন একটা স্থানে নির্দিষ্ট করা যায় ? 'হৃদয়ে'র একটা অবস্থান আছে বললে যা স্থান কালের অতীত তাকে স্থূল একটা কিছুতে সীমিত করা হয়।

ভগবান—সে কথা সত্য, পরন্তু যে ব্যক্তি হৃদয়ের অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, সে কিন্তু নিজেকে শরীরের সঙ্গে বা মধ্যে অবস্থিত মনে করে…। যেহেতু জ্ঞানীর দেহাতীত শুদ্ধ চৈতন্যরূপ হৃদয়ের উপলব্ধি কালে তাঁর শরীরের বিন্দুমাত্র অনুভূতি থাকে না, তাঁর দেহচেতনার অবস্থায়, সেই পরম পূর্ণ অনুভবকে তিনি একটা স্মৃতির দ্বারা দেহ-সীমায় অবস্থিত বলে নির্দেশ করেন।

ভক্ত—আমার মত লোকের যার হৃদয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতি নেই বা তার ফলে কোন স্মৃতি নেই তার পক্ষে এটি ধারণা করা খুবই শক্ত মনে হয়। 'হৃদয়ের' এই অবস্থান সম্বন্ধে বোধহয় আমাদের একটা অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হবে।

ভগবান—যদি হৃদয়ের অবস্থান একজন মুর্খের পক্ষেও অনুমানের বিষয় হয় তবে এটা বিবেচনা কবার যোগ্যই নয়। না, তোমায় কোন অনুমানের ওপব নির্ভর করতে হবে না, পরন্তু এটা একটা নির্ভুল স্বজ্ঞা (ইন্‌টিউয়িশন্ বা স্ফুবণাত্মক জ্ঞান)।

ভক্ত —এই স্বজ্ঞা কার আছে ?

ভগবান—সবাব।

ভক্ত—ভগবান কি আমারও এরূপ স্বজ্ঞা আছে বলে মনে করেন ?

ভগবান—না, 'হৃদয়' সম্বন্ধে নয় কিন্তু তোমার পরিচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে হৃদয়ের অবস্থান সম্বন্ধে স্বজ্ঞা আছে।

ভক্ত—ভগবান কি বলছেন যে আমি নিজেই স্বজ্ঞার মাধ্যমে স্থূল শরীরে 'হৃদয়ের' অবস্থান জানি ?

ভগবান—কেন নয় ?

ভক্ত—(নিজের দিকে দেখিয়ে) ভগবান কি আমায় ব্যক্তিগত ভাবে উল্লেখ করছেন ?

ভগবান—হাঁ। এটাই স্বজ্ঞা। এইমাত্র তুমি কিরূপ ভঙ্গীতে নিজেকে নির্দেশ করলে। তুমি কি তোমার আঙ্গুল দিয়ে নিজের বুকের ডানদিকে দেখালে না ? সেটাই হৃদ্-কেন্দ্রের অবস্থান-ভূমি।

ভক্ত—তবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে আমাকে এই স্বজ্ঞার ওপর নির্ভর করতে হবে ?

ভগবান—এতে দোষ কি ? যখন একজন বিদ্যালয়েব ছাত্র বলে, "আমি এই অঙ্কটা ঠিক ঠিক করেছি" বা যখন সে তোমায় জিজ্ঞাসা করে "আমি কি দৌড়ে গিয়ে বইটা নিয়ে আসব ?" সে কি মাথায় হাত দিয়ে দেখায় যে অঙ্কটা ঠিক ঠিক করেছে বা পায়ে হাত দিয়ে বলে, যা তাকে বইটা আনতে তাড়াতাড়ি ছুটিয়ে নিয়ে যাবে ? না, উভয় ক্ষেত্রেই তার আঙ্গুল স্বভাবতঃ বুকের ডান দিক দেখায়, এরূপে তার আমিত্বের কেন্দ্র যে সেখানেই, এই গভীর সত্য অভিব্যক্ত হয়। একটা নির্ভুল স্বজ্ঞা এইভাবে তাকে নিজেকে নির্দেশ করতে 'হৃদয়কে' অর্থাৎ আত্মাকে নির্দেশ করায়। এই ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক ও সার্বজনীন। স্থূল শরীরে হৃদ্‌কেন্দ্রের অবস্থান সম্বন্ধে তোমার এর থেকে বড় প্রমাণ আর কি চাই ?

অতএব উপদেশ হল, ডানদিকে হৃদয়ে মনঃসংযোগ করে বসা ও 'আমি কে ?' জিজ্ঞাসা করা। যখন ধ্যানের সময় চিন্তা ওঠে সেগুলোকে উঠতে না দিয়ে, সেগুলোকে লক্ষ্য করা আর জিজ্ঞাসা করা "এ চিন্তাগুলো কি ? এরা কোথা থেকে এল ? আর কার ?" আমার

—আর আমিটা কে?" এভাবে প্রত্যেকটি চিন্তাকে বিশ্লেষণ করলে সেগুলো অদৃশ্য হয় আর চিন্তা মূল আমি-চিন্তায় পর্যবসিত হয়। মন্দ চিন্তা উঠলে তাদেরও এভাবেই বিশ্লেষণ করতে হয়। মনোবিশ্লেষণ যা দাবি করে, সাধনা বাস্তবিক তাই করে—এ অবচেতন মনের দোষ নষ্ট ক'রে সব কিছু প্রকাশ ক'রে তাদের বিনাশ করে। "হাঁ, ধ্যানে সব রকম চিন্তা হয়, সেটা হওয়াই ঠিক, কারণ যা তোমার মনের গহনে লুকানো আছে সবকিছু ওপরে আনে। সেগুলো উঠে না এলে কি করে নষ্ট হবে?" (শ্রীরমণ বাণী)।

এই প্রকার ধ্যানের পক্ষে সব রকম চিন্তাবৃত্তিই বাধা। কখন কখন কোন ভক্ত হয়ত শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করল যে, সে অনুসন্ধানের সময় 'সোঽহম্' বা অন্য কিছু চিন্তা করবে কিনা, কিন্তু তিনি সর্বদাই এটি নিষেধ করেছেন। আর একবার কোন অবসরে একজন ভক্ত একটার পর একটা সূত্রের কথা বলে গেলে তিনি বোঝালেন "উপলব্ধির পক্ষে যে-কোন চিন্তাই অসঙ্গত। ঠিক পথ হল, নিজের সম্বন্ধে আর অন্য সব চিন্তা দূর করা। চিন্তা এক জিনিস আর উপলব্ধি অন্য বস্তু।"

'আমি কে' প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। এর কোন উত্তর হতে পারে না কারণ এটা হল সকল চিন্তার জনক আমি-চিন্তাকে লয় করা, আর সব ভেদ ক'রে যেখানে কোন চিন্তা নেই সেই শান্তিতে প্রবেশ করা। "ধ্যানের অনুসন্ধানের সময় মনকে ইঙ্গিত-সূচক কোন উত্তর যেমন 'শিবোঽহম্' দেওয়া ঠিক নয়। প্রকৃত উত্তর আপনা হতেই উঠবে। অহংকারের দেওয়া কোন উত্তরই ঠিক নয়।" প্রথম অধ্যায়ের শেষে লেখা চেতনার স্রোত থেকেই উত্তরটা আসবে, সেটা নৈর্ব্যক্তিক হলেও আপন অস্তিত্বময় সত্তার সারভূত স্ফুরণ। অবিরত অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ এটা বার বার অনুভূত হয় আর অবশেষে ধারাবাহিক হয়ে যায়, কেবল যে ধ্যানের সময় তা নয় এমন কি কথা বলা ও কাজের সময়ও অখণ্ড ভাবে থাকে। তখনও বিচার চালিয়ে যেতে

আমার

হবে কারণ অহংকার সেই চেতনার স্রোতের সঙ্গে একটা আপোষ করতে চায় আর একে যদি একবার প্রশ্রয় দেওয়া যায় তবে অহংকার ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, ঠিক যেমন একবার ইহুদির প্রতিশ্রুত দেশে যারা ইহুদি নয় তাদের প্রবেশ করতে দিয়ে হয়েছিল। শ্রীভগবান বেশ জোর দিয়েই অনুসন্ধানকে শেষ অবধি চালিয়ে যেতে বলতেন (উদাহরণ তাঁর শিবপ্রকাশ পিল্লাইকে দেওয়া উত্তর)। যে অবস্থাই আসুক, যে শক্তিই লাভ হোক, যাই অনুভব বা দর্শন হোক যতক্ষণ না কেবল একমাত্র আত্মাই বিরাজমান থাকে ততক্ষণ সব সময়ে সেই এক প্রশ্ন 'এটা কার হচ্ছে' করতে হবে।

অলৌকিক দর্শন ও শক্তি অবশ্যই বাধা সৃষ্টি করে, স্থূল আসক্তি ও সুখের মত মনকে আঁকড়ে ধ'রে থাকে আর মন যেন আত্মায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে এরূপ কল্পনা করিয়ে মোহগ্রস্ত করায়। পার্থিব শক্তি ও সুখের মত এগুলোর কামনাও তাদের লাভ করা অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক। একবার নরসিংহস্বামী শ্রীভগবানের সামনে বসে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও জীবনী তামিলে অনুবাদ করছিল। সবার জানা সেই ঘটনা যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের একটিমাত্র স্পর্শে বিবেকানন্দের সবকিছু এক বলে অনুভবের বর্ণনা প্রসঙ্গ এল। তার মনে হল যে এই রকম অনুভূতি কি বাঞ্ছনীয় নয়? আর শ্রীভগবান তাকে একবার স্পর্শ ক'রে বা দৃষ্টি দিয়ে এরূপ অনুভূতি প্রদান করতে পারেন কিনা। যেমন প্রায়ই হয়ে থাকে, যে প্রশ্নটা তাকে বিক্ষুব্ধ করছিল ঠিক সেটি অন্য একজন ক'রে বসল—এচাম্মাল জিজ্ঞাসা করলে ভক্তেরা সিদ্ধি (যোগশক্তি) লাভ করতে পারে কিনা। এটা সেই সময় যখন শ্রীভগবান 'সদ্‌বিদ্যা চত্বারিংশৎ' লিখছিলেন। এই রচনা ও তার অনুবন্ধকে তাঁর সমগ্র সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা বলা যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি একটি পদ রচনা করেন—

নিত্যস্থিত সত্যের অনুস্মৃতি
তাহাতেই স্থিতি, এই পরম প্রাপ্তি।
আর যাহা লাভ, স্বপ্ন লব্ধ তাহা,
নিদ্রাভঙ্গে কোথা অস্তিত্ব তাহার ?
মায়ামুক্ত ব্রহ্মস্থিত যারা,
সিদ্ধির কুহকে পড়ে না তারা ॥

সিদ্ধি (যোগশক্তি) আধ্যাত্মিক পথের বাধা। শক্তি, এমনকি শক্তির কামনাও, সাধকের গতি রুদ্ধ করে। শ্রীভগবান যে 'দেবিকালোত্তর' সংস্কৃত থেকে তামিলে অনুবাদ করেন তাতে বলা হয়েছে যে "প্রত্যক্ষ ভাবে একজনকে সিদ্ধি দিলেও নেবে না কারণ এগুলো পশু-বাঁধা রজ্জুর মত আর তা শীঘ্র হোক বা বিলম্বেই হোক তাকে নীচে নামাবে। পরম মুক্তি এ পথে লাভ হয় না, অনন্ত চেতনার উপলব্ধি ছাড়া অন্য কোথাও তা লভ্য নয়।"

সিদ্ধীশ্চ বিবিধাকারা পাতালাদি রসায়ণম্।
প্রত্যক্ষেণেহ লব্ধাঽপি নৈব গৃহীত সাধকাঃ ॥ ৬৬
সর্বেতে পশুবন্ধাঃস্যুঃ অধোমার্গ প্রদায়কাঃ !
এতৈর্নাস্তি পরামুক্তি শ্চিদ্রূপব্যাপকং বিনা ॥ ৬৭

বিষয়ান্তর হতে ফিরে যাওয়া যাক—আত্মানুসন্ধানকে কেবল ধ্যানের পদ্ধতি হিসাবে নয় পরন্তু জীবনের আদর্শরূপে শ্রীভগবান নির্দেশ করতেন। এটা কি কেবল ধ্যানের নির্দিষ্ট কালে প্রয়োগ করতে হবে না সদাসর্বদা চালিয়ে যেতে হবে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি উত্তর দিয়েছিলে "সর্বদা"। এ থেকেই সূচিত হয় যে কেন তিনি সাংসারিক জীবন পরিত্যাগ করা অনুমোদন করতেন না, কারণ যে পরিস্থিতিগুলো সাধনজীবনের বাধা সেগুলোকেই সাধন-উপায় বলে রূপান্তরিত করা যায়। শেষ কথা হল, সাধনা কেবল মাত্র অহংকারের প্রতিরোধ, আর যতক্ষণ অহংকার আশা-আশঙ্কা, আকাঙ্ক্ষা-অসন্তোষ বা কোন প্রকার কামনা বাসনায় নিবদ্ধ থাকে ততক্ষণ যতই ধ্যান বা ভাবাবেশ

হোক না কেন, সফলতা লাভ হবে না। শ্রীরামচন্দ্র ও জনক সংসারে থাকলেও নিরাসক্ত ছিলেন ; যে সাধু শ্রীভগবানের ওপর পাথর ফেলেছিল, সে সংসার ত্যাগ করলেও আসক্তিতে আবদ্ধ ছিল।

এই সঙ্গে, এর অর্থ এই নয় যে, কোন প্রতিরোধের চেষ্টা না ক'রে কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ কর্মই যথেষ্ট, কারণ অহংকার অতি সূক্ষ্ম ও নাছোড়বান্দা আর যা দিয়ে তাকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হয় এ সেই ক্রিয়াগুলোকেই আশ্রয় ক'রে থাকে, বিনয়েরও অহংকার হয়, তপস্যারও অভিমান হয়।

আত্মানুসন্ধান প্রাত্যহিক কর্ম, নিজেকে জিজ্ঞাসা করা যে চিন্তাটা কার উঠছে, এটা একটা প্রতিরোধের পদ্ধতি আর কার্যকরীও বটে। কোন সাধারণ চিন্তা, যেমন কোন বই বা সিনেমার সম্বন্ধে একজনের মতামতের বিষয়ে একে প্রয়োগ করলে তা মনে নাও হতে পারে ; কিন্তু কোন একটা আবেগময় চিন্তার প্রতি প্রয়োগ করলে তার অসাধারণ শক্তিমত্তা বোঝা যায় ও তা একেবারে প্রবৃত্তির মূলে আঘাত করে। একজন হয়ত অপমানিত হয়েছে ও বিরক্তি অনুভব করছে— কে অপমানিত বা বিরক্ত হয়েছে ? কে সুখী কে-ই বা হতাশ, কে ক্রুদ্ধ কে-ই বা জয়গর্বিত ? একজন দিবাস্বপ্নের ঘোরে বা মনশ্চক্ষে নিজের সম্ভাব্য বিজয় প্রত্যক্ষ ক'রে অহংকারকে প্রবলভাবে পরিবর্ধিত করে, যা ধ্যানক্রিয়া অনুরূপ শক্তিতেই সঙ্কুচিত করে। আর সেই সময়ে বিচারের অসি নিষ্কাশন ক'রে বন্ধন জাল ছেদন করতে শক্তি ও তৎপরতার প্রয়োজন।

জীবনের কাজকর্মেও শ্রীভগবান বিচারের সঙ্গে সমর্পণ এবং দৈবীশক্তির কাজে আত্মনিবেদনের নির্দেশ দিতেন। যে নিজেই তার সমস্ত ভার ও দায়িত্ব বহন করে মনে করে এরূপ ব্যক্তিকে তিনি সেই রেলযাত্রীর সঙ্গে তুলনা করতেন যে মোটঘাট মাথায় ক'রে রেলগাড়ীতে যেতে যেতে বিশ্বাস করে, গাড়ী নয়, সে নিজেই তার বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে, যেখানে একজন বিজ্ঞতর যাত্রী তার মালপত্র গাড়ীর তাকে

রেখে আরামে বসে যেতে পারে। যে সকল নির্দেশ ও উদাহরণ তিনি দিতেন সবই স্বার্থবুদ্ধিকে হ্রাস করা ও 'আমি কর্তা'রূপ ভ্রমকে নিবারণ করার ওপর কেন্দ্রীভূত হত।

একবার বিখ্যাত কংগ্রেস কর্মী যমনালাল বাজাজ আশ্রমে এসেছিল আর জিজ্ঞাসা করেছিল "স্বরাজের জন্য কামনা করা কি ঠিক?"

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ' একটা উদ্দেশ্যের জন্য দীর্ঘদিন কর্ম করলে ক্রমশঃ দৃষ্টির প্রসার হয়, তাতে ব্যক্তিসত্তা ক্রমশঃ দেশের মধ্যে লীন হয়ে যায়। এভাবে ব্যক্তিসত্তার অবলুপ্তি বাঞ্ছনীয় আর কর্মটিও নিষ্কাম্যকর্ম হয়।

যমনালাল বেশ খুশি হয়ে বোধহয় নিজেদের রাজনৈতিক ব্যাপারে ভগবানের অনুমোদন পেয়ে, যুক্তিসঙ্গত ভাবে আরও স্পষ্ট আশ্বাস লাভের জন্য পরবর্তী প্রশ্ন করল "যদি দীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান ত্যাগের পর স্বরাজ লাভ হয় তবে তার জন্য একজনের আনন্দ করা কি ন্যায্য নয়?" কিন্তু তাকে নিরাশ হ'তে হল। "না, এই সংগ্রাম চলাকালে তাকে নিশ্চয়ই কোনও উচ্চ-শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল; সেই শক্তির কথা সর্বদা তার মনে রাখা উচিত আর তাকে কখনই দৃষ্টির বহির্ভূত হতে দেওয়া উচিত নয়। তবে সে আর কি করে গর্বিত হতে পারে? তার কর্মফল সম্বন্ধেও কোন চিন্তা থাকা উচিত নয়, তবেই না সেটা নিষ্কাম হয়।"

বলার অভিপ্রায় হল, একজনের কর্মের ফল ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে, তার দায়িত্ব কেবলমাত্র সেটা সৎ ও অনাসক্ত ভাবে করা। তাছাড়া কোন স্বার্থ ব্যতীত কেবল ন্যায্য বলে কর্ম করার দ্বারা একজন প্রত্যক্ষ পরিণামের অতিরিক্ত এবং আরও অধিক কার্যকরী অথচ সূক্ষ্ম রূপে অন্যেরও উপকার করে, নিজেও সরাসরি উপকৃত হয়। বস্তুতঃ অনাসক্ত কর্মকেই প্রকৃত ব্যাঙ্কের জমা বলা যায়, যা শুভকর্ম বর্ধিত ক'রে ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্মাণ করবে।

এইরূপ ক্ষেত্রে দর্শনার্থীর প্রশ্নের মাধ্যমে শ্রীভগবান বোঝালেন যে, কিরূপ মানসিকতার দ্বারা সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকেও প্রকৃত সাধনা রূপে পর্যবসিত করা যায়, কিন্তু তিনি তাঁর ভক্তদের এসব কাজে নিরুৎসাহ করতেন। তাদের পক্ষে নিজেদের জীবনের কাজগুলো পবিত্র ও অনাসক্ত ভাবে কেবল উচিত বলে করলেই যথেষ্ট। যদিও বর্তমান জগতের অবস্থা অসামঞ্জস্যপূর্ণ তবুও এটা কোন একটা ব্যাপক সামঞ্জস্যের অংশ। আত্মোপলব্ধির বিকাশের দ্বারা একজন এই সামঞ্জস্যকে অনুভব করতে পারে ও ঘটনাক্রমকে পরিবর্তন করার প্রয়াস অপেক্ষা বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। শ্রীভগবানের এ বিষয়ে শিক্ষা পল ব্রাণ্টনের সঙ্গে বার্তালাপে সংগৃহীত আছে—

পল ব্রাণ্টন—আমরা একটা সঙ্কটময় অবস্থায় বাস করছি। মহর্ষি কি জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর মতামত বলবেন?

ভগবান—তুমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করছ কেন? তুমি তোমার বর্তমানকেই ভাল করে জান না। বর্তমানের চিন্তা করো, ভবিষ্যৎ তার নিজের ব্যবস্থা করবে।

পল ব্রাণ্টন—জগৎ কি শীঘ্র একটা মৈত্রী ও পারস্পরিক সহায়তার যুগে প্রবেশ করবে, বা এ একটা বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধের মধ্যে গিয়ে পড়বে?

ভগবান—একজন যিনি সংসারকে পরিচালনা করছেন তিনিই সেটা দেখবেন। যিনি জগৎকে প্রাণবন্ত করেছেন, তিনি একে কি ভাবে দেখাশোনা করা প্রয়োজন জানেন। তিনিই এ জগতের ভার বহন করছেন, তুমি নও।

পল ব্রাণ্টন—তবু একজন যদি নিরপেক্ষভাবে চারিদিক দেখে তাহলে এই সদয় দৃষ্টি যে কোথায় তা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়।

ভগবান—তুমি যেমন, জগৎও তেমন। নিজেকে না জেনে জগৎকে বোঝার চেষ্টা করায় লাভ কি? এই প্রশ্নটা

সত্যান্বেষীর বিবেচনা না করলেও চলবে। লোকেরা এরূপ প্রশ্নের জন্য শক্তি অপব্যয় করে। আগে আপন প্রকৃত সত্য জানো, তখন তুমি যার অংশ, সেই জগতের প্রকৃত তথ্য জানার উপযুক্ত হবে।

লক্ষণীয় যে শেষ বাক্যে শ্রীভগবান 'আপন' শব্দটি অহংকার অর্থে ব্যবহার করেছেন, যাকে সেই সময় প্রশ্নকর্তা 'সে নিজে' বলে মনে করছে। প্রকৃত আত্মা সংসারের অংশ নয়, সে পরমাত্মা ও সৃষ্টিকর্তা।

জীবনের গতিবিধিতে আত্মানুসন্ধান প্রয়োগের নির্দেশের অভিপ্রায় হল তার পরম্পরাগত প্রয়োগের বিস্তার আর যুগোপযোগী করে তার সমাযোজন। ধ্যানরূপে এর প্রত্যক্ষ প্রয়োগ হল তার বিশুদ্ধতম ও প্রাচীনতম সাধনা। যদিও এটা শ্রীভগবানের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ও অনুপদিষ্ট ভাবে এসেছিল তাহলেও এটা প্রাচীন ঋষিগণেব ঐতিহ্য। ঋষি বশিষ্ঠ বলেছিলেন, "'আমি কে?' অনুসন্ধান হল আত্মার অনুসন্ধান, আর একে কল্পিত ধারণার বিষাক্ত আগাছা-বীজের পক্ষে অগ্নিসরূপ বলা হয়।" যা হোক, পূর্বকালে এটি বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গরূপে ছিল, সরল অথচ সুমহান, এই সর্বশেষ রহস্য কেবল মাত্র বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবানদের দেওয়া হত আর তারা সংসারের বিক্ষোভ থেকে দূরে থেকে অবিরত ধ্যানের দ্বারা তার অনুসরণ করত। অপরপক্ষে কর্মমার্গ ছিল তাদের জন্য যারা সংসারে থেকে, গীতায় যা বলা হয়েছে কর্মফলে আসক্ত না হয়ে অর্থাৎ অনাসক্ত ভাবে, অহংকারশূন্য হয়ে অন্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করত। এখন এই দু'টি পথকে মিলিয়ে এক ক'রে একটি নূতন পথ করা হয়েছে যা আমাদের জীবনের পরিস্থিতির পক্ষে উপযুক্ত; যে পথটি নীরবে অন্যের দৃষ্টির আগোচরে বাহ্যিক আচার ব্যতিরেকেও সমস্ত দিন, যেমন আশ্রমে বা গুহায় তেমনি অফিসে বা কারখানায়, অনুসরণ করা যায়। সেটি হচ্ছে কেবল ধ্যানের জন্যে একটু সময় যার অনুরণন চলবে গোটা দিনভোর।

"পরিশেষে যা কিছু গুপ্ত তা প্রকাশিত হবে," যীশুখ্রীস্টের এই

কথনটি অন্তিম ও অত্যন্ত গুপ্ত পথটির খোলাখুলি ঘোষণা এবং আমাদের যুগে তার সমাযোজনার দ্বারা সিদ্ধান্তগত ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এটা শ্রীভগবান করেছেন।

বস্তুতঃ নূতন পথটি কেবল জ্ঞান ও কর্মমার্গের মিলন ছাড়া আরও কিছু বেশী, এটি ভক্তিও (প্রেম বা অনুরাগ) বটে কারণ এই পথ আত্মার প্রতি, আন্তর গুরুর প্রতি, ভগবান বা ঈশ্বরের প্রতিও বিশুদ্ধ প্রেমের উন্মেষ করে। শ্রীভগবান তাঁর 'শ্রীরমণ বাণী'তে বলেছেন, "শাশ্বত অখণ্ড আত্মস্থিতির স্বাভাবিক অবস্থাই জ্ঞান। সেই আত্মস্থিতিতে থাকতে গেলে আত্মার প্রতি অনুরাগ হওয়া চাই। যেহেতু কার্যতঃ ঈশ্বরই আত্মা সুতরাং আত্মপ্রেমই ভগবদ্প্রেম আর তারই নাম ভক্তি। এরূপে জ্ঞান ও ভক্তি একই।"

শ্রীভগবান যে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের উপদেশ দিয়েছেন তা ভিন্ন মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তাবিক পক্ষে সেগুলো আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তার চেয়ে পরস্পরের অতি নিকটে আর একে অন্যের বাধাসরূপ নয় ; প্রকৃতপক্ষে তারা উপরে বর্ণিত ভাবে সম্মিলিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ মার্গ।

একদিকে বাহ্য গুরুর প্রতি আনুগত্যের দ্বারা তাঁর কৃপা আন্তর গুরুর দিকে নিয়ে যায় যা বিচার মার্গেরও লক্ষ্য ; অন্যদিকে বিচার তাকে স্থৈর্য ও আনুগত্যের দিকে নিয়ে যায়। দু'টি উপায়ই প্রত্যক্ষ-ভাবে মনকে অনুগত করার জন্য চেষ্টা করে, কেবল একক্ষেত্রে বেশী বাইরের গুরুর প্রতি আর অন্য ক্ষেত্রে বেশী আন্তর গুরুর প্রতি। সাধনার পরোক্ষ উপায়গুলো মনকে আরও শক্তিশালী ও সংগঠিত করে যাতে অবশেষে সে যথেষ্ট শক্তিমান হ'য়ে এবং প্রসারতা লাভ ক'রে আত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে, আর একেই শ্রীভগবান "চোরকে পুলিস হয়ে চোর বা নিজেকে ধরার কথা" বলে উল্লেখ করতেন। যদিও এটা সত্য যে মনকে আত্মসমর্পণের আগে শুদ্ধ ও শক্তিমান হতে হবে বিচার দ্বারা ও শ্রীভগবানের করুণায় সেটা আপনা হতেই হত।

একবার কৃষ্ণ জীবরাজানী নামে একজন ভক্ত এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল "গ্রন্থে বলা হয় যে আত্মোপলব্ধির প্রস্তুতির জন্য একজনকে নিজের সব সত্ত্ব বা দৈবী গুণগুলো অনুশীলন করতে হবে।"

এতে শ্রীভগবান উত্তর দেন "সব সত্ত্ব বা দৈবীগুণ জ্ঞানে সমাবিষ্ট ও সকল তমো বা আসুরি গুণ অজ্ঞানেই আছে। যখন জ্ঞান লাভ হয় তখন অজ্ঞান দূর হয় আর সব সত্ত্বগুণ স্বতঃই প্রকাশিত হয়। যদি একজন জ্ঞানী হয় সে মিথ্যা কথা বলতে পারে না বা কোন অন্যায় করতে পারে না। নিঃসন্দেহে কোন কোন বই-এ একটার পর একটা গুণের অনুশীলন ক'রে মোক্ষের জন্য তৈরী হতে বলে, কিন্তু যারা জ্ঞানমার্গ বা বিচারমার্গ অবলম্বন করেছে, দৈবীগুণ লাভের জন্য তাদের নিজস্ব সাধনাই যথেষ্ট, তাদের আর অন্য কিছু করতে হয় না।"

বিরূপাক্ষ গুহা-বাস কালেও তিনি এরূপ উত্তর দিতেন, যার ব্যাখ্যা পরে 'শ্রীরমণ গীতা' নামে প্রকাশিত হয়। অনেক ভক্ত অন্যান্য উপায়ও অনুসরণ করত—যেমন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান, প্রাণায়াম ইত্যাদি। এগুলো যে কেবল বিচার মার্গের প্রস্তুতি তা নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তার সহগামীও হত। অনেক ভক্তই শ্রীভগবানকে বলত যে তারা অন্য গুরু উপদিষ্ট এই উপায়গুলো অনুসরণ করে আর তারা সেগুলো অভ্যাস করার জন্য তাঁর অনুমোদন চাইত। তিনি তাদের কথা অনুগ্রহ করে শুনতেন ও স্বীকৃতিও দিতেন। কিন্তু কেউ যদি দেখত যে অন্য উপায়-গুলো আপনা হতে ছেড়ে যাচ্ছে সেটাও অনুমোদন করতেন। একজন ভক্ত তাঁকে বলে যে, সে তার পূর্বব্যবহৃত উপায়গুলো থেকে আর কোন সাহায্য পাচ্ছে না, সেগুলো ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুমতি চায়, তিনি উত্তর দেন "হাঁ, অন্য সব উপায় কেবল বিচারের দিকেই নিয়ে যায়।"

কখন কখন মনে হত যে, খুব কম লোকই বিচারমার্গ অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা করে, বস্তুতঃ আশ্রমে আগত অনেকেই জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যা বা শান্তিলাভের জন্য কোন বিশেষ অনুশীলন কিংবা চরিত্রশুদ্ধি ও দৃঢ়তার জন্য উপদেশ চাইত, তাদের মানসিকতা অদ্বৈত বা আত্মানু-

সন্ধানের সাধনা বোঝার পক্ষে স্পষ্টতঃই অক্ষম ছিল। যারা তলিয়ে দেখত না তাদের এদের যা সামান্য বলা হত তাতে নিরাশ বা ক্ষুব্ধ না হওয়া খুবই শক্ত ছিল। কিন্তু এটা কেবল ওপরভাসা, কারণ গভীর ভাবে দেখলে দেখা যেত যে প্রকৃত উত্তর মৌখিক নয় পরন্তু প্রশ্নকর্তার মনে যে মৌন প্রভাব পড়ে তাই।

শ্রীভগবান তাঁর নিজের ব্যাখ্যায় যে চরম সত্য জ্ঞানীজন উপলব্ধি করেন তাকেই কেবল ধরে থাকতেন, যেমন তিনি এই সিদ্ধান্ত ধরে থাকতেন যে দ্বৈতভাবের অতীত হওয়ায় জ্ঞানীর কোন সম্বন্ধ হয় না সুতরাং তিনি কাউকে শিষ্য বলতেন না ; কিন্তু তাঁর মৌন কৃপা মনের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করত যে, সে আপন উন্নতির জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত উপায় নিজেই খুঁজে নিত। যারা কেবল সমর্পণ ও মনকে স্থির রাখার চেষ্টা করত সেই ভক্তদের কথাপ্রসঙ্গে একথা আগেই বলা হয়েছে। মৌখিক উপদেশের প্রয়োজন হত না। প্রত্যেকেই তার প্রকৃতি, বুদ্ধি ও ভক্তি অনুসারে সাহায্য লাভ করত। "গুরুকৃপা সাগরের মত, সে যদি একটি বাটি আনে, তার এক বাটি লাভ হবে। সাগরের কৃপণতা সম্বন্ধে অভিযোগ করে লাভ নেই। যার পাত্র যত বড় সে ততখানি লাভ করে। এটা সম্পূর্ণ তার ওপর নির্ভর করে।"

এক বয়স্কা ফরাসী মহিলা কোন একজন ভক্তের মা, একবার আশ্রম দেখতে এল। সে দর্শনশাস্ত্র বুঝত না, বুঝতে চেষ্টাও করলে না কিন্তু তার আসার পর থেকে সে একজন প্রকৃত ক্যাথলিক হয়ে গেল, এর আগে সে নামেমাত্র ক্যাথলিক ছিল। সে এই পরিবর্তনকে শ্রীভগবানের প্রভাব বলে স্বীকার করত। মৌখিক ব্যাখ্যা অপেক্ষা এরূপ বিকাশই শ্রীভগবানের শিক্ষার সারতত্ত্ব।

এমনও হতে পারে যে কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের ক্রম-বর্ধমান কৃপা, তাঁর সঙ্গে ভক্তদের আরও ঘনিষ্ঠ করছিল এবং এইরূপে ভক্তির মাধ্যমে তাদের হৃদয়কে বিচারমার্গের উপযুক্ত করে তুলছিল। কেবল যে ভক্তেরাই শুধু তা নয়, পরন্তু হঠাৎ আসা দর্শনার্থীরাও লক্ষ্য

করেছে যে শেষ কয়েক বছর তাঁর মুখশ্রী কত কোমল ও উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। যেমন বিচারপথে জ্ঞানের মাধ্যমে প্রেম হয়, তেমনি প্রেমের মাধ্যমে তিনি জ্ঞানের পথে নিয়ে যেতেন। তাঁর প্রতি ভক্তি মনকে অন্তরাভিমুখী ক'রে তিনি যার মূর্তরূপ সেই আত্মার দিকে নিয়ে যেত ঠিক তেমনি অন্তরে আত্মানুসন্ধান তাঁতে অভিব্যক্ত আত্মার প্রতি অসীম প্রেম জাগরিত করত।

একজন ভক্ত এরূপ বর্ণনা করেছিল "তার মুখটি দেখ, এত আকর্ষণীয়, এত অবিশ্বাস্যরূপে করুণাপূর্ণ, এত প্রজ্ঞাবান অথচ নবজাত শিশুর মত সরলতা মাখান—যা কিছু জানার সবই তিনি জানেন। কখন কখন হৃদয়ে একটা স্ফুরণ আরম্ভ হয়—ভগবান—যেন আমার অস্তিত্বের সত্তাই রূপ নিয়েছে, আমার নিজের হৃদয়েরই বাহ্যরূপ—আমি কে ?—এরূপ প্রেম বিচারে পরিণত হয়।"

সাধনার পদ্ধতি এরূপ খোলাখুলি লিখিত ভাবে বা ভাষণে বর্ণনা করা কোন গুরুর পক্ষে স্বাভাবিক হয়নি, যা আমাদের ভগবান করেছেন। এর কারণ এরূপ পদ্ধতি তখনই কার্যকরী হ'ত যখন এটি গুরুর উপদেশ-রূপে সাধককে দেওয়া হ'ত। এ বিষয়ে আমাদের ভগবানের নূতনত্বে এই প্রশ্নটাই ওঠে যে এই বিচার কিরূপ সুগম—যে-কোন সাধনাই ব্যক্তিগত ভাবে গুরুর কাছে লাভ না হলেও কতদূর সুসাধ্য হ'তে পারে ?

সার্বজনীন ঐতিহ্য এই যে, সাধনার পদ্ধতি যখন গুরু-শিষ্য পরম্পরাগত ভাবে আসে তখনই কার্যকরী হয়, শ্রীভগবান নিজেই এ বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছেন। একবার যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে লোকে যথেচ্ছ ভাবে কোন মন্ত্র জপ করলে ফল পায় কিনা, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন "না, তাকে মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে।"

তবে কি করে তিনি বিচারকে খোলাখুলি ব্যাখ্যা করলেন, এমন কি কখন কখন জিজ্ঞাসুকে তাঁর পুস্তকাকারে লিখিত ব্যাখ্যা পড়তে বললেন ? এর একমাত্র উত্তর হয় যে, যে কয়জন তিরুভন্নমালাই-এ

তাঁর কাছে স্থূল ভাবে উপস্থিত হতে সমর্থ হত, মাত্র তাদের গুরু অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী ছিলেন। তাঁর সে অধিকার ছিল তাই তিনি এরূপ স্বীকৃতিও দিয়েছিলেন। এই আধ্যাত্মিক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে যখন অনেকেই খোঁজে কিন্তু গুরু পাওয়া দুষ্কর, তখন ভগবান স্বয়ং সদ্‌গুরুরূপে শরীর ধারণ করেছিলেন। যারা তাঁর অনুগত তাদের দিব্য পথ-প্রদর্শক হয়েছিলেন আর সর্বসাধারণের সুসাধ্য সাধনার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর কৃপায় তারাও একে সুগম মনে করে।

যারা তিরুভন্নমালাই-এ যেতে পারত তাদের মধ্যেই যে কেবল বিচার মার্গ সীমিত ছিল তা নয় আর সেটা হিন্দুদের মধ্যেও সীমিত ছিল না। শ্রীভগবানের শিক্ষা সকল ধর্মের সার আর যা এতদিন গুপ্ত ছিল তার দীপ্ত ঘোষণা। অদ্বৈতবাদ তাওবাদ ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্য-মণি; আন্তর গুরুর সিদ্ধান্তই "খ্রীস্ট তোমাতে" এই সিদ্ধান্তের ব্যঞ্জনাসহ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা; বিচার ইসলাম ধর্মের সিদ্ধান্ত বা 'সাহাদের' মূল সত্য 'ঈশ্বর ছাড়া দেবতা নেই—পরমাত্মা ছাড়া আত্মা নেই"-কে স্পষ্ট করে। শ্রীভগবান যে-কোন ধর্মের অতীত ছিলেন। হিন্দুগ্রন্থ তাঁর সহজলভ্য ছিল তাই পড়েছিলেন আর তারই পরিভাষায় ব্যাখ্যা করতেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে তিনি অন্য পরিভাষায় ব্যাখ্যা করতেও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি যে সাধনার উপদেশ করতেন তা কোন ধর্মনির্ভর ছিল না। তাঁর কাছে যে কেবল হিন্দুরাই আসত তা নয় পরন্তু বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, মুসলমান, ইহুদী, পার্শী সবাই আসত। কেউ ধর্ম পরিবর্তন করবে সে আশাও তিনি করতেন না। সারতঃ গুরুর প্রতি অনন্য ভক্তি ও তাঁর কৃপা যে-কোন ধর্মের গভীর তত্ত্বের পথ দেখায়, আর আত্মানুসন্ধান সকল ধর্মের অতীত মূল সত্যে নিয়ে যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভক্তবৃন্দ

মোটামুটি ভক্তেরা সবাই সাধারণ লোক। সবাই কিছু বিদ্বান বা পণ্ডিত ছিল না। বস্তুতঃ বহুক্ষেত্রেই দেখা যেত যে বিদগ্ধজনেরা আপন আপন সিদ্ধান্তে এতই মেতে যেত যে জীবন্ত সত্যটি দেখতে অসমর্থ হয়ে ভেসে যেত। অন্যপক্ষে সরল ও সাদাসিধা লোকেরা স্থির হয়ে থাকত ও উপাসনা করত, আর তাদের আন্তরিকতার ফলে ভগবানের কৃপাভাজন হত। যেহেতু আত্মানুসন্ধানকে জ্ঞানমার্গ বলা হয় সেজন্য মনে করা হয় যে, কেবল বিচারশীলরাই এটা অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু অভিপ্রায় হল হৃদয় দিয়ে অনুভব, তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়। তাত্ত্বিক বা সিদ্ধান্তগত জ্ঞান একটা সহায়ক হতে পারে, আবার সমান ভাবে প্রতিবন্ধকও হতে পারে।

শ্রীভগবান লিখেছিলেন—

বিদ্যার কিবা প্রয়োজন, যদি না জাগে
জিজ্ঞাসা—বিদ্যা কাহার? জন্মায় কে?
মিটাতে ললাট লিখন, হে অরুণাচল!
এরা যেন এক এক ফিতাবাদ্য* যন্ত্র,
অবান্তর বেজে যায় যন্ত্রের মত॥

বিদ্যা চর্চা বিনা যারা, তারা রক্ষা পেল,
বিদ্যা চর্চায় যাদের অহং নাহি গেল।
অবিদ্বান্ রক্ষা পায়, দুর্বার দম্ভ হতে,
রক্ষা পায়, বাক্য অর্থ ভ্রমিচক্র হতে,
রক্ষা পায় আরও নানা বিপদ হতে॥

সদ্‌বিদ্যা অনুবন্ধ ৩৫-৩৬

---

*টেপ রেকর্ড

ললাট লিখন মিটে যাওয়ার অভিপ্রায় হল হিন্দু মতে মানুষের ভাগ্য ললাটে লেখা হয়, যার অর্থ কর্মবন্ধন হতে মুক্তি পাওয়া। পঞ্চম অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে সেই কথাই আবার বলা হল যে দৈবে বিশ্বাস করলেই যে চেষ্টার সম্ভাবনা থাকবে না বা তার প্রয়োজন থাকবে না, তা নয়।

বিদ্যাকে নিন্দা করা হয়নি যেমন ধনসম্পত্তি বা যোগশক্তিকেও করা হয় না, কেবল এই তিনটি বিষয়ে তাদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা আর তাই নিয়ে মেতে যাওয়াকেই নিন্দা করা হয়েছে। এরূপ হ'লে লোকে বদ্ধ হয়ে প্রকৃত লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হয়। পূর্বে লিখিত একটি প্রাচীন গ্রন্থে সিদ্ধির সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এগুলো পশু বাঁধার দড়ি। সাধনার জন্য প্রতিভা নয় আন্তরিকতা, তাত্ত্বিক জ্ঞান নয় প্রজ্ঞা, অহংকার নয় বিনয়ের প্রয়োজন। হলঘরে গান গাওয়ার সময় এটা বিশেষভাবে দেখা যেত। কোন বিখ্যাত গায়কের প্রতি ভগবান হয়ত সামান্যই আগ্রহ দেখালেন অথচ অপটু আন্তরিক ভক্তিমান গায়কের প্রতি তাঁর কৃপা বর্ষিত হল।

স্বভাবতঃ তাঁর ভক্ত সংখ্যার মধ্যে হিন্দুরাই বেশী, যদিও অন্য ধর্মাবলম্বীও ছিল। পল ব্রান্টন তার নিজের বই "এ সার্চ ইন সিক্রেট ইণ্ডিয়া" দ্বারা শ্রীভগবানের শিক্ষা জগতে যেরূপ প্রচার করেছে আর অন্য কেউ এরূপ করেনি।

পরবর্তীকালে আশ্রমে ও তার নিকটবর্তী স্থানে স্থায়ী বাসিন্দাগণের মধ্যে ছিল বিশালকায়, দয়ালু, গম্ভীরকণ্ঠ সেনাধ্যক্ষ মেজর চাডউইক ; প্রভুত্বব্যঞ্জক ও সম্ভ্রান্ত আচার-ব্যবহার-সম্পন্না পার্শী মহিলা শ্রীমতী তালেয়ার খান ; শান্ত ও সরল ইরাকের এস. এস. কোহেন ; মুসলমান অভিজাত ঘরের পুরাতন দিনের আদব-কায়দা দুরন্ত অবসরপ্রাপ্ত ফার্সী অধ্যাপক ডাঃ হাফিজ সৈয়দ। অল্প বা দীর্ঘ দিনের জন্য আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভেকিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি নানা দেশ থেকেও দর্শনার্থী আসত।

শ্রীভগবানের একজন যুবক আত্মীয় বিশ্বনাথ ১৯২৩ সালে উনিশ বছর বয়সে আসে ও থেকে যায়। এটা তার প্রথম আগমন নয়, কিন্তু এবার হলঘরে ঢুকতেই শ্রীভগবান তাকে জিজ্ঞাসা করেন "বাড়ীর অনুমতি নিয়ে এসেছ?"

সে যে থাকতে এসেছে প্রশ্নটা তারই সূচক। সে স্বীকার করলে যে, সেও ভগবানের মত একটা চিঠি লিখে কোথায় যাচ্ছে না জানিয়ে চলে এসেছে। ভগবান তাকে দিয়ে একটা চিঠি লেখালেন, যা হোক যুবকটির বাবা সে কোথায় গেছে অনুমান করে তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে এল। সে বেশ খোলা মনেই এসেছিল, স্বামীর সম্বন্ধে বহু প্রশংসাও শুনেছিল কিন্তু যাকে এক সময় একজন ছেলেমানুষ আত্মীয় বেঙ্কটরমণ বলে জানত তাকে একজন দিব্যমানব ভাবা তার পক্ষে কঠিন ছিল। সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে তার শরীর ভয়ে ও সম্ভ্রমে কাঁপতে লাগল আর সে বোঝার আগেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসল।

"আমি এখানে পুরাতন বেঙ্কটরমণের কোন চিহ্নও দেখছি না!" তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আর শ্রীভগবান হেসে উঠলেন "ও, সেই ছোকরা! সে অনেক দিন পালিয়ে গেছে।"

বিশ্বনাথের দিকে চেয়ে অভ্যস্ত পরিহাস ভঙ্গীতে একবার শ্রীভগবান বলেছিলেন, "তুমি বাড়ী থেকে আসার আগে তবু সংস্কৃত শিখেছ, আমি কিছুই জানতাম না।"

আরও অনেকেই ছিল যারা সংস্কৃত জানত ও শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ত, তাদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বেঙ্কটরামিয়া সাধুর মত থাকত আর কয়েক বছর দিনলিপি লিখেছিল, যেটা পরে "টক্‌স্ উইথ দি মহর্ষি" নামে আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত হয়; আর ছিল আগে বলা বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুন্দরেস আইয়ার, সে তিরুভন্নমালাই থেকে জীবিকা অর্জন করত।

যে বছর বিশ্বনাথ আসে, সেই বছর বিখ্যাত তামিল কবিদের মধ্যে একজন মুরুগনারও আসে। শ্রীভগবান নিজে কখন কখন তার কবিতার আলোচনা করেছেন বা সেগুলো পাঠ করাতেন। মুরুগনারই 'সদ্‌বিত্থা চত্বারিংশৎ'-কে পুস্তকাকারে সাজায় আর তার ওপর একটি মনোজ্ঞ তামিল ব্যাখ্যা করে। সঙ্গীতজ্ঞ রামস্বামী আইয়ার একজন বয়স্ক ভক্ত। শ্রীভগবানের চেয়ে বয়সে বড়, সে ১৯০৭ সালে তাঁর কাছে আসে। সেও শ্রীভগবানের প্রশস্তি গীত রচনা করে।

রামস্বামী পিল্লাই ১৯১১ সালে যৌবনে কলেজ থেকে সোজা এখানে আসে ও থেকে যায়। বিশ্বনাথ ও মুরুগনারের মত সেও একজন সাধু, সে ভক্তি ও সেবার আশ্রয় নেয়। একবার ১৯৭৭ সালে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার সময় শ্রীভগবানের পায়ে পাথরের আঘাত লাগে। পরের দিন পক্ককেশ কিন্তু শক্তসমর্থ রামস্বামী পাহাড়ে যাওয়ার রাস্তা ও সিঁড়ি তৈরী করতে শুরু করে দিলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি একলা দিনের পর দিন পরিশ্রম করে সে রাস্তা তৈরী করলে, ধাপগুলো পাথর দিয়ে বাঁধালে, যেখানে পাথরের চাঁই ছিল কেটে সিঁড়ি তৈরী করলে, সব টেরা বেঁকা সমান করলে। সেটা এতই সুন্দর ও পরিপাটি হয়েছিল যে আজ অবধি বর্ষায় ধুয়ে যায়নি। যা হোক সেগুলো আর মেরামত করা হয়নি কারণ সেটা শেষ হওয়াব অল্পদিন পরেই ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য শ্রীভগবানের পাহাড়ে বেড়ানো ছেড়ে দিতে হয়।

শ্রীভগবানের বাল্যকালের বন্ধু আগে বলা রঙ্গ আইয়ার কখন স্থায়িভাবে তিরুভন্নমালাই-এ থাকেনি কিন্তু সে ও তার পরিবার প্রায়ই আশ্রমে আসত। সে শ্রীভগবানের সহপাঠী ছিল এবং তাঁর সঙ্গে খেলাধূলা ও কুস্তি ইত্যাদি করেছে। সে তাঁর সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গ ও হাসি-তামাসা করে কথা বলত। বিরূপাক্ষ গুহা-বাস কালে তার পুরাতন বন্ধু 'স্বামী' হয়ে কিরূপ হয়েছে দেখতে এসে, সে তৎক্ষণাৎ অনুভব করে যে সে এক দিব্য মানবের সম্মুখে রয়েছে। তার বড়

ভাই মণির কিন্তু তা মনে হল না। সে তার থেকে নিচের ক্লাসে পড়া এখন এই তরুণস্বামীর দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। ভগবান একবার মাত্র তাঁর দৃষ্টি ফেরালেন আর সেই মৌন প্রভাবে মণি তাঁর চরণে প্রণত হল। তারপর থেকে সেও একজন ভক্ত হয়। রঙ্গ আইয়ারের এক ছেলে শ্রীভগবানের সঙ্গে জ্ঞানের দিব্য বিবাহ সম্বন্ধে একটি বড় তামিল কবিতা লেখে।

'শ্রীরমণ বাণীর' বেশীর ভাগই একজন পোলিশ শরণার্থী এম. ফ্রেড্ম্যানের সহিত কথাবার্তার সঙ্কলন, দু'টি পোলিশ মহিলা আশ্রমে অত্যন্ত পরিচিতা ছিল। শ্রীমতী নোয়ে তার আপন দেশ আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার সময় চোখের জল রোধ করতে পারলে না। শ্রীভগবান তাকে সান্ত্বনা দিলেন, "কাঁদছ কেন? তুমি যেখানেই যাও, আমি তোমার সঙ্গেই আছি।"

একথা ভগবানের সব ভক্তের পক্ষেই সত্য। তিনি সবসময় তাদের সঙ্গে আছেন, তারা যদি তাঁকে স্মরণ করে তিনিও তাদের স্মরণে রাখেন; এমনকি তারা যদি তাঁকে ত্যাগ করে তিনি তাদের ত্যাগ করেন না; তবু একজনকে যদি ব্যক্তিগত ভাবে এটা বলা হয় তবে সেটা একটা পরম আশীর্বাদ।

আমার তিনটি ছেলেমেয়ে তিরুভন্নমালাই-এর একমাত্র ইউরোপীয় শিশু, ভক্তদের মধ্যে খুবই চোখে পড়ত। ১৯৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসে এক সন্ধ্যায় তিনি বড় দু'টিকে ধ্যানে দীক্ষা দিলেন। যদি শিশুরা এর বর্ণনা করতে অপারক হয় তবে বলা যায় যে বয়স্করাও সমান অক্ষম হত। দশ বছরের কিট্টি লিখেছিল, "আজ সন্ধ্যায় আমি যখন হলঘরে বসেছিলাম, ভগবান আমার দিকে চেয়ে হাসলেন আর আমি চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতে শুরু করলাম। যেই মাত্র চোখ বন্ধ করলাম, আমার খুব আনন্দ হল আর মনে হল যে ভগবান যেন আমার অতি, অতি নিকটে ও খুব সত্য আর যেন আমারই মধ্যে রয়েছেন। এটা কোন একটা ঘটনায় আনন্দিত বা উত্তেজিত হওয়ার মত নয়। আমি

কি করে বলব জানি না, কেবল বলতে পারি খুব আনন্দ হয়েছিল আব ভগবান কী অপরূপ !"

সাত বছরের আদম লিখেছিল "যখন হলঘরে বসেছিলাম আমাব আনন্দ হচ্ছিল না, আমি প্রার্থনা করতে শুরু করলাম তারপর খুব আনন্দ হল, এটা কিন্তু একটা নূতন খেলনা পাওয়ার মত আনন্দ নয়, কেবল ভগবানকে ও আর সবাইকে ভালবাসার আনন্দ।"

শিশুরা প্রায়ই যে অনেকক্ষণ ধরে হলঘরে বসত তা নয়। তাদেব মনে হলে বসত, বেশীর ভাগই খেলা করে বেড়াত।

সব থেকে ছোট ফ্রানিয়া যখন সাত বছরের, অপর দু'টি তাদেব বন্ধুদের কথা বলছিল, তখন তাব ঠিক কোন বন্ধু ছিল না তবু সেও ছাড়বার পাত্র নয় ; সে বললে যে ডাঃ সৈয়দ জগতের মধ্যে তাব সবচেয়ে বড় বন্ধু। শ্রীভগবানকে একথা বলা হল।

'ওহো ?' তিনি হাল্কা ভাবে উত্তর দিলেন।

"তার মা বললে, 'আর ভগবান' ?"

"ও-হো ?" এখন তিনি মাথা ঘুরিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

"ফ্রানিয়া বললে, 'ভগবান জগতে নেই'।"

"ও-হো !" তিনি উঠে বসে বেশ খুশি হয়ে তাঁর অভ্যস্ত আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গীতে তর্জনীটি নাকের পাশে রাখলেন। তিনি গল্পটা তামিলে অনুবাদ করলেন আর যে-ই ঘরে আসে তাকে বলতে লাগালেন।

পবে ডাঃ সৈয়দ ফ্রানিয়াকে জিজ্ঞাসা করে যে ভগবান যদি জগতে নেই তবে তিনি কোথায়, আর সে উত্তর দিলে, "ভগবান সব জায়গায়।"

তবুও কোরানের তর্কের মত ডাঃ সৈয়দ বললে, "আমরা তাঁকে সোফায় বসে থাকতে, পান ভোজন করতে, চলে ফিরে বেড়াতে দেখছি তবু কি করে বলতে পারি যে তিনি জগতে নেই ?"

তাতে মেয়েটি উত্তর দিলে, "এসো আমরা অন্য কথা বলি।"

তথাপি ভক্তদের উল্লেখ ঈর্ষা উদ্রেককর, কারণ আরও অনেক ভক্ত আছে যাদের কথা বলা যেতে পারে। উদাহরণসরূপ খুব কম ভক্তই দেবরাজ মুদালিয়ারের মত শ্রীভগবানের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারত কিংবা রামচন্দ্র আইয়ারের মত যার ঠাকুরদাদা একবার যুবক রমণকে গায়ের জোরে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ভোজ খাইয়েছিল —তিরুভন্নমালাই-এ আসার পর একমাত্র সেই বাড়ীতে তিনি বসে খেয়েছিলেন। ডাঃ টি. এন. কৃষ্ণস্বামী মাদ্রাজ থেকে মাঝে মাঝে আসত আর শ্রীভগবানের বহু প্রকার ভাব-ভঙ্গীমার অবিশ্বাস্য রকম অনেক সুন্দর ছবি তুলেছিল। শ্রীভগবানের একজন মহিলা ভক্ত নাগাম্মা মাদ্রাজস্থিত তার ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার দাদা ডি এস. শাস্ত্রীকে কতকগুলো চিঠি তেলেগুতে লেখে, এই চিঠিগুলো আশ্রমে ঘটিত বিভিন্ন ঘটনাব অত্যন্ত সজীব ও মনোহর বর্ণনা ও শ্রীভগবানের উপস্থিতির দিব্য প্রভাবের চিত্রণে ভরা। এমন ভক্ত ছিল যারা শ্রীভগবানের সঙ্গে কদাচিৎ কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করত আবাব এমনও ছিল যারা কখন কথা বলত না। অনেক গৃহস্থ ভক্ত ছিল যারা অবসর সময়ে তাদেব ভাগ্যবশে লব্ধ আপন আপন সহব বা দেশ থেকে আসত আর যারা অল্প সময়ের জন্য তাঁকে দর্শন কবতে এসে তাঁর ভক্ত হয়েছিল যদিও তারা তাঁর সান্নিধ্যে থাকেনি। আরও অনেক ছিল, যারা তাঁকে কখনও দেখেনি কিন্তু দূর থেকে তাঁর মৌন দীক্ষা লাভ করেছে।

শ্রীভগবান পোশাক-পরিচ্ছদে বা আচার-ব্যবহারে কোন অদ্ভুত খেয়ালীপনা বা ভাবাবেশ নিয়ে বাড়াবাড়িকে নিরুৎসাহ করতেন। আগেই দেখান হয়েছে যে, তিনি অলৌকিক দর্শন ও সিদ্ধিলাভের ইচ্ছাকে কিরূপ অনুমোদন করতেন না আর গৃহস্থদের তাদের পারিবারিক জীবিকার পরিবেশেই সাধনা চালিয়ে যাওয়ার কেমন পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভক্তদের মধ্যে কোন চমকপ্রদ পরিবর্তন আনতেন না কারণ এরূপ পরিবর্তন একটা ভিত্তিহীন গাঁথনি যেটা পরে

পড়ে যাবে। বস্তুতঃ কখন কখন একজন ভক্ত নিজের কোন উন্নতি হচ্ছে না দেখে হতাশ হয়ে অভিযোগ করত যে তার কোন উন্নতি হচ্ছে না। এরূপ ক্ষেত্রে ভগবান হয় সান্ত্বনা দিতেন কিংবা মুখের ওপর জবাব দিতেন, "কি করে জানলে যে কোন উন্নতি হচ্ছে না?" তারপর তিনি বুঝিয়ে বলতেন যে গুরুই শিষ্যের উন্নতি বুঝতে পারে, শিষ্য নয়; শিষ্যের করণীয় হল, মনের চোখে তার গাঁথনি দেখা না গেলেও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়া। যদিও এটা খুবই দুর্গম পথ বলে মনে হয় তথাপি ভগবানের প্রতি ভক্তদের প্রেম ও তাঁর সদয় হাস্য এই পথকে সৌন্দর্য-মণ্ডিত করেছিল।

কোন বাড়াবাড়ি যেমন মৌনব্রত ধারণ সর্বদা নিরুৎসাহ করতেন, অন্ততঃ একবার তিনি এটা স্পষ্ট দেখিয়েছিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় বেদপারায়ণের পর একজন ভক্ত বললে, "চাডউইক আগামী কাল ভগবানকে কিছু নিবেদন করবে।"

"ও-হো! সেটা কি?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"সে কাল থেকে মৌনী হবে।"

তৎক্ষণাৎ তিনি অনেকক্ষণ ধরে মৌনব্রতের বিপক্ষে বললেন। তিনি দেখালেন যে, কথা বলা একটা সেফ্‌টি ভাল্‌ভ, একে ত্যাগ করা অপেক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা ভাল; আর যারা জিব দিয়ে কথা না ব'লে পেন্‌সিল দিয়ে বলে তাদের পরিহাস করলেন। প্রকৃত মৌন হল হৃদয়ে আর বাক্য বলা কালেও মৌন থাকা সম্ভব যেমন লোক-সঙ্ঘট্টেও একান্তী থাকা যায়।

এটা সত্য যে কখন কখন বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত তাঁর উপদেশের ধরন গুপ্ত হওয়ায় তিনি কদাচিৎ কোন কিছু আদেশ বা নিষেধ করতেন, আর তা সত্ত্বেও যারা এরূপ বাড়াবাড়ি করত তারা স্বীকার না করলেও নিশ্চয়ই তাঁর অসন্তোষ অনুভব করত কারণ প্রায়ই তারা হলঘরে অনুপস্থিত থাকতে আরম্ভ করত। আমার একবারের কথা মনে পড়ে যখন একজনের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়

আর শ্রীভগবান স্পষ্টই বলেছিলেন, "সে আমার কাছে আসে না কেন ?" এই কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে গেলে একজনকে একথা মনে রাখতে হবে যে তিনি কিভাবে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া ও কাউকে আসতে বা যেতে বলা সযত্নে এড়িয়ে যেতেন, কি নিপুণতার সঙ্গে এরূপ স্পষ্ট নির্দেশনার সকল চেষ্টা ঠেকিয়ে রাখতেন আর তাঁর বিন্দুমাত্র ইচ্ছাকে কত অবশ্য-করণীয় ও মূল্যবান মনে করা হত।

এখানে যার কথা বলা হল সেই মহিলা এল না আর অল্প কিছুদিন পরে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হল। এটাই একমাত্র উদাহরণ নয়। ওপর ওপর স্বাভাবিক মনে হওয়া সত্ত্বেও শ্রীভগবানের বিকিরিত প্রবল শক্তিপুঞ্জ, যারা তাঁর কাছে আসত তাদের কারও কারও পক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। এটা দেখা যেত যে, এরূপ ক্ষেত্রে যে মুহূর্তে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেত তারা একান্ত বাস ত্যাগ করে আশ্রমে আসতে আরম্ভ করত। আর এও দেখা যেত যে, সে যে কাজটা প্রতিরোধ করতে পারত ও করা উচিত ছিল তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য দুষ্টু ছেলেকে বকার মত তিনি তাদের বকুনি দিতেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর প্রভাবের জন্য একটা মানসিক সংঘর্ষ হত আর সে ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসত।

যদিও ছবিটা পূর্ণাঙ্গ করার জন্য এরূপ ঘটনার কথা উল্লেখ করা উচিত তথাপি তাদের উল্লেখে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, এরূপ প্রায়ই ঘটত। এরূপ ঘটনা খুবই বিরল।

শ্রীভগবানের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা খুবই কঠিন কারণ প্রায়ই তার ব্যতিক্রম দেখা যেত। এমন দৃষ্টান্তও আছে যেখানে তাঁর নির্দেশ স্পষ্ট, বিশেষতঃ কেউ যদি তাঁকে একান্তে পেত। অবসরপ্রাপ্ত পশু-চিকিৎসক অনন্তনারায়ণ রাও আশ্রমের কাছে একটা বাড়ী করেছিল, তার ভগিনীপতির সাংঘাতিক অসুখের তার পেয়ে তাকে কয়েকবার মাদ্রাজ যেতে হয়। একবার সে এরূপ তার পেল আর বেশ রাত হয়ে গেলেও সে সেটা ভগবানের কাছে নিয়ে গেল।

আগের কয়েকবার তিনি মনোযোগ দেননি কিন্তু এবার তিনি বললেন, "হাঁ, হাঁ, তুমি চলে যাও।" তারপর মৃত্যুর তুচ্ছতা সম্বন্ধে বললেন। এ. এন. রাও বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বললে, এবার আর রক্ষা নেই! তার মাদ্রাজে যাওয়ার ছু'দিন বাদে তার ভগিনীপতি মারা যায়।

কখন কখন আরও স্পষ্ট নির্দেশের কথাও শোনা যেত, যেমন কোন ভক্তকে 'রমণ' শব্দটি জপের জন্য অনুমোদন করা; কিন্তু সেগুলো প্রায়ই আলোচনা হত না।

সাধারণতঃ ভক্ত নিজেই সিদ্ধান্ত ক'রে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রস্তাব করত। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াও তার সাধনার অঙ্গ। যদি সেটা ঠিক হত তবে হয়ত একটু অনুমোদনের হাসি, আর তাতেই ভক্তের হৃদয়-বীণা বেজে উঠত, নয়ত অতি সংক্ষিপ্ত মৌখিক স্বীকৃতি। যদি সিদ্ধান্তটি স্বীকার্য না হত তাও বোঝা যেত। একবার একজন গৃহস্থ ভক্ত ভাল মাইনের চাকরীর জন্য তিরুভন্নমালাই ছেড়ে অন্য সহরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা বলে। শ্রীভগবান হেসে উঠলেন, "সবাই খুশিমত মতলব করতে পারে।" সে পরিকল্পনা কাজে পরিণত হয়নি।

যখন ভারতের একজন রাজনৈতিক নেতার মাদ্রাজে সভা হল, একজন সেবক তার গুণমুগ্ধ ছিল, সে মাদ্রাজে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইল। শ্রীভগবান পাথরের মূর্তির মত বসে রইলেন যেন শুনতেই পাননি। তা সত্ত্বেও সেবকটি গেল। সে এক সভা থেকে অন্য সভায় ছোটাছুটি করলে, কোথাও দেরি হয়ে গেল কিংবা ঢোকার অনুমতি পেল না। ফিরে এলে ভগবান তাকে পরিহাস করে বললেন, "তুমি যে বিনা অনুমতিতে মাদ্রাজ গেলে, কাজ কিছু হল কি?" তিনি এতই অহংকারশূন্য ছিলেন যে তাঁর নিজের কাজ সম্বন্ধে বলা বা পরিহাস করা এরূপ স্বাভাবিক ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবে হত যেন অন্য কারও সম্বন্ধে বলছেন।

ভগবানের প্রভাব একজনকে তার পরিবেশ-জনিত সুখ ও দুঃখ, আশা ও আশঙ্কা থেকে ঘুরিয়ে তার নিজের আনন্দস্বরূপের অভিমুখী

করত। এটি জেনে অনেক ভক্ত এমনকি মনে মনেও কোন প্রার্থনা করত না, বরঞ্চ যে আসক্তি থেকে এরূপ কামনা হয় সেটা অতিক্রম করতে চেষ্টা করত। তারা সম্পূর্ণ সক্ষম না হলেও তাঁর কাছে গিয়ে মহত্তর প্রেম, মহত্তর দৃঢ়তা, মহত্তর প্রজ্ঞা ছাড়া অন্য কিছু বাহ্য বস্তু চাওয়াকে একরূপ প্রবঞ্চনা মনে করত। যদি কোন ক্লেশ উপস্থিত হত, উপায়টা ছিল সেটাকে নিরাকরণের চেষ্টা না করে জিজ্ঞাসা করা—এই ক্লেশটা কার? আমি কে? আর এরূপে সচেতন ভাবে যে জন্ম, মৃত্যু বা ক্লেশ ভোগ করে না তার সঙ্গে একাত্ম অনুভব করা। যে কেউ এই অভিপ্রায়ে ভগবানের কাছে যেত তার শক্তি ও শান্তি লাভ হত।

মানুষের স্বভাব যা হয়, এমন ভক্তও ছিল যারা জীবনের পরিস্থিতিতে তাঁর সহায়তা ও সংরক্ষণের জন্য বলত। অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁকে তারা মা ও বাবা মনে করত আর যে-কোন বিপদ-আপদে তাঁর শরণ নিত। হয় তারা তাঁকে এবিষয়ে চিঠি লিখত নয়ত কেবল প্রার্থনা করত, তা সে তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তাদের প্রার্থনা পূরণ হত। বিপদ-আপদ কেটে যেত কিংবা যে ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হত না বা হওয়া লাভপ্রদ নয়, সেটা সহ্য করার জন্য সহিষ্ণুতা ও শান্তি লাভ করত। ভগবানের ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন হস্তক্ষেপ ব্যতীত সাহায্য আপনা হতেই আসত। এর অর্থ এই নয় যে এটা কেবল ভক্তের বিশ্বাসের জন্যই হত, এটা ভক্তের বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়ারূপে তাঁর করুণার প্রবাহ।

ইচ্ছা ব্যতিরেকে ও কখন কখনঃ এমনকি অবস্থার সম্বন্ধে না জানা সত্ত্বেও এই শক্তির প্রকাশে অনেক ভক্ত আশ্চর্য হয়ে যেত। দেবরাজ মুদালিয়ার একবার এ বিষয়ে শ্রীভগবানকে প্রশ্ন করে ও সেটা দিনলিপিতে বর্ণনা করে।

> "যদি জ্ঞানীদের মত ভগবানের মন নাশ হয়ে গিয়ে থাকে আর তিনি কোন ভেদ না দেখেন কেবল আত্মাই দেখেন তবে

তিনি কি করে প্রত্যেক শিষ্য বা ভক্তের সঙ্গে ব্যবহার বা তাদের জন্য অনুভব বা তাদের জন্য কিছু করেন ?" আমি শ্রীভগবানকে এটা জিজ্ঞাসা করে আরও যোগ করলাম, 'আমার ও আরও অনেকেরই এরূপ অনুভব হয় যে, যখন আমরা আমাদের দুঃখ-কষ্টে অত্যন্ত গভীর ভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তা যেখানেই থাকি না কেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য এসে যায়। একজন লোক ভগবানের কাছে এল, হয়ত কোন পুরাতন ভক্ত। সে ভগবানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর যা যা দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে সব বললে, ভগবান খুব ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে সব শুনলেন, মাঝে মাঝে আশ্চর্য ও বিস্ময় সূচক 'ও ! তাই নাকি ?' ইত্যাদিও বললেন। গল্পটা প্রায়ই শেষ হয় 'যখন কিছুতেই কিছু হল না তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম আর একমাত্র ভগবানই আমায় রক্ষা করলেন।' ভগবান সব মন দিয়ে শোনেন যেন এগুলো তাঁর কাছে নূতন এবং এ সংবাদ পরে আসা ভক্তদেরও বলেন 'অমুক লোকের মনে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার পর এই এই সব হয়েছিল।' আমরা জানি ভগবান ভান করেন না সুতরাং মনে হয় তিনি অন্ততঃ একটা স্তরে এসব কিছু জানেন না, যতক্ষণ না তাঁকে বলা হয়। আবার আমরা এও জানি যে, যখনই আমরা বিপদে পড়ি আর সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের কথা শোনেন আর কোন না কোন ভাবে সাহায্য করেন, যদি কোন কারণে সেই বিপদ এড়ান বা কমান না যায় অন্তত সেই কষ্টকে সহ্য করার শক্তি বা অন্য সুবিধা দেন।' যখন তাঁকে এই সব বললাম তখন তিনি উত্তর দিলেন-'হাঁ, সবই আপনা হতে হয়'।"

আর একজন ভক্তও এই বিষয়ে প্রশ্ন করে আর তিনি আরও স্পষ্ট করে উত্তর দেন, "জ্ঞানীর মন কোন বিষয়ে

দেওয়াই যথেষ্ট, এবং তাতে দৈবীক্রিয়া স্বতঃই আরম্ভ হয়।”

শ্রীভগবান ইচ্ছাকৃত ভাবে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ খুব কমই করতেন। তাছাড়া যদিও কখন করতেন সেটা তাঁর দীক্ষা ও উপদেশের মত অতি গোপনেই হত। শেষের দিকে তাঁর সেবকদের মধ্যে রাজাগোপাল আইয়ার নামে একজন গৃহস্থ ছিল, তার একটি তিন বছরের ছেলে ছিল, যার নাম ‘রমণ’ রাখা হয়েছিল। সুন্দর ছোট ছেলে, রোজ দৌড়ে এসে ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত। একদিন সন্ধ্যাবেলা তাকে সাপে কামড়াল। রাজাগোপাল আইয়ার তাকে তুলে নিয়ে সোজা হলঘরে চলে এল। আসতে আসতেই ছেলেটির রঙ নীল হয়ে উঠেছে। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে। শ্রীভগবান তার শরীরের ওপর হাত নেড়ে বললেন, “রমণ, তুমি ভাল হয়ে গেছ।” আর সেও ভাল হয়ে উঠল। রাজাগোপাল আইয়ার কয়েকজন ভক্তকে এ ঘটনার কথা বললে কিন্তু এ বিষয়ে বেশী আলোচনা হল না।

শ্রীভগবানের কাছে একজনের রক্ষা ও কল্যাণের প্রার্থনা করা এবং তাঁর ওপর একান্ত নির্ভর করা প্রায় এক হলেও এ দু'টির মধ্যে একটা পার্থক্য করতে হবে। পরেরটি তিনি অবশ্যই অনুমোদন করতেন। যদি কেউ তাদের শুভাশুভ তাঁর ওপর ছেড়ে দিত তিনি তা স্বীকার করে নিতেন। ‘অরুণাচল শিব’-এ তিনি গুরু-শিষ্যের মনোভাব সম্বন্ধে লিখেছিলেন, “তুমি কি আমায় ডাকনি? আমি এসেছি, আমার ভার এখন তোমার?” একবার তিনি একজন ভক্তের অনুরোধে ভগবদ্‌গীতা থেকে বিয়াল্লিশটি শ্লোক বাছলেন আর তাদের তাঁর নিজের শিক্ষা-পদ্ধতি অনুযায়ী সাজালেন, তার মধ্যে একটি শ্লোক হল—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২

"যে আমায় একান্ত মনে চিন্তা ও উপাসনা করে, যে নিত্য আমাতেই সংযুক্ত থাকে, আমি তার রক্ষা ও কল্যাণের ভার নেই।"

হয়ত কঠিন পরীক্ষা আর বিশ্বাসের চূড়ান্ত মূল্যায়নের কষ্টিপাথর-সরূপ অসহায় অবস্থা আসে কিন্তু যে ভক্ত ভগবানের ওপর বিশ্বাস রাখে সে সর্বদাই রক্ষা পায়।

ষোড়শ অধ্যায়
স্বলিখিত রচনাবলী

শ্রীভগবানের স্বলিখিত সমগ্র রচনার সংখ্যা খুবই কম আর তার মধ্যে প্রায় সবই কোন না কোন ভক্তের বিশেষ প্রয়োজনের অনুরোধে লেখা। একবার একজন কবির আশ্রমে আসা উপলক্ষ্যে ভগবান এ বিষয়ে কিরূপ মন্তব্য করেছিলেন তা দেবরাজ মুদালিয়ার তার দিনলিপিতে লিখেছে।

"এসব মনের ক্রিয়া। মনকে যত অনুশীলন করবে ততই কবিতা রচনায় সফলতা লাভ হবে আর ততই শান্তি কমে যাবে। যদি শান্তি লাভ না হয় তবে এই কুশলতায় কি লাভ? কিন্তু তাদের যদি একথা বলা যায় সেটা তাদের মনে ধরে না। তারা চুপ করে থাকতে পারে না। তাদের যেমন করেই হোক রচনা করে যেতে হবে……, আমার কিন্তু কখন বই লেখা বা কবিতা রচনা করার কথা মনে হয়নি। যা কিছু কবিতা আমি লিখেছি সবই কোন বিশেষ ঘটনা-কালে কারও না কারও অনুরোধে পড়ে। এমন কি 'সদ্‌বিদ্যা চত্বারিংশৎ' যার এখন এত ব্যাখা ও অনুবাদ হয়েছে সেটাও বই-এর আকারে রচিত হয়নি, সেগুলো বিভিন্ন সময়ে লেখা কতকগুলো খুচরো কবিতা আর পরে মুরুগনার ও অন্যেরা সাজিয়ে বই-এর রূপ দেয়। যে কবিতাগুচ্ছ আমার মনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে ও কারও বিনা অনুরোধে লিখতে যেন বাধ্য করে সেটা হল 'শ্রীঅরুণাচল একাদশ পদ' ও 'শ্রীঅরুণাচল অষ্টকম্'। একদিন একাদশ পদের প্রথম কথাগুলো আমার মনে এল, আমি 'এ কথাগুলো নিয়ে কি করব?' বলে থামাতে চেষ্টা করলাম। যতক্ষণ না সেগুলো নিয়ে 'একটা গান লেখা হল, ততক্ষণ সেগুলো কিছুতেই থামল না আর বিনা

চেষ্টায় কথাগুলো আপনা হতেই আসতে লাগল। এইভাবে পরের দিন দ্বিতীয় পদও রচিত হল আর পরের গুলো পর পর দিন রচিত হয়ে যেতে লাগল, কেবল দশম ও একাদশ পদ একদিনে রচিত হয়।”

তিনি তাঁর নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গীতে ‘অষ্টকম্’ রচনার কথাও বর্ণনা করেছিলেন।

“পরের দিন গিরি প্রদক্ষিণ করতে বার হলাম, পালানী-স্বামী আমার পিছনে আসছিল, খানিক দূর আসার পর মনে হয় আইযাস্বামী তাকে ডেকে তার হাতে কিছু কাগজ ও একটা পেন্‌সিল দিয়ে বলে ‘ক’দিন ধরে স্বামী প্রতিদিন কবিতা রচনা করছেন, আজও হয়ত করতে পারেন, তুমি বরং কাগজ পেন্‌সিল নিয়ে যাও।’

“আমি পালানীস্বামীকে কিছুক্ষণ সঙ্গে না থাকতে দেখে ও পরে এসে যোগ দিতে দেখে এটা জানতে পারলাম। সেদিন বিরূপাক্ষ গুহায় পৌঁছাবার আগেই আটটির মধ্যে ছ’টি পদ লেখা হয়ে গেল। সেদিন কি পরের দিন সন্ধ্যায় নারায়ণ রেড্ডী এল। সে সেই সময় ভেলোরে সিঙ্গার কোম্পানীর এজেন্ট ছিল আর মাঝে মাঝে এখানে আসত। আইযাস্বামী ও পালানী তাকে কবিতার কথা বললে, তাতে সে বললে, ‘আমাকে ওগুলো এখুনি দিয়ে দিন, আমি গিয়েই ছাপিয়ে ফেলব।’ সে আগেও কিছু বই ছাপিয়েছিল। সে আগ্রহ প্রকাশ করলে আমি বললাম যে সে নিয়ে গিয়ে ছাপাতে পাবে তবে প্রথম একাদশ পদ একটি কবিতা আর বাকী যেটা অন্য ছন্দে লেখা সেটা অন্য একটা কবিতা করে নিতে। সুতরাং সংখ্যা পূরণের জন্য আমি তৎক্ষণাৎ আরও দু’টি পদ লিখলাম আর সে মোট উনিশটি পদ ছাপাবার জন্য নিয়ে গেল।”

অনেক কবি বহু ভাষায় শ্রীভগবানের প্রশস্তি-সূচক গীত রচনা

করেছে তার মধ্যে গণপতি শাস্ত্রীর সংস্কৃত ভাষায় ও মুরুগনারের তামিল রচনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। যদিও পূর্বলিখিত আলোচনায় শ্রীভগবান কবিতা রচনাকে শক্তির অপচয় বলে হেয় করেছেন কিন্তু সেটা অন্তরাভিমুখী করলে সাধনায় পর্যবসিত হয়, তিনি অনুগ্রহ করে কবিতা শুনতেন, আর সেগুলো গান করা হলে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও গদ্য রচনাও হয়েছে আর প্রায়ই সেগুলো পাঠ করাতেন এবং যাতে সবাই বুঝতে পারে সেজন্য অনুবাদও করাতেন। তাঁর আগ্রহের নৈর্ব্যক্তিকতা ও বালকসুলভ সরলতা দেখে লোকে অবাক হয়ে যেত।

দু'টি গদ্য রচনা আছে যাকে শ্রীভগবানের লেখা বলা যায়। প্রারম্ভিক অবস্থায় বিরূপাক্ষ গুহাবাস কালে, যখন তিনি মৌন ধারণ করেছিলেন তখন বিভিন্ন সময় গম্ভীরম্ শেষায়ারকে কিছু উপদেশ লিখে দেন আর শেষায়ারের মৃত্যুর পর সেগুলো সংগ্রহ ও ক্রমবদ্ধ ক'রে "আত্মানুসন্ধান" নামে বই-এর আকারে প্রকাশিত হয়। অনুরূপ ভাবে তাঁর শিবপ্রকাশ পিল্লাইকে দেওয়া উত্তরগুলো বিস্তারিত ও ক্রমবদ্ধ ক'রে "আমি কে?" বই হয়। আর যা গদ্য রচনা আশ্রম প্রকাশ করেছে, সেগুলো তাঁর লেখা নয়, পরন্তু ভক্তদের প্রশ্নের উত্তররূপে দেওয়া মৌখিক ব্যাখ্যা, এসবই কথোপকথন রূপে সংগৃহীত হয়েছে।

তাঁর কবিতাগুলো দু'ভাগে ভাগ করা যায়—ভক্তিমূলক অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তিপূর্ণ এবং সিদ্ধান্তমূলক। প্রথম ভাগে 'শ্রীঅরুণাচল স্তুতি পঞ্চকম্', এগুলো সবই বিরূপাক্ষ গুহাবাস কালে লেখা। ভক্তিমূলক বলতে অদ্বৈতভাব পরিত্যাগ করে নয় পরন্তু পূর্ণভাবে জ্ঞান সংপৃক্ত। যদিও যিনি লিখেছিলেন তিনি প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত তাহলেও এগুলো সাধকের বা ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা। বিরহের বেদনায় নয় পরন্তু মিলনেরা আনন্দে লেখা আর এই কারণেই সেগুলো ভক্তদের প্রাণে এত সাড় জাগায়।

একাদশ পদ ও অষ্টকের কথা আগেই বলা হয়েছে। শেষেরটিতে,

ভগবান যে কেবল সাধকের ভাবে ভাবিত হয়ে লিখেছিলেন তা নয় পরন্তু 'যে পরমজ্ঞান লাভ করেনি' এই বাক্যটিও ব্যবহার করেছেন। একটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়ার জন্য একজন ভক্ত এ. বোস তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে, কেন তিনি এরূপ লিখলেন, এটা কি ভক্তদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ও তাদের জন্যই লেখা, আর শ্রীভগবান এটা স্বীকার করেছিলেন।

'স্তুতি পঞ্চকমের' শেষেরটি তিনি প্রথমে সংস্কৃতে লেখেন ও পরে তামিলে অনুবাদ করেন। এই রচনার বিষয়টি বিস্ময়জনক। গণপতি শাস্ত্রী তাঁকে একটা সংস্কৃত কবিতা লিখতে বলে, তিনি হেসে বলেন যে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের মূল নিয়ম বা সংস্কৃত ছন্দ কিছুই জানেন না। শাস্ত্রী তাঁকে একটা ছন্দ বুঝিয়ে দিলে ও তাঁকে চেষ্টা করার জন্য অনুরোধ করলে। সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি পাঁচটি শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন।

শ্রীঅরুণাচল পঞ্চরত্ন স্তোত্রম্

করুণাপূর্ণ সুধাব্ধে
কবলিতঘনবিশ্বরূপ-কিরণাবল্যা।
অরুণাচল পরমাত্মন্
অরুণো ভব চিত্তকঞ্জসুবিকাসায় ॥১

ত্বয্যরুণাচল সর্বং
ভূত্বা স্থিত্বা প্রলীনমেতচ্চিত্রম্।
হৃদ্যহমি ত্যাত্মতয়া
নৃত্যাসি ভোস্তে বদন্তি হৃদয়ং নাম ॥২

অহমিতি কুত আয়াতী
ত্যন্বিষ্যান্তঃ প্রবিষ্টয়াঽত্যমলধিয়া।
অবগম্য স্বং রূপং
শাম্যত্যরুণাচল ত্বয়ি নদীবাব্ধৌ ॥৩

ত্যক্ত্বা বিষয়ং বাহ্যং
রুদ্ধপ্রাণেন রুদ্ধমনসাঽন্তস্ত্বাম্।
ধ্যায়ন্ পশ্যতি যোগী
দীধিতিমরুণাচল ত্বয়ি মহীয়ং তে ॥৪

ত্বয্যর্পিতমনসা ত্বাং
পশ্যন্ সর্বং তবাকৃতিতয়া সততম্।
ভজতেঽনন্যপ্রীত্যা
স জয়ত্যরুণাচল ত্বয়ি সুখে মগ্নঃ ॥৫

বাংলা অনুবাদ ঃ

করুণাপূর্ণ সুধার সাগর, কিরণমালায়
বিজড়িত করি বিশ্বরূপ,
অরুণাচল পরমাত্মা! সবিতা সম
বিকসিত কর হৃদয়-পদ্ম ॥১

তোমাতেই অরুণাচল! সকলই
হয়, রয়, যায়, এ এক অতীব বিস্ময়,
হৃদয়ে তুমি, অহং রূপে-আত্মা
নাচিছ 'আমি' 'আমি', হৃদয় তোমার নাম ॥২

অতি শুদ্ধ চিত্তে এ অহং কোথা হতে
যদি খোঁজে অন্তরে
জানিয়া স্বীয় রূপ শান্তি পায়, অরুণাচল!
প্রবাহিনী যেন পারাবারে ॥৩

বাহ্য বিষয় ছাড়ি, প্রাণমন এক করি
অন্তরের অন্তস্তলে যোগী
ধ্যানে দেখে তব জ্যোতি, তোমাতেই সুখী অতি
অরুণাচল! মহিমা তোমারই ॥৪

তোমাতে অর্পিত মন, ভক্ত দেখে সর্বক্ষণ
আত্মাই সর্বস্থানে, আত্মাতেই সব।
অনন্য প্রীতিতে ভজে, তব সুখে নিত্য মজে
অরুণাচল! তার জয় এ ধরায় ॥৫

এই শ্লোকগুলো অন্য চারটি কবিতা অপেক্ষা বেশী সিদ্ধান্ত-মূলক, তিনটি মুখ্য পথের সার সংগ্রহ ক'রে লেখা। পরে এদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীভগবান বলেন "তৃতীয় শ্লোকে সৎ, চতুর্থ শ্লোকে চিৎ ও পঞ্চমটিতে আনন্দ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। যেমন নদী সমুদ্রে মিশে যায় জ্ঞানীও তেমনি সৎ-এর সঙ্গে এক হয়ে যায়; যোগী চিৎ-এর জ্যোতি দেখে; ভক্ত বা কর্মযোগী আনন্দ-প্রবাহে নিমগ্ন হয়।"

যাই হোক এই পাঁচটি স্তুতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা হৃদয়স্পর্শী ও প্রিয় হল 'শ্রীঅরুণাচল অক্ষর মনমালৈ' যাকে সাধারণতঃ তার ধ্রুবপদের জন্য "অরুণাচল শিব" বলা হয়। প্রারম্ভিক কালে বিরূপাক্ষ গুহায় বাসের সময়, পালানীস্বামী ও অন্যেরা অল্প কয়েকজন ভক্তের জন্য সহরে ভিক্ষায় যেত, একদিন তারা শ্রীভগবানকে ভিক্ষার সময় গাইবার জন্য একটি ভক্তিগীত রচনার কথা বলে। তিনি উত্তর দেন যে অনেক সাধুসন্তের লেখা অপূর্ব ভক্তিগীত আছে, বহু গীত অনাদৃত হয়ে রয়েছে সুতরাং নূতন গান রচনার প্রয়োজন নেই। যা হোক, তারা ছাড়লে না পীড়াপীড়ি করতে লাগল, আর কয়েকদিন বাদে তিনি কাগজ ও পেন্‌সিল নিয়ে প্রদক্ষিণে বার হলেন, পথে ১০৮টি পদ রচনা করেন।

গান লেখার সময়ে ভাবাবেগে তাঁর আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে, কখন কখন চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে যায়, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। ভক্তদের কাছে এই কবিতাটি খুবই অনুপ্রেরণাদায়ী হয়েছিল। এতে জ্বলন্ত প্রতীকের মাধ্যমে বিরহ-বেদনা আর মিলন-আনন্দের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি বিধৃত। জ্ঞানের পূর্ণতা ও ভক্তির আনন্দাতিশয্য একই আধারে সমাবিষ্ট। তবুও এই সর্বাধিক মার্মিক কবিতাটি যে সাধক এখনও খুঁজে চলেছে তার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লিখিত। এটি একটি

বর্ণানুক্রমিক কবিতা, এর ১০৮টি পদের আদ্যক্ষর তামিল ভাষার বর্ণমালা অনুসারে লেখা। তা সত্ত্বেও কোন কবিতা এত স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কয়েকজন ভক্ত শ্রীভগবানকে কয়েকটি পদের ব্যাখ্যার জন্য বলে, তিনি উত্তর দেন "তুমি ভেবে দেখো আমিও ভাববো। আমি ভেবে লিখিনি, যা এসেছিল তাই লিখেছি।"

ছাড়ায়ে গৃহবাস,
করালে হৃদি-গুহাবাস, অরুণাচল! অ···

কিবা তব সুখ লাগি
কিবা মোর সাধে
এখানে আনিলে ডাকি।
এবে যদি ছাড় তুমি
অপযশ হবে স্বামী, অরুণাচল! অ···

ভঞ্জহ অপবাদ
কেন বা আনিলে টানি?
এবে কোথা যাব স্বামী, অরুণাচল! অ···

মাতৃস্নেহ অপার
তব স্নেহ তারও পার
এই কি তার নিদর্শন, অরুণাচল! অ··

হউক আমার মন
তোমার স্থিরাসন
যেন সে না হয় চঞ্চল, অরুণাচল! অ···

তোমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ করি তারে
চঞ্চল মনেরে ডুবাও শান্তি পারাবারে, অরুণাচল! অ···

হরণ করিয়া মোরে
আলিঙ্গন নাহি দিলে
বীর্য তোমার কোথা রহে, অরুণাচল ! অ···

আর ঘুমায়ো না স্বামী
ধর্ষিত হতেছি আমি, অরুণাচল। অ··

পঞ্চ ইন্দ্রিয় চোর
লুঠিছে ভাণ্ডার মোর
নহে কি জাগ্রত সদা
হৃদয়ে আমার প্রভু, অরুণাচল ! অ···

এক অদ্বিতীয় তুমি
তবে যে দ্বিতীয় ভান
তোমার কুহক খান, অরুণাচল ! অ···

ধ্রু—অরুণাচল শিব ! অরুণাচল শিব !
অরুণাচল শিব ! অরুণা—চল—!

একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে। একবার একদল ঋষি তাদের পরিবার সমেত এক বনে বাস ক'রে কর্মকাণ্ড অভ্যাস অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি ও জপতপ ক'রে অলৌকিক যোগশক্তি লাভ করে। তারা মনে করত যে এই ভাবে মোক্ষ লাভ করবে। এতে অবশ্য তাদের ভুল হয়েছিল। এই ভুলের দণ্ড দিতে শিব এক তপস্বীর বেশ ও বিষ্ণু একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক মোহিনীর বেশ ধারণ করে তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন। ঋষিরা মোহিনী ও ঋষিপত্নীরা শিবের প্রেমে অভিভূত হল, তার ফলে তাদের মানসিক সমতা নষ্ট হল ও যোগশক্তিও লোপ পেল। এই দেখে তারা ভাবলে যে, শিব নিশ্চয় তাদের শত্রু সুতরাং

ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া দ্বারা সাপ, একটা বাঘ ও একটা হাতী তৈরি করে শিবের বিপক্ষে পাঠালে। যাহোক শিব সাপেদের গলায় মালা করে পরলেন আর বাঘ ও হাতীকে মেরে তাদের ছাল একটিকে কোমরে কৌপীন ও অন্যটিকে অঙ্গবস্ত্র করলেন। ঋষিরা শিবের অসীম শক্তি দেখে নতমস্তকে তাঁর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলে। তখন শিব তাদের ভুল সংশোধন করে শিক্ষা দিলেন যে, কর্ম কখন কর্ম হতে মুক্তি দিতে পারে না, কর্মও একটা ক্রিয়া সেটা সৃষ্টির কারণ (আধার) নয়, কর্মের অতীতে বিচারে যাওয়া প্রয়োজন।

কবি ও ভক্ত মুরুগনার এই কাহিনীটি তামিল কবিতায় লেখে কিন্তু যখন সে শিবের ঋষিদের উপদেশ দেওয়ার প্রসঙ্গে এল তখন যিনি নিজেই শিবের অবতার সেই ভগবানকে সেটা লেখার জন্য অনুরোধ করলে। তার ফলে ভগবান 'উপদেশ সারম্' লেখেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে অনাসক্ত ভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম ফলদায়ক হলেও, উচ্চৈঃস্বরে জপ, তার থেকে অধিক মানসিক জপ, তার অপেক্ষা অধিকতর ও সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ হল ধ্যান। শ্রীভগবান এই ত্রিশটি শ্লোক সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। এই সংস্কৃত শ্লোকগুলোকে শাস্ত্রগ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয় কারণ এগুলো শ্রীভগবানের সম্মুখে বেদ-পারায়ণের সঙ্গে নিত্য পাঠ হত আর এখনও তাঁর সমাধির কাছে পাঠ হয়।

এই ত্রিশটি শ্লোকে আর সদ্‌বিদ্যা চত্বারিংশৎ (উল্লাদু-নারপদু) ও তার আরও চল্লিশটি অনুবন্ধে শ্রীভগবানের উপদেশ বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে।

সদ্‌বিদ্যা চত্বারিংশতের অনেক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা হয়েছে। এর একটা সার্বজনীনতা আছে। এটি এতই সংক্ষিপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। অথচ আগে বর্ণিত কথোপকথনে শ্রীভগবানের মন্তব্য অনুসারে এটা ক্রমবদ্ধ কবিতারূপে রচিত হয়নি, পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন সময়ে লেখা। অনুবন্ধের বহু পদই শ্রীভগবানের স্বরচিত নয়; অন্যান্য স্থান থেকে নেওয়া কারণ যখন একটা উপযুক্ত শ্লোক রয়েছে

তখন আর তিনি নূতন করে লেখার আবশ্যকতা অনুভব করেন নি। সমগ্র পদগুচ্ছটি তাঁর সিদ্ধান্তের সর্বাপেক্ষা সুগভীর ও সম্পূর্ণ সংগ্রহ।

এই দু'প্রকার কবিতা ছাড়া আরও কিছু ছোট কবিতা আছে। তাতে ব্যঙ্গ-কৌতুকও বাদ যায়নি। একটিতে দক্ষিণ ভারতীয় সুস্বাদু পাঁপড় তৈরী করার প্রণালীর মাধ্যমে সাধনার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। একদিন শ্রীভগবানের মা এই পাঁপড় তৈরী করার সময় তাঁকে সাহায্য করতে বলেন। তাতে তিনি এই প্রতীক-মূলক প্রণালীটি স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে লেখেন।

কবি আভৈয়ার একবার পাকস্থলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে লেখে—

একদিনও তুমি উপবাস করিবে না,
দু'দিনের আহার একবারে কর না।
তোমার তরে আমার কত জ্বালাতন
হে পাকস্থলী! তোর সাথে বাস করা অসম্ভব॥

একদিন আশ্রমে খাওয়া-দাওয়া ছিল, সবাই ভরপেট খেয়ে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিল। শ্রীভগবান আভৈয়ারের কবিতাটির ব্যঙ্গোক্তি করে জঠরের অভিযোগ নামে একটি লালিকা লেখেন—

এক মুহূর্তও বিশ্রাম আমারে দাও না
দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাদ্য গ্রহণ।
তোমার তরে আমার কত বিড়ম্বনা
হে দুখদায়ী অহং! তোমার সাথে বাস অসম্ভব॥

১৯৪৭ সালে তিনি তাঁর শেষ কবিতা রচনা করেন। এটি কোন উপরোধে লেখা নয়, তথাপি এর মধ্যে একটা কুশলী দক্ষতার পরিচয় আছে কারণ এটা তিনি প্রথমে তামিল ছন্দে তেলেগুতে লেখেন, পরে তামিলে অনুবাদ করেন। একে 'একাত্মপঞ্চকম্' বলা হয়—

আত্মা ভুলে, দেহজ্ঞানে লক্ষ যোনি ভ্রমণ
বিচিত্র জগৎ দর্শন, স্বপনে যেমন।
আত্মজ্ঞান, নিদ্রা হতে যেন জাগরণ॥ ১

আপনারে প্রশ্ন করা আত্মাতে থেকে
কোথা হতে আসিলাম ? আমিই বা কে ?
আত্মপরিচয় যেন জিজ্ঞাসে মণ্ডপে ॥ ২

আত্মাতেই দেহ স্থিত, দেহে আত্মবুদ্ধি,
চিত্রাধার প্রচ্ছদপট চিত্রে আছে কি ? ৩

সুবর্ণ বিনা স্বর্ণালঙ্কার কোথায় ?
আত্মাবিনা দেহজ্ঞান হয় বা কাহার ?
দেহকেই আত্মজ্ঞান সেই তো অজ্ঞানী,
আত্মাকেই আমি বোধ প্রবুদ্ধ ও জ্ঞানী ॥ ৪

এক আত্মা নিত্য সত্য একক অনাদি।
মৌন ব্যাখ্যা দিল যার দক্ষিণা মূরতি,
পূর্বতন গুরু, সে বাক্য মনাতীত ॥ ৫

আরও কিছু অনুবাদ আছে বেশীর ভাগই শঙ্করাচার্যের। একবাব একজন দর্শনার্থী বিরূপাক্ষ গুহায় শঙ্করাচার্যের একখানা 'বিবেক চূড়া-মণি' রেখে যায়। শ্রীভগবান গম্ভীরম্ শেষায়ারকে সেটা পড়তে বলেন. সে কিন্তু সংস্কৃত জানত না সুতরাং একটা তামিল অনুবাদ চায়। পালানীস্বামী একটা তামিল পদ্য অনুবাদ কারও কাছ থেকে চেয়ে আনে, সেটা দেখে প্রকাশককে আর একখানার জন্য লেখা হয়, প্রকাশক জানায় যে বইটা ফুরিয়ে গেছে। শেষায়ার শ্রীভগবানকে সহজ তামিল গদ্যে লিখে দিতে অনুরোধ করে। শ্রীভগবান লিখতে আরম্ভ করেন, ইতিমধ্যে শেষায়ার চেয়ে পাঠানো পদ্য সংস্করণটা পেয়ে যায় সুতরাং লেখাটা অসমাপ্ত পড়ে থাকে। কয়েক বছর পরে আর একজন ভক্তের সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি সেটা শেষ করেন। তখনই ভক্তটি বলে যে তার আগ্রহের কারণ হল এটা প্রকাশ করা। একথা শুনে শ্রীভগবান একটা প্রস্তাবনা লেখেন যে যদিও একটা তামিল পদ্যানুবাদ আছে, আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও এই গদ্যানুবাদ কাজে লাগতে

পারে। প্রস্তাবনাতেই বইটির সার সন্নিহিত আছে আর সিদ্ধান্ত ও পথের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও দেওয়া আছে।

সর্বশেষ তিনি যা লেখেন সেটা হল শঙ্করাচার্যের 'আত্মবোধের' তামিল অনুবাদ। এই বইটা তাঁর কাছে সেই প্রথম বিরূপাক্ষ যুগের সময় থেকেই ছিল কিন্তু কোনদিন তাঁর অনুবাদ করার কথা মনে হয়নি। ১৯৪৯ সালে একটা তামিল অনুবাদ, বোধহয় খুব সঠিক নয়, আশ্রমে প্রেরিত হয় আর এর অল্পদিন পরেই শ্রীভগবান এটা অনুবাদ করার প্রেরণা পান। কয়েকদিন তিনি এই প্রেরণাকে অগ্রাহ্য করেন কিন্তু অনুবাদের শব্দগুলো একটা কবিতার রূপে আসতে লাগল, যেন এগুলো আগেই লেখা হয়ে গেছে সুতরাং তিনি কাগজ পেন্‌সিল চাইলেন আর লিখে ফেললেন। কাজটা এতই অনায়াসে হয়েছিল যে তিনি হেসে বললেন যে তাঁর ভয় হচ্ছিল পাছে অন্য কোন লেখক এসে বলে যে, এটা আসলে তার লেখা কেবল নকল করা হয়েছে।

শ্রীভগবানের চয়নের মধ্যে ভগবদ্‌গীতার বিয়াল্লিশটি শ্লোকের একটা সঙ্কলনও আছে ; তিনি একজন ভক্তের অনুরোধে এগুলো তাঁর শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে চয়ন করে পুনরায় সাজান। এটি ইংরাজীতে 'সং সিলেস্টিয়াল' নামে অনুবাদ করা হয়।

———

সপ্তদশ অধ্যায়

মহাসমাধি

দেহাবসানের কিছু আগে থেকে প্রায় ১৯৪৭ সালের পর থেকে শ্রীভগবানের স্বাস্থ্য উদ্বেগজনক হয়। বাত যে কেবল তাঁর পা দু'টি অক্ষম করে তা নয় কাঁধে ও পিঠেও বাতের আক্রমণ হয়। সেটা ছাড়াও একটা খুবই দুর্বলতার ভাব দেখা যেত, যদিও তিনি সেটা মোটেই গ্রাহ্য করতেন না। সবাই অনুভব করলে যে আশ্রমের সাধারণ খাদ্যের অপেক্ষা তাঁর আরও কিছু পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন কিন্তু তিনি কোন কিছু বিশেষ খাদ্য গ্রহণ করতে রাজী হলেন না।

তাঁর বয়স তখনও সত্তর বছর হয়নি তবু তাঁকে অনেক বেশী বয়স্ক দেখাত। চিন্তা জর্জরিত নয় কারণ চিন্তার বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখা যেত না—তিনি চিন্তা কি জানতেন না। কেবল বয়োভারগ্রস্ত আর খুব দুর্বল। যিনি এত বলবান ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন, জীবনে অসুস্থতা কি তা জানতেন না, যাঁর কোন শোক বা দুঃখ ছিল না, তিনি বয়সের তুলনায় এত জরাগ্রস্ত হয়ে গেলেন কেন? যিনি সংসারের পাপতাপ গ্রহণ করেন—যিনি ভক্তদের কর্ম বন্ধন ক্ষয় করেন—তিনিই কেবল নিজে সেই সমুদ্র মন্থনের বিষ পান করে শিবের মত সংসারকে রক্ষা করতে পারেন। শ্রীশঙ্কর লিখেছেন "হে শম্ভু! প্রাণনাথ! তুমি ভক্তের ভবভার বহন কর।" (শম্ভো ভবসি ভবভারং চ বহসি)।

শ্রীভগবান যে স্থূলভাবেও ভার বহন করতেন তার অনেক লক্ষণই ছিল কিন্তু প্রায়ই সেটা বোঝা যেত না। একজন ভক্ত কৃষ্ণমূর্তি, জানকী আম্মাল নামে একজন মহিলা ভক্তের দ্বারা প্রকাশিত একটি তামিল পত্রিকায় লিখেছিল যে একদিন সে আশ্রমে গিয়ে হলঘরে বসেছে সেই সময় তার তর্জনীতে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল। সে কাউকে বলেনি কিন্তু কি আশ্চর্যের বিষয়, সে দেখলে যে শ্রীভগবান নিজের হাতের ঠিক

সেই আঙ্গুলটি ধরে মালিশ করছেন আর তার নিজের আঙ্গুলের ব্যথা চলে গেল। অনেকেই এরূপে কষ্টের লাঘব হতে দেখেছে।

শ্রীভগবানের কাছে পার্থিব জীবনটা এমন কিছু মূল্যবান ধন ছিল না—যা বাঁচিয়ে খরচ করতে হবে ; সুতরাং এটা কতদিন থাকল তার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। একবার হলঘরে তাঁর আয়ু সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল। কেউ বললে যে জ্যোতিষীরা বলেছে তাঁর আয়ু আশী বছর, কেউ একজন এটা সঠিক বলে মেনে নিতে রাজী হল না ; কেউ বা এটা শ্রীভগবান যাঁর কোন কর্মক্ষয় করাব প্রশ্ন নেই তাঁর পক্ষে খাটে কিনা সন্দেহ করলে। তিনি হাসিমুখে আলোচনা শুনলেন কিন্তু তাতে অংশ গ্রহণ করলেন না। একজন নবাগত এতে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ভগবান এ সম্বন্ধে কি বলেন ?" তিনি কিছু উত্তর করলেন না, কিন্তু যখন দেবরাজ মুদালিয়ার তাঁর হয়ে উত্তর দিলে "ভগবান এ সম্বন্ধে চিন্তাই করেন না", তখন তিনি অনুমোদনের হাসি হাসলেন। তাঁর জীবনের শেষ বছরটি এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভক্তেরা তাঁর কষ্টের জন্য শোক করত আর আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে বিহ্বল হত, তিনি কিছুই করতেন না।

১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে তাঁর বাঁ হাতের কনুই-এর নীচে একটি ছোট আঁচিলের মত হয়। এটা এমন কিছু মারাত্মক মনে হয়নি কিন্তু আশ্রমের ডাক্তার ফেব্রুয়ারী মাসে সেটা কেটে দেয়। একমাসের মধ্যে এটা আরও বড় ও বেদনাদায়ক হয়ে দেখা দিল, তখন সেটা সাংঘাতিক টিউমার বলে জানা গেল আর সকলের দুশ্চিন্তা শুরু হল। মার্চ মাসের শেষের দিকে মাদ্রাজ থেকে ডাক্তারেরা এসে অস্ত্রোপচার করলে। ক্ষতটা ঠিকমত ভাল হল না আর টিউমারটি আরও ওপরে ও আরও বড় হয়ে বেড়ে চলল।

এরপর থেকে শোকের ছায়া নেমে এল আর আসন্ন বিপদের আশঙ্কা অনিবার্য হয়ে উঠল। পুরাতনপন্থী চিকিৎসকেরা মত দিলে যে এই টিউমার ভাল করা যাবে না, অস্ত্রোপচার করা যেতে পারে, তা

সত্ত্বেও আবার হতে পারে। আর রেডিয়াম প্রয়োগ করলেও যদি এটা আবার হয় তাহলে মৃত্যুর কারণ হবে। অন্য একদল মনে করেছিল যে এটা সারান যায় আর অস্ত্রোপচার করলে এটা আরও বেড়ে যাবে, বস্তুতঃ তাই হল ; কিন্তু সময়ে এই চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি।

যখন মার্চ মাসের অস্ত্রোপচারের পর টিউমার আবার দেখা দিল, ডাক্তারেরা হাতটি কেটে ফেলার পরামর্শ দিলে কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে জ্ঞানীর শরীর বিকৃত করা উচিত নয়। বস্তুতঃ তাকে শল্য দিয়ে ছেদ করা ঠিক নয় আর এমনিতেই অস্ত্রোপচারে সেই রীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। শ্রীভগবান তাতে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু অঙ্গচ্ছেদ করার কথায় রাজী হলেন না। "চিন্তার কোন কারণ নেই, শরীরটাই একটা রোগ, একে স্বাভাবিক ভাবে শেষ হতে দাও। এটাকে বিকৃত করা কেন? কেবল একটা ব্যাণ্ডেজ করলেই হবে।"

তাঁর "চিন্তার কোন কারণ নেই" কথাতে একটা আশা করা গিয়েছিল যে তিনি ভাল হয়ে যাবেন যদিও তাঁর পরের কথাগুলো ও চিকিৎসকদের অভিমত ভিন্নরূপ ছিল ; কিন্তু তাঁর কাছে মৃত্যু একটা কোন চিন্তাই নয়।

"সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে," এই কথা বলেও তিনি আশার সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই ঘটনার যথার্থতা দেখার কথা ; তাঁর বিন্দু মাত্র সন্দেহ ছিল না।

এই সময় তিনি ভাগবতের একটি শ্লোক (একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ছত্রিশ শ্লোক) তামিলে অনুবাদ করেন—"ফলদায়ী কর্মসঞ্জাত শরীর স্থির থাকুক বা বিচরণশীল হোক, জীবিত থাকুক বা মৃত হোক, যে জ্ঞানী আত্মোপলব্ধি করেছেন তিনি এ সম্বন্ধে সচেতন নন, যেমন কোন উন্মত্ত মদ্যপ তার অঙ্গবস্ত্র সম্বন্ধে সচেতন নয়।"

কিছুদিন পরে তিনি 'যোগবাশিষ্ঠে'র একটি শ্লোক ব্যাখ্যা করে-ছিলেন "যে জ্ঞানী নিজেকে নিরাকার চৈতন্যমাত্র বলে জানে তাকে

তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেও সে বিচলিত হয় না মিছরির ডেলা ভাঙ্গ বা গুঁড়ো কর তার মিষ্টতা যায় না।"

শ্রীভগবান সত্যই কি কষ্ট পেতেন? তিনি একজন ভক্তকে বলেছিলেন "ওরা এই শরীরটাকে ভগবান মনে করে আর এতে কষ্ট আরোপ করে। কি দুঃখের কথা!" আর একজন সেবককে বলেছিলেন "মন না থাকলে, যন্ত্রণা কোথায়?" অথচ শীত ও উষ্ণতা স্বাভাবিকভাবে অনুভব করতেন ও তাদের প্রতি সংবেদনশীল ছিলেন, আব একজন ভক্ত এস. এস কোহেন অনেক বছর আগে বলা একটি কথা লিপিবদ্ধ করেছিল "যদি জ্ঞানীব হাত ছুরি দিয়ে কাটা যায় তবে অন্যের মতই বেদনা হয় কিন্তু তার মন সর্বদা আনন্দে থাকায় সে অন্যদের মত যন্ত্রণার তীব্রতা অনুভব করে না।" কথাটা এ নয় যে, জ্ঞানীর শরীরটা আঘাত জনিত ব্যথা পায় না কিন্তু তিনি নিজেকে শরীরের সঙ্গে এক মনে করেন না। যন্ত্রণা যে ছিল ও পরের অবস্থায় সেটা অত্যন্ত তীব্র ভাবে হয়েছিল এ বিষয়ে চিকিৎসকেরা ও কয়েকজন সেবক নিঃসন্দেহ ছিল। তবু তারা শ্রীভগবানের এই যন্ত্রণাব প্রতি উদাসীনতা, এমনকি অস্ত্রোপচারের সময়ে তাঁর সম্পূর্ণ নির্বিকারভাব দেখে আশ্চর্য হয়ে যেত।

তাঁর যন্ত্রণাবোধের প্রশ্ন ঠিক আমাদের কর্মের প্রশ্নেব মত, কেবল দ্বৈতবোধের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিদ্যমান; তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ অদ্বৈত দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'টির কোন অস্তিত্ব নেই। ঠিক এই অর্থেই তিনি বার বার ভক্তদের বলেছেন "তোমরা যদি মনে, কর যে আমি অসুস্থ তা হলেই আমি অসুস্থ; তোমরা যদি মনে কর আমি ভাল তাহলে আমি ভাল হয়ে যাব।" যতক্ষণ একজন ভক্ত নিজের শরীর ও তাব কষ্টকে বাস্তব মনে করে ততক্ষণ তার পক্ষে গুরুর শরীর ও তার কষ্ট পাওয়াও বাস্তব।

মার্চ মাসের অস্ত্রোপচারের পর একজন গ্রামীণ কবিরাজকে গাছগাছড়া দিয়ে এক সপ্তাহ চিকিৎসা করতে দেওয়া হল কিন্তু তাতে

কোন ফল হল না। আর একজন আগ্রহী চিকিৎসক, যাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল তাকে শ্রীভগবান বলেছিলেন, "তোমার এত কষ্ট করে ওষুধ তৈরী করার পর আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না।" একবারও তাঁর নিজের অবস্থার কথা নয় কেবল যারা তাঁকে ভাল করার ইচ্ছা করছে আর যখন যে চিকিৎসকের অধীনে রয়েছেন তাদের প্রতি সহৃদয়তা। মাঝে মাঝে তাঁর শরীরের ওপর এত মনোযোগ দেওয়ার জন্য তিনি প্রতিবাদ করতেন। অনেকবার যখন মনে হত যে কিছু উন্নতি হয়েছে তিনি আর কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই বলে দিতেন।

টিউমার, যা এখন ভ্রূণার্বুদ বা 'সারকোমা' বলে নির্ণীত হয়েছে, তাঁর যৎসামান্য বাকী শক্তিটুকু প্রায় নিঃশেষ করলে, তবু এত দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মুখমণ্ডল আরও কোমল, আরও করুণাপূর্ণ, আরও দীপ্ত সৌন্দর্যময় হয়ে উঠল। অনেক সময় তাঁর মাধুর্য চোখে সহ্য করা যেত না।

হাতটি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হয়েছে আর টিউমারও বেড়ে চলেছে। মাঝে মাঝে তিনি স্বীকার করতেন যে "যন্ত্রণা আছে" কিন্তু তিনি কখনই বলতেন না—"আমার যন্ত্রণা হচ্ছে।"

আগস্ট মাসে তৃতীয়বার অস্ত্রোপচার করা হল ও তারপর দূষিত কোষগুলো নষ্ট করা ও টিউমার না হওয়ার আশায় রেডিয়াম প্রয়োগ করা হল। শ্রীভগবান এতই করুণাময় ছিলেন যে সেইদিন অপরাহ্ণে অস্ত্রোপচারের কয়েকঘণ্টা বাদে, যাতে ভক্তরা সামনে দিয়ে দর্শন করে যেতে পারে সেজন্য যেখানে অস্ত্রোপচার হয়েছিল সেই হাসপাতালের বারাণ্ডায় এসে বসলেন কিন্তু তাঁর মুখে কোন যন্ত্রণার চিহ্ন নেই। আমি একদিনের জন্য মাদ্রাজ থেকে এসেছিলাম আর যখন তাঁর সামনে দাঁড়ালাম তখন তাঁর হাসির উজ্জ্বলতায় তাঁর মুখের ক্লান্তির রেখাগুলোও মুছে গেল। তাঁর হাসপাতালে থাকাতে অন্য রোগীদের অসুবিধা হচ্ছে ভেবে পরের দিন মধ্যাহ্নে হলঘরে চলে এলেন।

চিকিৎসাক্ষেত্র ছাড়াও একটা অনিবার্যতার গভীর অনুভূতি ছিল—শ্রীভগবান জানতেন এক্ষেত্রে কি করণীয় আর তাঁর দেহাবসানের প্রস্তুতির জন্য আমাদের শক্তি দিতে চেষ্টা করতেন। এই দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক পীড়া প্রকৃতপক্ষে যেন আমাদের অনিবার্য বিচ্ছেদ, যা অনেকেই প্রথমে সহ্য করতে পারবে না মনে করছিল তার প্রস্তুতির উপায় রূপে এসেছে বলে মনে হতে লাগল। কিট্টী তখন পাহাড়ে বোর্ডিং স্কুলে ছিল, তাকে একটা চিঠি লিখে জানানো হল আর সে লিখে পাঠালো "আমি এই খবর পেয়ে খুবই দুঃখিত হলাম, কিন্তু যা আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল তা ভগবান জানেন।" তার চিঠিটা তাঁকে দেখান হল। কিট্টির বিবেচনা "তাঁর ভাল" নয় "যা আমাদের ভাল" সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

যারা তাঁর কষ্টের জন্য কাতর হত তাদের ওপর তাঁর গভীর অনুকম্পা ছিল; তাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করতেন; সেটা নিজের কষ্ট দূর করা রূপ সহজ পন্থায় বা মৃত্যুকে কয়েক বছর ঠেকিয়ে রেখে নয় কিন্তু একেবারে মৌলিক উপায়ে তাদের বুঝিয়ে দিয়ে যে শরীরটা ভগবান নয়। "ওরা এই শরীরটাকে ভগবান মনে করে আর তাঁতে কষ্ট আরোপ করে। কি পরিতাপের কথা! ওরা হতাশ হচ্ছে যে ভগবান ওদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—তিনি কোথায় যাবেন আর কেমন করেই বা যাবেন?"

আগস্ট মাসের অস্ত্রোপচারের পর মনে হল যেন কিছু উন্নতি হল কিন্তু নভেম্বর মাসে আরও উঁচুতে কাঁধের কাছে সেটি আবার দেখা দিলে। ৪ঠা ডিসেম্বর শেষ অস্ত্রোপচার হল। এই ক্ষত আর সারল না। এখন চিকিৎসকেরা স্বীকার করলে যে তাদের আর করার কিছু নেই। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে, টিউমার যদি আবার দেখা দেয় তবে কেবল বেদনা উপশমকারী ওষুধ দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

জয়ন্তী ১৯৫০ সালে ৫ই জানুয়ারী পড়ল। তাঁর সত্তর বছর বয়স পূর্তি দিবস উপলক্ষ্যে, যা প্রায় নিশ্চিত রূপে শেষ জন্মদিন উৎসব,

শোকাতুর ভক্তবৃন্দ সমবেত হল। তিনি দর্শন দিলেন ও তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত অনেক নূতন প্রশস্তি গীত শুনলেন। মন্দিরের হাতী সহর থেকে এল, মাথা নীচু করে শুঁড় দিয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করলে। একজন উত্তর ভারতীয় রানীকে এর চলচ্চিত্র নিতে দেওয়া হল। আশঙ্কার শোকময় পরিবেশে উৎসবের আয়োজন হল।

অনেকেই অনুভব করলে যে আর কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার। এখন্ যখন অবস্থা একান্তই আয়ত্তের বাইরে চলে গেল তখন শ্রীভগবানকে কি পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হবে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন, "আমি কি কখন কোন চিকিৎসার কথা বলেছি? তোমরাই কেবল আমার জন্য এটা ওটা করতে চেয়েছ। আমায় যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আমি সব সময়ই বলব যেমন গোড়াতেও বলেছি, কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। যা হওয়ার হতে দাও।"

কেবল এর পর হোমিওপ্যাথি চেষ্টা করা হল আর তারপর আয়ুর্বেদ, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

শ্রীভগবান শারীরিক ভাবে অসম্ভব না হওয়া অবধি তাঁর প্রাত্যহিক নিয়ম পালন করে চললেন। তিনি প্রতিদিন সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা আগে স্নান করতেন, দর্শন দেওয়ার জন্য নিয়মিত সকাল ও সন্ধ্যায় বসে থাকতেন, আশ্রমের চিঠিপত্র দেখতেন আর আশ্রম প্রকাশিত বইগুলোর মুদ্রণ পর্যবেক্ষণ করে প্রায়ই তাদের সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন। জানুয়ারী মাসের পর দুর্বলতার জন্য তাঁর পক্ষে হলঘরে বসে দর্শন দেওয়া আর সম্ভব হল না। নূতন হলঘরের পূর্বদিকে পথের অন্যদিকে স্নানঘর সমেত একটা ছোট ঘর তৈরী করা হয় আর শেষের দিকে তিনি সেখানেই ছিলেন। ঘরের সামনে একটা সরু বারাণ্ডা ছিল, তাঁর সোফাটা বারাণ্ডার একেবারে ধারে আনা হত, আর অসুস্থতার কথা রাষ্ট্র হওয়ায় তিরুভন্নমালাই-এ আসা শতশত ভক্ত সেখানে তাঁর দর্শন পেত। ভক্তেরা সকাল সন্ধ্যায় নূতন হলঘরের বারাণ্ডায় বসে তাঁর দিকে চেয়ে থাকত। পরে যখন তিনি আরও দুর্বল হয়ে

যান এটাও সম্ভব হত না, তখন ভক্তেরা তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে সকাল সন্ধ্যা একে একে দর্শন করে চলে যেত।

একদিন তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয় ও দর্শন বন্ধ করা হয়, কিন্তু যেইমাত্র তিনি এটা লক্ষ্য করতে সমর্থ হলেন, তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন ও সেটি চালু করতে আদেশ করেন।

একদল ভক্ত তাঁর রোগমুক্তির কামনায় উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করত ও ভক্তিমূলক গান করত। তাঁকে এসবের সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় আর তিনি হেসে উত্তর দেন "কোন ভাল কাজে লেগে থাকা নিশ্চয়ই ভাল ; তারা করুক না।"

টিউমারটি ক্ষতের ঠিক ওপরে প্রায় কাঁধের কাছাকাছি দেখা দিল ; সমস্ত শরীর বিষাক্ত হয়ে গেল যার ফলে অত্যধিক রক্তাল্পতা দেখা দিল। চিকিৎসকেরা বললে, নিশ্চয়ই যন্ত্রণা অত্যন্ত তীব্র হচ্ছে। কিছুই প্রায় খেতে পারতেন না, মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে যন্ত্রণা-সূচক শব্দ করতেন কিন্তু এছাড়া যন্ত্রণার আর কোন চিহ্ন প্রকাশ পেত না। মাঝে মাঝে মাদ্রাজ থেকে চিকিৎসকেরা তাঁকে দেখতে আসত, তিনিও বরাবরের মত সৌজন্যশীল ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। শেষ অবধি তাঁব প্রথম প্রশ্ন ছিল তাদের খাওয়া হয়েছে কিনা, তাদের ভালভাবে দেখা-শোনা করা হয়েছে কিনা।

তাঁর রসবোধও ছিল। তিনি টিউমার সম্বন্ধে এমন পরিহাস করতেন যেন এটা তাঁর সংক্রান্ত কিছু নয়। একজন মহিলা শোকে দুঃখে ঘরের নিকটে একটা থামে মাথা ঠোকে, তাই দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, "ওহো, আমি ভেবেছি ও একটা নারিকেল ভাঙ্গছে।"

চিকিৎসক ভক্ত ডাঃ টি· এন· কৃষ্ণস্বামী ও সেবকদের তিনি বুঝিয়ে-ছিলেন "শরীরটা একটা কলাপাতার মত, যার ওপর অনেক প্রকার সুখাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে। খাওয়া হয়ে গেলে আমরা কি পাতাটা তুলে রাখি? ওর কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা কি ওটা ফেলে দি না?"

অন্য এক অবসরে তিনি সেবকদের বলেছিলেন, "যার এখন সব কাজে অন্যের সাহায্য লাগে সেই শরীরটাকে কে বইবে? যেটাকে বইতে চার জন লাগে, তোমরা কি আশা কর যে আমি সেটা বয়ে বেড়াব?"

আবার কতিপয় ভক্তকে "মনে কর তুমি কোন কাঠের দোকানে গেছ, কিছু কাঠ কিনে একজন কুলির মাথায় চাপিয়ে বাড়ী ফিরছ। তোমার সঙ্গে যেতে যেতে সে কেবল ভাববে যে, কখন বোঝাটা ফেলে হাল্কা হবে। সেই রকম জ্ঞানীও এই মরদেহটা ত্যাগ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকেন।" তারপর এই দৃষ্টান্তটা সংশোধন করে বললেন, "উপমা দেওয়া হল বটে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাও ঠিক নয়। জ্ঞানীর দেহত্যাগেরও চিন্তা থাকে না। তিনি দেহ থাকা বা না থাকা সম্বন্ধে সমান উদাসীন, প্রায় তার সম্বন্ধে সচেতনই থাকেন না।"

একবার তিনি একজন সেবকের কাছে নিজে থেকেই মোক্ষ ব্যাখ্যা করলেন, "মোক্ষ কি জান? 'অস্তিত্বহীন দুঃখ' থেকে পরিত্রাণ আর নিত্য-বর্তমান আনন্দ লাভ করা, এই মোক্ষ।"

আশা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন, কারণ যদিও চিকিৎসকেরা বিফল হয়েছে তবুও তিনি হয়ত তাঁর শক্তিতে রোগটা সারিয়ে ফেলতে পারেন। একজন ভক্ত অনেক করে প্রার্থনা করলে যে তাঁর ভাল হওয়াটা একান্ত বাঞ্ছনীয়, এই সম্বন্ধে তিনি একটিবার ভাবলেই যথেষ্ট হবে কিন্তু তিনি প্রায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "কে এমন চিন্তা করবে।"

আর অপর যারা তাঁকে নীরোগ হওয়ার জন্য সামান্য একটু ইচ্ছা করতে অনুরোধ করত, তাদের বলতেন, "ইচ্ছা করার জন্য কে আছে?" সেই 'অন্য' জন, সেই ব্যক্তিসত্তা যে বিধিলিপির বিরোধিতা করবে, সে তাঁর মধ্যে ছিলই না; এটা হল সেই অস্তিত্বহীন দুঃখ যা থেকে তিনি আগেই মুক্তি পেয়েছেন।

কয়েকজন ভক্ত তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য তাঁকে অনুযোগ

করলে, "ভগবান না থাকলে আমাদের কি হবে? আমরা নিজে নিজে চলার পক্ষে খুবই দুর্বল, আমরা সব কিছুর জন্য তাঁর কৃপার ওপর নির্ভর করি।" আর তিনি উত্তর দিলেন "তোমরা শরীরটার ওপর বড়ই গুরুত্ব দাও"; স্পষ্টই বলা হল যে এই শরীরের অবসানেও কৃপা ও পথনির্দেশের অভাব হবে না।

একই ভাবে বলেছিলেন, "ওরা বলছে আমি মারা যাচ্ছি কিন্তু আমি তো চলে যাচ্ছি না। কোথায় যাব? এখানেই আছি।"

পার্শীভক্ত শ্রীমতী তালেয়ার খান অনুনয় করলে, "ভগবান! এই রোগটা বরং আমায় দিয়ে দিন। আমি এটা ভোগ করি।" তাতে তিনি উত্তর দেন, "আমায় কে দিলে?"

তবে কে এটা তাঁকে দিলে? এটা কি আমাদের কর্মের দোষ নয়?

একজন সুইডেন দেশীয় সাধু একটা স্বপ্ন দেখে তাতে সেই রোগগ্রস্ত হাতটি যেন খুলে যায় আর তার মধ্যে এলোমেলো শুভ্রকেশিণী একজন মহিলা। সে এর ব্যাখ্যা করে যে এ কর্ম তার মায়ের, যাকে মুক্তি দিতে তিনি এটি অঙ্গীকার করেছেন, কিন্তু অন্যেরা এই মহিলাকে সকল মানবজাতি বা মায়া বলে মনে করেছিল।

১৩ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, একজন চিকিৎসক তাঁর ফুসফুসের প্রদাহের জন্য কিছু ওষুধ আনে কিন্তু তিনি খেতে রাজী হলেন না "এর দরকার নেই; দু'দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সেই রাত্রে তিনি তাঁর সেবকদের তাঁকে একলা থাকতে দিয়ে, শুয়ে পড়তে বা ধ্যান করতে বললেন।

শুক্রবার চিকিৎসক ও সেবকেরা বুঝলে যে আজ শেষদিন। সকালে আবার তিনি তাদের ধ্যান করতে যেতে বললেন। মধ্যাহ্ন সময় যখন তাঁকে কিছু তরল খাদ্য দেওয়া হল, সদা সময়নিষ্ঠ বরাবরের মত সময় জিজ্ঞাসা করলেন কিন্তু তারপরই যোগ করলেন, "এরপর থেকে সময়ের আর দরকার নেই।"

সেবকদের দীর্ঘদিনের সেবার স্বীকৃতি-সরূপ তিনি স্নেহের সঙ্গে তাদের বললেন, "সাহেবদের একটা কথা আছে 'থ্যাঙ্কস্' কিন্তু আমরা কেবল 'সন্তোষম্' বলি।"

সকালে শোকাতুর ও শঙ্কাকুল নরনারী খোলা দরজার সামনে দিয়ে দর্শন করে গেল, আবার বিকাল চারটা থেকে পাঁচটার সময়ও দর্শন করলে। তারা দেখলে, রোগে জর্জরিত ক্ষীণ দেহ, বুকের পাঁজর দেখা যাচ্ছে; রঙ কালো হয়েছে; বেদনার দয়নীয় ছবি। তা সত্ত্বেও এই শেষ কয়দিন কোন না কোন সময় প্রত্যেক ভক্ত একটি তীক্ষ্ণ, দীপ্ত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞার চাহনি লাভ করে যা তারা বিদায়ের শেষ কৃপানুপ্রবেশ বলে অনুভব করে।

দর্শনের পর সেদিন সন্ধ্যায় ভক্তেরা আর বাড়ী ফিরে গেল না। আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে রইল। সূর্যাস্তের সময় শ্রীভগবান তাঁর সেবকদের তাঁকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতে বললেন। তারা আগেই জানত প্রতিটি নড়াচড়া, প্রতিটি স্পর্শ কত বেদনাদায়ক; কিন্তু তিনি বললেন যে কসজন্য তারা যেন চিন্তা না করে। একজন চিকিৎসক অক্সিজেন দিতে গেলে তিনি ডান হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন। সেই ছোট ঘরে চিকিৎসক ও সেবক মিলে প্রায় বারো জন লোক রয়েছে।

দু'জন সেবক পাখার বাতাস করছিল আর বাইরে ভক্তেরা জানলা দিয়ে সেই পাখার চলা অপলক নয়নে লক্ষ্য করছিল; এখনও বাতাস করার মত একটি জীবন্ত শরীর আছে, তার চিহ্ন। এক বিখ্যাত আমেরিকান পত্রিকার সংবাদদাতা অস্থির হয়ে এদিক ওদিক ঘুরছিল, বোঝা যাচ্ছিল অত্যন্ত চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে সামলাতে পারছে না, সে মনস্থ করে যে তিরুভন্নমালাই থেকে চলে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না পাওয়া অবধি তার গল্প লিখবে না। তার সঙ্গে একজন ফরাসী সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফার।

অপ্রত্যাশিত রূপে বারাণ্ডায় বসা একদল ভক্ত 'অরুণাচল শিব' গাইতে শুরু করলে। এটা শুনে শ্রীভগবানের চোখ খুলে গেল ও উজ্জ্বল

হয়ে উঠল। অবর্ণনীয় মাধুর্য মিশ্রিত হাসিতে মুখটি ভরে গেল, চোখের দু'কোণ বেয়ে আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। একটি দীর্ঘশ্বাস, তারপর আর নেই। কোন কষ্ট নেই, কোন শ্বাস ওঠা নেই, মৃত্যুর কোন চিহ্ন নেই ; কেবল যা পরের শ্বাসটি আর এল না।

কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। গান চলতে লাগল। ফরাসী ফোটোগ্রাফার আমার কাছে এসে ঠিক কোন্ মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটল জানতে চাইল। সাংবাদিক-সুলভ নিষ্ঠুরতা ভেবে আমি অশিষ্ট ভাবে বললাম, জানি না। তারপর হঠাৎ শ্রীভগবানের সদা সৌজন্যের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সঠিক উত্তর দিলাম, ঠিক ৮টা বেজে ৪ মিনিটে। আমার তাকে উত্তেজিত মনে হল, সে বললে যে, সে বাইরে রাস্তায় চলাফেরা করছিল আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বড় তারাকে ধীরে ধীরে আকাশে চলতে দেখেছে। অনেকেই দেখেছে, এমন কি মাদ্রাজের লোকেরাও দেখেছে ও অনিষ্টের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়েছে। এটি উত্তর-পূর্বে অরুণাচলের শিখরের দিকে গিয়েছিল।

প্রথম স্তব্ধতার পর শোক সমুদ্র উথলে উঠল। দেহটি বসা অবস্থায় বারাণ্ডায় আনা হল। স্ত্রী-পুরুষ দর্শনের জন্য বারাণ্ডার রেলিং-এর কাছে ভিড় করলে। একজন স্ত্রীলোক মূর্ছা গেল। অন্যেরা শব্দ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

হলঘরে একটি সোফার ওপর মাল্যভূষিত করে দেহটি রাখা হল আর ভক্তেরা তার চারিপাশে ঘিরে বসল। লোকে মনে করেছিল সমাধিতে মুখটি পাথরের মূর্তির মত দেখতে হবে কিন্তু এতই বেদনা রেখাঙ্কিত হয়েছিল যে বুক ভেঙ্গে যায়। কেবল ক্রমশঃ রাতের দিকে সেই রহস্যময় গাম্ভীর্য ফিরে এল।

সমস্ত রাত্রি ভক্তেরা সেই হলঘরে বসে রইল আর সহরবাসীরা নীরবে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে দর্শন.কয়ে যেতে লাগল। সহর থেকে দলে দলে লোক 'অরুণাচল শিব' গাইতে গাইতে এসে চলে যেতে লাগল। হলঘরের ভক্তরা কেউ কেউ বন্দনা ও বিষাদ-সঙ্গীত গাইলে ;

অন্যেরা নীরবে বসে রইল। এই সকল স্ত্রী-পুরুষ তাদের জীবন-সর্বস্ব গুরু, যাঁর কৃপাই তাদের একমাত্র অবলম্বন, তাঁকে হারিয়েছে তা সত্ত্বেও যা সব থেকে লক্ষণীয় বিষয় তা শোকোচ্ছ্বাস নয়, তার অন্তর্নিহিত স্থৈর্য। সেই প্রথম রাত্রে আর তার পরের দিনগুলোতেও তাঁর বলা "আমি কোথাও যাচ্ছি না। কোথায় যাব? এখানেই আছি" কথার সঞ্জীবনী শক্তি স্পষ্ট হতে লাগল। 'এখানেই' কথাটির অভিপ্রায় কোন সীমাবদ্ধতা নয় পরন্তু সেই আত্মা, যার কোন যাওয়া নেই, কোন পরিবর্তন নেই কারণ সে সর্বাত্মক। তথাপি ভক্তেরা যখন তাঁর আন্তর উপস্থিতি ও তিরুভন্নমালাই-এ তাঁর নিরবচ্ছিন্ন দিব্যস্থিতি অনুভব করতে লাগল তখন সেটা তাঁরই স্নেহ-সমবেদনায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি-পূর্তি বলে বোধ করতে লাগল।

সেই বিনিদ্র রজনীতে সমাধির সিদ্ধান্তও নিতে হল। নূতন হলঘরে সমাধি দেওয়া হবে কিনা চিন্তা করা হল কিন্তু এতে অনেক ভক্তই প্রতিবাদ করলে। তাদের মতে এই হলঘরটি মার সমাধি মন্দিরের অংশ, এখানে তাঁর সমাধি মন্দির হলে মায়ের থেকে গৌণ হয়ে যায়, যা সত্য তার বিপরীত হয়। পরের দিন সর্বসম্মতিক্রমে পুরাতন হলঘর ও মন্দিরের মাঝখানে সমাধিস্থান ক'রে দিব্য সম্মানের সহিত দেহটি সমাধিস্থ করা হল। ঘন সন্নিবদ্ধ জনসঙ্ঘ মৌন-বিষাদে চেয়ে রইল। আর সেই প্রিয়তম মুখটি নেই; সেই মধুর কণ্ঠস্বর নেই; এখন থেকে মসৃণ কষ্টিপাথরের লিঙ্গটি, শিবের প্রতীকটি, সমাধির ওপর বাহ্য স্মারক-রূপে রইল আর অন্তরে, হৃদয়ে রইল তাঁর চরণচিহ্ন।

———

অষ্টাদশ অধ্যায়

নিত্য উপস্থিতি

জন সমাবেশ অন্তর্হিত হল, আশ্রম পরিত্যক্ত মনে হল, ঠিক যেন আগুন নিভে যাওয়া অগ্নিকুণ্ড। তবুও প্রায় প্রত্যেক আধ্যাত্মিক গুরুর পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর যেমন হয় সেরূপ শোকোচ্ছ্বাস ও নৈরাশ্য নেই। যে সহজ স্বাভাবিকতার ওপর এত জোর দেওয়া হত সেটা তখনও রয়ে গেল। এরই জন্য শ্রীভগবানের সস্নেহে ও সযত্নে ভক্তদের প্রস্তুত করাটা স্পষ্ট হতে লাগল। তা সত্ত্বেও শোকের সেই প্রথম কয়দিন বা সপ্তাহ কেউ আর তিরুভন্নমালাই-এ থাকতে চাইল না আর যারা থাকতে চেয়েছিল তাদেরও থাকা হল না।

কয়েকজন, যাদের ভক্তি কর্মরূপে প্রকাশ হয় তারা আশ্রমের ব্যবস্থাপনার জন্য একটা সমিতি গঠন করলে। নিরঞ্জনানন্দস্বামী তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হলেন, তারাও তাঁকে সমিতির স্থায়ী সভাপতি করে নিলে। অন্যেরা যার যার নিজেদের সহরে ছোট ছোট সঙ্ঘ করে নিয়মিত সভা সমিতির আয়োজন করলে।

দুঃখের বিষয় এই যে, একথা বলা যাবে না কেউ অসুবিধার সৃষ্টি করেনি বা নিজেদের প্রসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করেনি, যা যে-কোন আধ্যাত্মিক গুরুর দেহাবসানের পর সাধারণতঃ হয়ে থাকে ; কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। অধিকাংশ ভক্তই অবিচলিত ছিল।

অনেক বছর আগে, শ্রীভগবানের অবর্তমানে আশ্রম কি ভাবে চলবে এ বিষয়ে একটা উইল করা হয়। একদল ভক্ত এটা শ্রীভগবানকে দেখায়, তিনি সেটি বেশ যত্নের সঙ্গে পড়েন ও অনুমোদনের ভাব দেখান, তারপর তারা সকলে সেই উইলে স্বাক্ষর করে। সংক্ষেপে এতে বলা হয়েছে, তাঁর ও মার সমাধিতে পূজা হবে, নিরঞ্জনানন্দস্বামীর ছেলের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা হবে আর তিরুভন্নমালাই-এর

আধ্যাত্মিক কেন্দ্র সংরক্ষণ করা হবে। এরপর অন্য একটা উইল করার চেষ্টা হয় কিন্তু শ্রীভগবান তাতে কোন মনোযোগ দেননি।

তৃতীয় পর্যায়টিই গুরুতর দায় ও দায়িত্ব। ভক্তেরা তাদের স্বভাব ও সামর্থ্য অনুযায়ী এতে অংশ গ্রহণ করে। কয়েকজন আছে যারা কেবলমাত্র সেখানে গিয়ে নীরবে বসে ধ্যান করা ছাড়া আর কিছু করে না কিংবা যারা সুযোগ সুবিধা হলে সান্ত্বনা লাভের জন্য আর তাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনের জন্য আসে। তারা সেই গুরুর শিষ্য যিনি বলেছিলেন "ভাষণ দিয়ে লোকেদের একঘণ্টা মনোরঞ্জন হয় কিন্তু সংশোধন হয় না ; অপরপক্ষে মৌন স্থায়ী আর সমস্ত মানবজাতির উপকার করে।" যদিও তাদের ধ্যান শ্রীভগবানের প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক মৌনের সমকক্ষ নয় তবুও তারা যে কেবল কৃপা লাভ করে তা নয়, প্রসারিতও করে আর এর প্রভাব নিশ্চয়ই আছে। যদি বহু লোক সমবেত হয়ে উপাসনা বা ধ্যান করে তার ফলও সামগ্রিক হয়।

অন্যেরা ভাষণ ও লেখন দ্বারা এ বিষয়ে একটা আগ্রহ বাড়াবার চেষ্টা করে যা কালে পুষ্টিলাভ ক'রে প্রজ্ঞায় পরিণত হতে পারে।

যাবা বাইরের কাজ পছন্দ করে তাদের জন্য রয়েছে সংগঠনের দায়িত্ব ; এটাও একটা সাধনা আর যখন সাধনারূপে করা যায় তখন শ্রীভগবানের স্বীকৃতি লাভ করে। এরা একটা ধ্যান-মন্দির তৈরী করার আশা করে (হয়েছে)। উপস্থিত এখন এটি পুরাতন হলঘর ও মন্দিরের মাঝে সামান্য একটি প্রস্তর সমাধি যার ওপর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর আচ্ছাদন বলতে কেবল মাত্র তালপাতা।

সব স্থানেই শ্রীভগবানের উপস্থিতি অনুভব হয় তথাপি পরিবেশের একটা পার্থক্য আছে। সমাধির নিকট আজও সকাল ও সন্ধ্যায় বেদ-পারায়ণ হয়, ঠিক আগে যেমন আর যে সময় তাঁর সান্নিধ্যে হত। ভক্তেরাও ঠিক তেমনি ধ্যানে বসে, যেমন তারা হলঘরে বসত, সেই শক্তি, সেই সূক্ষ্ম পথ-নির্দেশনা আজও রয়েছে। পারায়ণের সময় সমাধিতে পূজা হয়, শ্রীভগবানের অষ্টোত্তর শতনাম পাঠ হয়। কিন্তু

পুরাতন হলঘরটির পরিবেশ আরও শান্ত ও স্নিগ্ধ, তাঁর দীর্ঘ অবস্থিতির প্রভাবে আরও বেশী অন্তরঙ্গ। মহাসমাধির কয়েকমাস পরে এই ঘরটিতে আগুন ধরে যায় কিন্তু সৌভাগ্যবশে ঘরটি নষ্ট হয়ে যায় নি।

তাছাড়া সেই ছোট ঘরটি রয়েছে, যেখানে শেষের ক'দিন কেটেছে। সেখানকার বড় ছবিটি মনে হয় যেন জীবন্ত আর ভক্তদের প্রার্থনায় সদা সংবেদনশীল। এখানে শ্রীভগবান যেসকল বস্তু স্পর্শ করেছেন বা ব্যবহার করেছেন রাখা আছে—তাঁর লাঠি ও কমণ্ডলু, ময়ূরপুচ্ছের পাখা, ঘোরান বই-এর সেল্‌ফ্‌ আরও ছোটখাট নানা জিনিস। সোফাটি চিরকালের মত শূন্য। সেই ঘরে এমন একটা কিছু আছে যা অপরিমেয় মর্মস্পর্শী ও অবর্ণনীয় রূপে অনুকম্পাময়।

নূতন হলঘরে শ্রীভগবানের প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। উইলের শর্ত অনুযায়ী একটি পূর্ণাবয়ব প্রস্তরমূর্তি স্থাপনের কথা ; কিন্তু এখনও এরূপ মূর্তি-নির্মাণযোগ্য ভাস্কর পাওয়া যায়নি। তাকে শ্রীভগবানের রহস্য অনুভব করতে হবে, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে হবে কারণ এটা কেবল অঙ্গসৌষ্ঠব নির্মাণ করার প্রশ্ন নয় পরন্ত দীপ্তিমান দিব্যশক্তি ও সৌন্দর্যের মূর্ত-রূপ দেওয়া।

কেবল যে আশ্রম ভবনগুলোই পবিত্র তা নয়, সমগ্র পরিবেশই পবিত্র। যে শান্তি সেখানে বিরাজিত তা আপূরিত ও আপ্লাবিত করে —এটা স্পন্দনহীন শান্তি নয়, একটা উল্লাসময় সঞ্জীবনা। সমগ্র বায়ুমণ্ডল তাঁর উপস্থিতির তীব্র মধুর সুগন্ধে ভরা।

এটা সত্য, তাঁর উপস্থিতি কেবল যে তিরুভন্নমালাইতেই সীমাবদ্ধ তা নয়। কখনই ছিল না। ভক্তেরা যেখানেই থাকুক, তাঁর কৃপা ও সহায়তা, তাঁর আন্তর উপস্থিতি কেবল যে আগের মত তীব্রভাবে তা নয় আরও তীব্রতর ভাবে অনুভব করে। তাছাড়া আগেব মত এখনও তিরুভন্নমালাই দর্শন প্রাণের মধ্যে শান্তির প্রলেপ দেয় আর সেখানে বাসের মাধুর্য বর্ণনার অতীত।

পৃথিবীতে অনেক মহাত্মা এসেছেন যাঁরা ভক্তদের পুনরায় পথ

প্রদর্শনের জন্য বারে বারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞা করেছেন। কিন্তু শ্রীভগবান ছিলেন পূর্ণ জ্ঞানী, যাঁর মধ্যে অহংকারের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট ছিল না যে পুনর্জন্মের ইঙ্গিত করবে। তাঁর প্রতিশ্রুতি ছিল ভিন্ন, "আমি যাচ্ছি না। কোথায় যাব? এখানেই আছি।" "এখানে থাকব" নয় "এখানে আছি" কারণ জ্ঞানীর পক্ষে কোন পরিবর্তন নেই, কোন সময় নেই, কোন ভূত ও ভবিষ্যৎ নেই, কোন চলে যাওয়া নেই, কেবল শাশ্বত 'এখন' যার মধ্যে অনন্তকাল বিদ্যমান রয়েছে, সেই বিশ্বব্যাপী অবকাশশূন্য 'এখানে'। তিনি যার স্বীকৃতি দিয়েছেন সেটা তাঁর সতত, অবিরাম উপস্থিতি, সতত নির্দেশনা। অনেকদিন আগে তিনি শিবপ্রকাশ পিল্লাইকে বলেছিলেন "যে একবার গুরু-কৃপা লাভ করেছে, সে নিঃসন্দেহে রক্ষা পাবে আর কখনই পরিত্যক্ত হবে না।" আর ভক্তেরা যখন তাঁর শেষ অসুখের সময় বলেছিল যে তিনি তাদের ছেড়ে যাচ্ছেন ও তাদের দুর্বলতার যুক্তি দেখিয়ে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তার আবেদন করেছিল, তিনি পাল্টা জবাব দেন, "তোমরা শরীরের ওপর বড়ই গুরুত্ব দাও।"

এটা যে কত সত্য তারা তা শীঘ্রই আবিষ্কার করলে। আগের থেকে অনেক বেশী মাত্রায় তিনি এখন আন্তর গুরু হয়েছেন। যারা তাঁর ওপর নির্ভর করত তারা এখন তাঁর নির্দেশ আরও সক্রিয় ও তীব্র ভাবে অনুভব করে। তাদের চিন্তা এখন নিরন্তর তাঁতেই নিবদ্ধ। বিচারের পথে আন্তর গুরুর দিকে যাওয়া এখন আবও সরল ও সুগম হয়েছে। ধ্যানে আরও সহজে কৃপা অনুভূত হয়। শুভাশুভ উভয় কর্মের ফল এখন আরও দ্রুত ও তীব্র ভাবে লাভ হয়।

বিচ্ছেদের প্রথম স্তব্ধতা চলে যাওয়ার পর ভক্তেরা আবার তিরুভন্নমালাই-এ ফিরে আসতে লাগল। কেবল যে আত্মমুখীন লোকেরাই অন্তরে তাঁর সতত উপস্থিতি অনুভব করে, তা নয়। একজন ভক্ত ডাঃ টি. এন. কৃষ্ণমূর্তি বিশ্বাস করত যে, সে ব্যক্তিগত প্রেমভক্তিতে তাঁর প্রতি অনুরক্ত ছিল আর মহাসমাধির পর শোকাতুর হয়ে বলেছিল

"আমার মত লোকের জন্য সব শেষ হয়ে গেল।" কয়েক মাস পরে তিরুভন্নমালাই থেকে ফিরে গিয়ে সে বলেছিল "এখন যা রয়েছে, আগের দিনেও সেখানে এমন শান্তি ও সৌন্দর্য ছিল না।" আর কেবল যে আত্মমুখীন লোকেরাই আন্তর নির্দেশনা অনুভব করে তাও নয়। এটা ভক্তির তাৎকালিক প্রতিবেদন।

অরুণাচল পাহাড়ের রহস্য আরও সহজলভ্য হয়েছে। অনেকেই আছে যারা আগে এর শক্তি সম্বন্ধে কিছুই অনুভব করেনি, তাদের কাছে এটা অন্য যে-কোন পাহাড়ের মত মাটি, পাথর আর গাছপালার পাহাড। শ্রীমতী তালেয়ার খান একজন ভক্ত যাব কথা আগের অধ্যাযে বলা হয়েছে ; একবার তার একজন অতিথির সঙ্গে পাহাড়ে বসে শ্রীভগবানের সম্বন্ধে কথা বলছিল। সে বললে, "ভগবান প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর আমাদের সকল কামনা পূর্ণ হয়। এটা আমার নিজস্ব অনুভব। ভগবান বলেন এই পাহাড় স্বয়ং ঈশ্বর। আমি এসব বুঝি না, কিন্তু যেহেতু ভগবান বলেন আমিও বিশ্বাস করি।" তার বান্ধবী একজন মুসলমান মহিলা যার তখনও ফার্সী সংস্কৃতির কিছু অবশিষ্ট ছিল, উত্তব দিলে "আমাদের ফার্সী মতে এখন যদি বৃষ্টি হয় তবে এটা মেনে নিতে পারি।" প্রায় তৎক্ষণাৎ এক পস্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেল। তারা সম্পূর্ণ ভিজে গল্পটি বলার জন্য পাহাড় থেকে নেমে এল।

কিন্তু যেদিন আত্মা দেহ ছেড়ে গেল আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র পাহাড়ের দিকে গেল ভক্তেরা একে প্রত্যক্ষরূপে পবিত্রভূমি বলে উপলব্ধি করলে ; এতে তাবা ভগবানের রহস্যও অনুভব করলে।

প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে অরুণাচল পাহাড় কামপ্রদ আর শতাব্দীর পর শতাব্দী যাত্রীদল আপন মনোরথ পূরণের প্রার্থনা নিয়ে তার কাছে গিয়েছে কিন্তু যারা সুগভীর ভাবে এর শান্তি অনুভব করে তারা কোন কামনা করে না, কারণ অরুণাচলের ধারা হল ভগবানের পথ যা সকল কামনা থেকে মুক্তি দেয়, যা সর্বোত্তম সার্থকতা—

আকার ভাবিয়া যবে দেখিছে তোমারে
ক্ষিতিপরে গিরি রূপে তুমি যে আমার।
মানসে খুঁজিলে তত্ত্ব অমূর্ত স্বরূপ,
ভূমণ্ডল ভ্রমি খোঁজে আকাশ যেরূপ।
চিত্ত নিবেশিলে, তব অনন্ত সত্তায়
চিনির পুতুল যেন সাগরে মিশায়।
আত্মার হলে পরিচয়, ব্যষ্টি সত্তা কোথায়
তোমা বিনা, হে অরুণাচল অচলায়তন ?

অরুণাচল অষ্টক ৩

কেবল যে যারা আগে এসেছে আর দেহ থাকা কালে শ্রীভগবানের অপরূপ সৌন্দর্য দেখেছে তারাই আকর্ষণ অনুভব করে তা নয়। অপরিমেয় তাদের সৌভাগ্য কিন্তু অন্যেরাও তাঁর প্রতি, অরুণাচলেব প্রতি আকর্ষিত হয়। এরূপ দু'টি ঘটনা উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে। শ্রীমতী হাউয়েস পল ব্রান্টনের 'এ সার্চ ইন সিক্রেট ইণ্ডিয়া' বইটি পড়ে তিরুভন্নমালাই আসার সুযোগের জন্য চৌদ্দ বছর অপেক্ষা করেছিল। ঘটনা চক্রে সেটা 'মহাসমাধির' পর সম্ভব হল। সে তার কাজ ছেড়ে দিলে আর প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য বিষয়সম্পত্তি বিক্রয় করলে। তার এখানে কেবলমাত্র কয়েক সপ্তাহ থাকা সম্ভব হল। যা হোক সে শ্রীভগবানের উপস্থিতির কৃপা অনুভব করে বলেছিল "যখন জানলাম তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়েছে, আমি ভেবেছিলাম যে আমি নিরাশ হব কিন্তু তা হইনি। আমার এখানে আসা সার্থক হয়েছে, এর প্রতিটি মুহূর্ত সার্থক। এখন আমি আবার এখানে ফিরে আসার দিনটির জন্য অপেক্ষা করব।"

ফিরে আসা ভগবানের হাতে। যেমন আগে হত, এখনও তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তাঁর কাছে তথা তিরুভন্নমালাই-এ টেনে আনেন। শ্রীমতী হাউয়েসের পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুসারে আশা ছিল যে,

ফিরে গিয়ে কাজ পেতে অসুবিধা হবে না কিন্তু এক্ষেত্রে তা ঘটল না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে গেল, কোন উপযুক্ত কাজ পাওয়া গেল না। তারপর সে একটি পছন্দ মত কাজের সন্ধান পেল, কিন্তু সেও আবার ভারতে। সুতরাং তার ফিরে আসা সহজ হল।

ডাঃ ডি. ডি. আচার্য মধ্যভারতে বহুদিন সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসায় করে অবসর নিয়েছে এবং বাকী দিনগুলো আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানে ব্যয় করবে মনস্থ করেছে। সে সারা ভারতবর্ষ ঘুরলে, এক মন্দির হতে অন্য মন্দিরে, এক আশ্রম হতে অন্য আশ্রমে গেল কিন্তু তিরুভন্নমালাই না আসা অবধি সে যে শান্তি খুঁজছিল তা পেল না। সেখানে পৌছানোমাত্র এটাই যে তার আশ্রয় অনুভব করলে আর আশ্রম ডাক্তার রূপে স্থায়িভাবে বাস করতে লাগল।

কিছুকাল পরে, অন্য অনেকের মত সেও নিজের কোন উন্নতি হচ্ছে না ভেবে হতাশ হয়ে একদিন সমাধির নিকট কেঁদে বললে, "হে ভগবান, তুমি যদি আমাকে আমার বাঞ্ছিত শান্তি না-ই দেবে তবে এখানে আনলে কেন।"

সেই রাত্রে সে ভগবানকে তাঁর সোফায় বসা অবস্থায় স্বপ্ন দেখলে, কাছে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে প্রণাম করলে। শ্রীভগবান তার আনত মস্তকটি দু'হাতে ধরে তাকে তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তার অভিযোগের উত্তরে যেভাবে তিনি তাঁর জীবিতাবস্থায় ভক্তদের বলতেন ঠিক সেইভাবে বললেন, "তোমার যে কোন উন্নতি হয়নি একথা সত্য নয়, সেটা আমি জানি, তোমার জানা নেই।"

ডাঃ আচার্য আকুল হয়ে অনুনয় করলে "কিন্তু আমায় এখনই, এই জীবনেই আত্মোপলব্ধি করতে হবে! অপেক্ষা করার কি আছে? এত বিলম্বই বা হচ্ছে কেন?"

শ্রীভগবান হেসে বললেন, "সেটা তোমার প্রারব্ধ।"

শ্রীভগবানকে যে কোনদিন দেখেনি, তার স্বপ্নে উত্তরগুলো তিনি জীবিতাবস্থায় যা দিতেন তাই হয়েছিল। এখানেও আগের মত তাঁর

বলা কথাগুলো অপেক্ষা তাঁর সহৃদয়তার অবর্ণনীয় মোহিনীশক্তিই বেশী আশ্বাসপ্রদ ছিল।

আরও অনেকে আসবে। উত্তর ভারতের বিখ্যাত সাধিকা আনন্দময়ী মা সমাধি মন্দির দর্শন করতে আসেন আর তাঁর জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত আসন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বলেন, "এসব আড়ম্বর কেন? আমি আমার বাবাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে এসেছি, আমিও অন্যদের মত মাটিতে বসতে পারি।" আর একজন দক্ষিণ ভারতীয় সাধিকা শ্রীমতী তালেয়ার খানের দ্বারা তাঁর ও তাঁর মত অন্যদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে বলেন, "তিনি ছিলেন সূর্য আমরা কেবলমাত্র তাঁর কিরণ।" যীশু খ্রীস্টের কাহিনী যেমন ক্রুসেই শেষ হয়ে যায়নি, এ কাহিনীও শেষ হয়নি। বস্তুতঃ শ্রীভগবান একটা কোন নূতন ধর্ম জগতে আনেন নি কিন্তু এই আধ্যাত্মিক তমসাচ্ছন্ন যুগে সকল দেশে ও সকল ধর্মের মধ্যে যারা আকাঙ্ক্ষা ও অনুভব করে তাদের জন্য একটা নূতন উদ্দীপনা, একটা নূতন প্রণালী দিয়েছেন। এটা যে কেবল তাঁর জীবিতকালের জন্যে তাও নয়। যারা ভয় পেয়েছিল যে তাঁর মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নির্দেশনাও সমাপ্ত হয়ে যাবে তাদের তিনি সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমরা শরীরটার ওপর বড়ই গুরুত্ব দাও।" পূর্বের মত এখনও যারা তাঁর কাছে আসে, যারা তাঁর অনুগত হয় তাদের তিনি পথ দেখান। যারা খোঁজে, তাদের সবার জন্য তিনি এখানে রয়েছেন।

॥ ওঁ শ্রীরমণ অর্পণমস্তু ॥